অখণ্ড সংহিতা

বা

বিংশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(বিংশ খণ্ড)

চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪১৪

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্মার্থ শুল্ক — পঁয়ষট্টি টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২

সাধন কুঞ্জ
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-(০৩২৬)২৩১০৭১০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড : ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

"অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বাংলা ১৩৪২ এর ৬ই আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) হইতে শুরু করিয়া ময়মনসিংহ, ঢাকা, বেরুয়া, শিলমান্দী, নবীনগর, কৃষ্ণনগর, আকুবপুর, মীরপুর, কসবা, লাকসাম-জংশন, পূর্ব্ব অলকা, ফেণী প্রভৃতি স্থানে যে সকল সদুপদেশ দিয়াছেন, বাংলা ১৩৮২ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহা মুদ্রণ আরম্ভ হয়। সম্ভবত ছাপা শেষ করিয়া বাহির করিতে ছয় মাস লাগিয়াছিল। বাজারে কাগজ দুর্মূল্য বলিয়া এক হাজারের বেশী ছাপান যায় নাই। কিন্তু এক হাজার গ্রন্থ সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়া যায়। বাংলা ১৩৮৪ সালে মাঘ মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ আরম্ভ হইল। এই সংস্করণও কাগজের অভাবে দুই হাজারের বেশী ছাপান যাইতেছে না। আশা করি এই সংস্করণও পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় এবং অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় সমাদৃত হইবে। একই সময়ে ত্রয়োবিংশ খণ্ডও ছাপান হইতেছে বলিয়া কোনটীই দ্রুত শেষ করা যাইবে না।

অভিক্ষা মন্ত্রের বিজয়-বৈজয়ন্তী হাতে লইয়া শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব দীর্ঘকাল অগে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, তখন কেহ তাঁহাকে জানিত না, জানিত

কেবল অন্তরালচারী, গোপন-পদ-সঞ্চারী কিছু কিছু নিঃস্বার্থ দেশকর্ম্মী যুবক, যাহারা দেশের হিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল, যশ কামনা করে নাই। আজ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের কম্বু-কণ্ঠের অমৃতময়-উপদেশ-বাণী শুনিবার জন্য ভারতের যে কোন অঞ্চলে বঙ্গ-ভাষীরা আছেন, সেখানেই আকুল আগ্রহ বিরাজমান। কিন্তু তাঁহার পক্ষে সর্ব্বত্র গমন সম্ভব নহে। তিনি বর্ষীয়ান হইয়াছেন। তাঁহার মূল্যবান্ উপদেশ-বাণী অখণ্ড-সংহিতার প্রথম খণ্ড হইতে শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রজ্জ্বলন্ত হীরার মতন পরিকীর্ণ রহিয়াছে। যিনি যে বিষয় জানিতে চাহিবেন, তিনি সেই বিষয়েই প্রকৃষ্টতম সদুপদেশ এই গ্রন্থ হইতেই পাইবেন। রত্নাকর সমুদ্রের ন্যায় অখণ্ড-সংহিতা-রূপ-বারিধিতে যাবতীয় জীবন-সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান সুনিশ্চিতই সুলভ। অহঙ্কার-প্রসূত দম্ভোক্তি নহে, ইহা সার সত্য কথা।

এই মহাগ্রন্থ চরিত্র-আন্দোলনকে দেশব্যাপী প্রসার দান করিতেছে। ইহা এই গ্রন্থের এক মহৎ কৃতিত্ব, দিকে দিকে বক্তারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আত্মপ্রস্তুতির সুযোগ নিতেছেন। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, কাছাড়, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলা ও রাজ্যে এই গ্রন্থের বক্তা তৈরী করিয়া ব্যাপকভাবে চরিত্র-আন্দোলন চালাইতেছেন। এই গ্রন্থ চিরকাল সুবক্তার

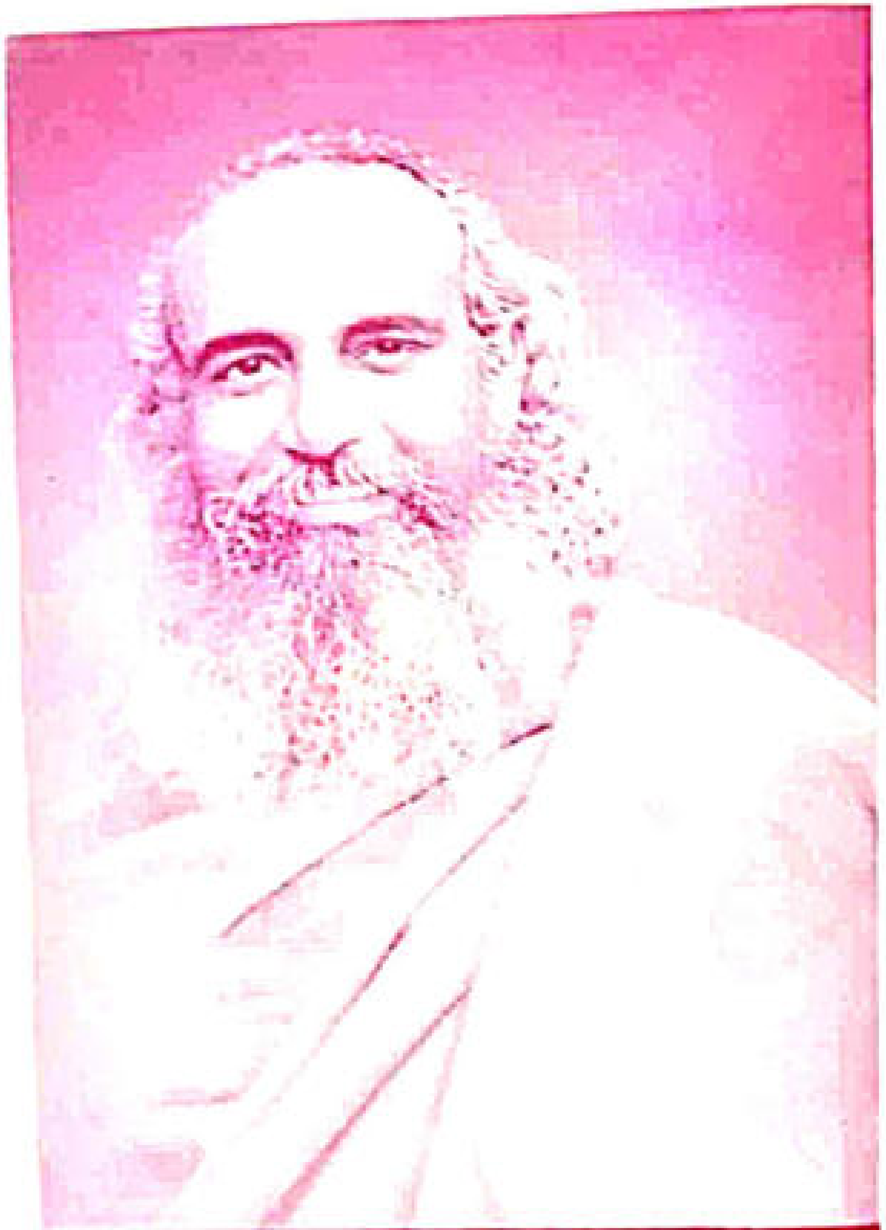
পর সুবক্তা সৃষ্টি করিয়া যে কোন সৎ আন্দোলনকে সঞ্জীবিত রাখিবে। ইতি—

অযাচক আশ্রম	নিবেদিতা
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,	ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
বারাণসী-১	স্নেহময় ব্রহ্মচারী

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে বিংশ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ সনে দুই হাজার ছাপা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত 'অখণ্ড-সংহিতা' বিংশ খণ্ডের ইহা হুবহু পুনর্মুদ্রণ মাত্র। তৃতীয় সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইল। দুই হাজার খানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বাকী তিন হাজার খানা বিতরণের জন্য রাখা হইল। অখণ্ড-সংহিতার বিশেষত্ব-সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য খণ্ডের নিবেদনেই যাহা বলিবার বলিয়াছি।

এক লক্ষ অখণ্ড-সংহিতা বিনা মূল্যে বিতরণের মহৎ প্রকল্প সংসাধনের জন্য যাঁহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করিতেছেন, সেই সকল মহানুভব দাতাদের দানের পরিকাণ ও নামের তালিকা "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(বিংশ খণ্ড)

——ঃ (*) ঃ——

ময়মনসিংহ
৬ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৪২
(২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বিগত
২৫শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৪২ (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

১

তারিখে ময়মনসিংহ আসিয়াছেন এবং ইতোমধ্যে তিনি এই শহরে "মনুষ্যত্বের সাধনা তথা ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্র-গঠন" সম্পর্কে পর পর দ্বাদশটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমগ্র শহর সশ্রদ্ধ প্রশংসায় মুখরিত করিয়া দিয়াছেন।

প্রাতঃকালে তিনি পত্র লিখিতে বসিয়াছেন।

ভক্তি ও ভক্তের জয়জয়কার

ফরিদপুর জেলান্তর্গত কণেশ্বর-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি জগদ্বাসী সকল নরনারীর অন্তরে স্বার্থবুদ্ধিহীন বিমল ভক্তির উন্মেষ হউক, এই প্রার্থনা করিয়াছ। আমি বলি, এর চেয়ে ভাল প্রার্থনা আর কিছু হইতে পারিত না। আমিও নিয়ত জগদ্বাসীর জন্য এই প্রার্থনাই করিয়া থাকি। কিন্তু অব্রহ্মচারী, ব্যভিচারী, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, স্বার্থলুব্ধ ব্যক্তিরা ভক্তির ভাণ করিয়া মানুষকে শুধু ঠকায় না, নিজেদিগকেও ঠকায়। এই ঠকবাজী হইতে জগৎ রক্ষা পাউক, ইহাও আমাদের প্রার্থনীয়। প্রকৃত ভক্তেরা জগৎ ভরিয়া ফেলিলে জগতের যাবতীয় অশান্তির অনল দেখিতে না দেখিতে নিবিয়া যাইত। আমরা ভক্তির অভিনয়ই করি, প্রকৃত ভক্তির অনুশীলন করি না, আমরা অপরের ভক্তিভাবের সুযোগ নিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিতৃপ্ত করি, আমরা অফুরন্ত বাগ-বিলাসিতায় ভক্তির অনুকূলে প্রচার-কর্ম্ম করি কিন্তু নিজেরা

ঈর্ষ্যা-পরনিন্দা-পরানিষ্টচিন্তা ছাড়িতে পারি না, ইহাই ত' ভক্তিবাদের পথ-কণ্টক হইয়াছে। এস আমরা প্রতিজনে প্রার্থনা করি, সকল অভক্ত ভক্ত হউক, সকল ভক্ত খাঁটি হউক এবং প্রতিটি ভক্তের জীবন জগদ্বাসী সকলের সেবায় মুখ্যতঃ ও গৌণভাবে নিরন্তর নিয়োজিত থাকুক। ভক্তি এবং ভক্তের জয়জয়কার এই পথেই হইবে, অন্য পথ নাই।"

আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট মতের প্রচারক নহি

ফরিদপুর জেলান্তর্গত গোপালগঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি রংপুরের খবরের কাগজে আমার বক্তৃতার প্রশংসা পাঠ করিয়া প্রশ্ন করিতেছ যে, আমার সভাস্থলে এত জনতা হয় কেন আর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও সমাগম সম্ভব হয় কি করিয়া। এ প্রশ্নের জবাব আমি নিজে দিতে পারিব না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, আমি সভাস্থলে জনতাকে উপদেশ দেই না, উপদেশ দেই নিজেকে। আর, জ্ঞানীদিগকে জ্ঞানদানের চেষ্টা করি না, আমি যে নিজে অজ্ঞান, এই কথাটা স্মরণে রাখিয়া আমার মতন অজ্ঞানের পক্ষে যাহা সহজবোধ্য, তাহা বলি। Appeal to the lowest intellect বা ন্যূনতম জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির বোধশক্তির উপযোগী করিয়া

বলিবার আমি চেষ্টা করি। ভাবের অনুযায়ী নানা সময়ে নানা ঢং এর অবতারণা অবশ্যই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাহিত্যিক-সুলভ কবিত্বের অনুরোধে নহে সংবেদনশীল নীরব এক কর্ম্মীর অন্তরের স্বাভাবিক আবেগের অনুরোধে। এই জন্য কৃত্রিমতা থাকে না বা কৃত্রিম প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। মতামত ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন রকমের থাকিতে পারে এবং প্রত্যেকটী মতের কিছু না কিছু প্রতিনিধি সভাস্থলে থাকিতে পারেন, সুতরাং প্রত্যেকটী মতের ও পথের উজ্জ্বল দিক্‌টী আলোচনা করিয়া যাইতে আমার কুণ্ঠা নাই কিন্তু তুলনা করিয়া কোনও মতকে বিশিষ্ট সম্মানের অধিকার দান বা কোনও মতকে গর্হণ করা আমার কর্ত্তব্য-সীমার বাহিরে থাকে। শ্রোতা নিজ অভিলাষ-অনুযায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে যাহাতে আমার গোঁড়ামির জন্য বাধাপ্রাপ্ত না হয়, এইটী দেখা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। জানি না, ইহাই আমার প্রতি মানুষের আকর্ষণের কারণ কিনা। আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট মতের প্রচারক নহি, আমি সব মত এবং সব পথের সৌন্দর্য্যটুকুর প্রতি অঙ্গুলী হেলন করিয়া দেখাইতে চাহি, তারপরে যাহার যাহা গ্রহণীয়, গ্রহণ করুক। কেবল একটা বিষয়েই আমার গোঁড়ামি আছে। তাহা এই যে, জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনের জন্য সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন যে বস্তুর, তাহার নাম সচ্চরিত্রতা এবং ব্রহ্মচর্য্য।"

সৎ-প্রতিষ্ঠান-গঠনে স্বাবলম্বন

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত কধুরখিল-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎকার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং এই জন্য তোমরা জনসাধারণের কাছ হইতে চাঁদা তুলিবার কাজে নামিয়াছ, এই সংবাদে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে মগ্ন হইলাম। হর্ষ এই জন্য যে, সৎকাজে তোমাদের মন মজিয়াছে। বিষাদ এই জন্য যে, অর্থ সংগ্রহের জন্য তোমরা আত্মনির্ভর হইবার চেষ্টা আগে করিলে না। মান-অভিমান বর্জ্জন করিয়া যাও না গ্রামের পানাপুকুরগুলি সবাই মিলিয়া পরিষ্কার করিতে, বিনিময়ে পুকুরের মালিকের কাছে কিছু নিশ্চয়ই পাইবে। সেই স্বল্প-পরিমাণ অর্থই সৎকার্য্যের ভাণ্ডারে জমা দেও। পুকুরের পানা পরিষ্কার করা বা ভাঙা রাস্তা মেরামত করা প্রভৃতি নানা তুচ্ছ তুচ্ছ কাজ আমি নানা স্থানে নিজ হাতে করিয়াছি, যদিও তাহার বিনিময়ে কোথাও কোনও অর্থ গ্রহণ করি নাই। তোমরা এই সকল সৎকার্য্য করিয়া কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পার। লোকের জলে ভিজান পাটগুলি ধুইবার কাজে যদি শ্রম করিতে চাহ, তবে বৎসরের দুইটা নির্দ্দিষ্ট মাসে তোমরা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ঐ কাজে নামিয়া পড়িলে বেশ কিছু উপার্জ্জন করিতে পার। উপার্জ্জিত অর্থ বনভোজনে ব্যয় না করিয়া সদনুষ্ঠানে ব্যয় করিতে

পার। স্বাবলম্বনী বৃত্তিতে নির্ভর করিয়া সংপ্রতিষ্ঠান গড়া যায় কিনা, তাহার চেষ্টা করিতে আপত্তি কেন? দশ জন বন্ধুতে মিলিয়া ধান্য কৃষির জন্য এক খণ্ড জমি নিয়া চাষ-আবাদের পরে তাহার লভ্যাংশ সৎকর্ম্মের জন্য সংপ্রতিষ্ঠানে তোমরা দিবার চেষ্টা করিতে পার। একটী স্থানে এইরূপ একটী কাজ হইয়া গেলে এই দৃষ্টান্তটী আরও দশজনে দশদিকে অনুসরণ করিতে পারে। তাহাতে সমগ্র সমাজের যে সার্ব্বাঙ্গিক লাভ, এই কথাটী কেহ ভুলিও না।"

স্বামীর শুক্রে স্ত্রীর স্বত্বাধিকার

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত ফতেয়াবাদ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাময়িক কামমোহে রিপুর উত্তেজনায় শরীরের সারভূত যে সত্তাশক্তিকে তুমি কৃত্রিম উপায়ে ক্ষয়িত করিয়া দিতেছ, মনে রাখিও, তাহার উপরে একমাত্র অধিকার হইতেছে তোমার সেই ভাবী পত্নীর, যে তোমার সন্তানদিগকে গর্ভে ধারণ করিবে। তোমার যে শুক্রটুকুর সংস্পর্শে তাহার সন্তান হইবে না, তাহাও যে তাহার দেহমনের উপরে কি অসামান্য বৈদ্যুতিক প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা তুমি কল্পনাও করিতে পার না। স্বামীর এক বিন্দু শুক্র সাধ্বী পত্নীর নিকটে সপ্ত-জন্মের সাধনার ধন মহামণি বিশেষ। স্ত্রী যদি জানে যে, সে ধৃতবীর্য্য স্বামীর শুক্র-সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহা হইলে

ঐ সংস্পর্শ তাহাকে মাতৃত্ব দান না করিলেও উহার ফলে তাহার দেহমনের এক বিচিত্র বিকাশ ঘটিয়া থাকে, যেই বিকাশের সদা-সহজাত বিশেষত্ব হইতেছে দিব্যানন্দের অনুভূতি এবং সর্ব্বদা উৎফুল্ল স্বভাব। পুরুষের যে বীর্য্যের সংস্পর্শে নারীর জীবনে এমন অসাধারণ যুগান্তর আসিয়া থাকে, সেই বীর্য্যকে পুরুষ বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে পত্নীর কুশল সম্পাদনের উদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যয়িত করিবার অধিকারী নহে। এই মহাবস্তু পুরুষেরই শরীরে বিদ্যমান বটে কিন্তু উহার প্রকৃত স্বত্বাধিকারিণী তাহার পত্নী। ইহা যেন শিডিউল্‌ড্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ধনের মত। বিপুল পরিমাণে যদি ইহা গচ্ছিত রাখা যায়, তাহা হইলে সুদের দৌলতে সংসার চলিয়া যায়।"

সবাই সবাইকে দেখিবে

বগুড়া জেলান্তর্গত শেরপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সকলেই ত' তোমরা দেশের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ বলিয়া চীৎকার করিতেছ কিন্তু তোমাদের প্রায় প্রতিজনের ব্যক্তিগত জীবনের আচরণ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইতেছে যে, তোমরা কেহই নিজ নিজ স্বার্থের ঊর্দ্ধে এক কণা চিন্তাও কর না। পথ চলিতে তোমার যেখানে বাধা হইয়াছে, সেখানে অন্যান্যদেরও বাধা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং কোনও প্রকারে

নিজের দায় উদ্ধার করিয়াই তুমি সরিয়া পড়িতে পার না, অন্য দশ জনের পথ-বাধাও তোমাকেই দূর করিয়া দিতে হইবে,—এই কথাটী প্রায় কেহই চিন্তা কর না। তোমার দুয়ারে পতিত মৃত কুক্কুরটীর শবদেহ টানিয়া নিয়া অন্য এক প্রতিবেশীর দুয়ারে অনায়াসে ফেলিয়া দিয়া আসিতে পার কিন্তু সকলে মিলিয়া ইহা টানিয়া নিয়া ভাগাড়ে ফেলিতে তোমাদের দারুণ অনুৎসাহ। সবাই সবাইকে দেখিবে, সকলে সকলের জন্য শ্রম করিবে, সকলের শ্রম ও ত্যাগের ফল সকলে পাইবে, এই বোধ যতদিন না জাগাইতে পার, ততদিন তোমরা নানা আন্দোলনই করিবে, ফল কিন্তু অষ্টরম্ভার বেশী কিছু ফলিবে না।"

ব্যভিচারিণী পত্নী সম্পর্কে ক্ষমা

বীরভূম জেলান্তর্গত সিউড়ী-নিবাসী অপর কে পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে নিজ ব্যভিচারের কথা অকপটে স্বামীর নিকটে স্বীকার করিয়াছে, এমন ঘটনার কথা অনাদি আদিম কাল হইতে শুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় জগতে অতি অল্প লোকই শুনিয়াছে! সুতরাং ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট স্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া করিয়া নিজেকে তুষানলে দগ্ধ করার মতন মূর্খতা স্বামীর পক্ষে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। হয় দুঃসাহস করিয়া হাতে-নাতে তাহার ব্যভিচার ধরিয়া

ফেলিতেই হইবে, নতুবা তাহাকে করিতে হইবে ঢালাও ক্ষমা। মধ্যপন্থা কিছু নাই। ক্ষমা করিলেও অন্তরে তাহার প্রতি ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা থাকিতে পারে। কারণ, ইহাই মানবীয় প্রকৃতি। কিন্তু ক্ষমা ত' নিজের শক্তিতে করিবে না, করিবে ঈশ্বরের শক্তিতে। তাঁহার নিকটে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধাকে জয় করিবার সামর্থ্য প্রার্থনা কর। হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়াও ক্ষমা করা চলে এবং তদ্রূপ ক্ষমাই নিষ্কলঙ্ক ক্ষমা কিন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়িলে ব্যভিচারিণী স্ত্রী বা তাহার ব্যভিচার-সহায়ক পুরুষটী তোমাকে ক্ষমা নাও করিতে পারে। অপরাধ করিতে করিতে তাহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহাদের কাজে বাধা, বিঘ্ন, অপবাদ বা শাসন সৃষ্টি করিবার অধিকার স্বামীরও নাই, সমাজেরও নাই। ফলে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া তাহারা সঙ্গে সঙ্গে তোমার অনিষ্ট-সাধনে তৎপর হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে তোমার প্রয়োজন সাহস ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের। ক্ষমাই তুমি করিবে, এই সঙ্কল্প নিয়াই সাহস করিয়া তাহাদিগকে হাতে-নাতে ধরিতে হইবে। ব্যভিচারিণী স্ত্রী যখন তাহার ধর্ম্মগুরুর সহিত ব্যভিচার করে তার নিজ স্বামীকে ফাঁকি দিয়া, তখন সে মনে মনে নিজেকেই এই কুযুক্তি দিয়া ফাঁকি দিয়া থাকে যে, বিবাহিত স্বামী ত' হইল নশ্বর জগতের সাময়িক স্বামী কিন্তু গুরুরূপী স্বামী হইল অবিনশ্বর জগতে জন্মজন্মান্তরের জন্য স্বামী, অতএব

ইহাতে ব্যভিচারের পাপস্পর্শ ঘটিল না। এই আত্ম-প্রতারণা তাহাকে মোহগ্রস্ত করিয়া রাখে বলিয়া ধরা পড়িলেও তাহার লজ্জা আসে না, বরং দৃপ্ত কণ্ঠে সে তাহার স্বামীকে অভিসম্পাত করিয়া বলিয়া থাকে, তুমি ত' নপুংসক আয়ান ঘোষ মাত্র, তোমাকে আবার পরোয়া কি? এদেশে ব্যাভিচার-সহায়ক গুরু বা গুরুদেবস্থানীয় ব্যক্তিদের অভাব নাই, হয়ত বা রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সমাজেও এইরূপ কিছু গুরু বা গুরু স্থানীয় ব্যক্তিরা এক সময়ে সমস্ত গ্রামের যাবতীয় ধর্ম্মবুদ্ধি রমণীর গোপনে পাণিপীড়ন করিয়া গ্রামের জনসংখ্যা বর্দ্ধিত করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নাচ, গান, নাটক, অভিনয়, ছায়াছবি, সংস্কৃতি-সম্মেলন আদি নানা প্রকারের ব্যাপার সভ্যতার মুখস পরিয়া জনতার মধ্যে উলঙ্গ নৃত্য শুরু করিয়া দেওয়াতে তথা-কথিত পতিব্রতা রমণীদের মধ্যে পাতিত্যের সংখ্যা ও সম্ভাবনা দিনের পর দিন বাড়িতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। দীর্ঘকালের পরাধীনতার ইহা অবশ্যম্ভাবী কুফল বলিয়া আমরা বর্ণনা করি। কিন্তু প্রাংশুলভ্য স্বাধীনতা একদা এক আশ্চর্য্য প্রভাতে আমাদের হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িলেও কাব্যে, সাহিত্যে, নাটকে, গান-বাজনার আসরে চরিত্রহীন জাতির মেরুদণ্ড-ক্ষয়কারী কালো কোকিলের কুহুরব অনেক সংসারে যে আগুন ধরাইয়া দিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? শিক্ষা-

সমস্যা ধরিবে নবরূপ, অন্ন সমস্যা আনিবে মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষের কালো ছায়ার তলে তলে বিলাস-বহুলতার রজত-রশ্মি শুরু করিবে ইন্দ্রজালের রচনা, যাহার ধাঁধায় পথ ভুলিয়া সুরুচিশালিনীকে কুরুচিতে ধরিবে, সংযমশালিনীকে ব্যভিচারে ছুঁইবে। নারীর ব্যভিচার পুরুষকে বাদ দিয়া হইতে পারে না বলিয়াই নারীর ব্যভিচার একই কলসীতে দড়ি বাঁধিয়া নারী ও পুরুষ উভয়কে অতল-তলে ডুবাইতে। সন্দেহ নহে, ক্ষমাই তখন ঔষধ।"

কন্যার ব্যভিচার নিবারণ

বর্দ্ধমান-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সুশিক্ষিত কন্যা ব্যভিচারের পথে পা বাড়াইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিতেছ। মনের এই সন্দেহকে ভাষায় বা আচরণে কখনো প্রকাশ করিও না। লক্ষ্য রাখা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়াই লক্ষ্য রাখ, দৃষ্টিকে সজাগ রাখা তোমার আবশ্যক বলিয়াই তাহাকে সজাগ রাখ কিন্তু সাবধান, ঘুণাক্ষরেও মনের সংশয় নিজ কন্যার নিকটে প্রকাশ করিও না। প্রাপ্তবয়স্ক সুশিক্ষিতা কুমারী কন্যার নিকটে বিবেকের চেয়েও আত্মসম্মানজ্ঞান খরতর। নানা প্রসঙ্গে রমণী-শিরোমণি মহিমোন্নত-চরিত্রা বিশেষ বিশেষ মহিলাদের জীবনের সৌন্দর্য্য, তপস্যার ঐশ্বর্য্য, চরিত্রের

বীর্য্যবত্তা প্রভৃতি সম্পর্কে দুই চারিটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া কথা-প্রসঙ্গে একটুখানি করিয়া কাজ করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে পার। তর্কে প্রবেশ করিবে না। তিরস্কারের পথে নামিবে না, মনের উষ্মা প্রকাশ হইতে বিরত থাকিবে। অতীতের মহতেরা প্রলোভন-জয়ে যাহা যাহা করিয়াছেন, সুশিক্ষার গুণে আমাদের পুত্রকন্যারা তাহাকে কুসংস্কার বা পাগলামি বলিয়া সংজ্ঞিত করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সত্যের নিজস্ব সৌন্দর্য্যের একটা সূক্ষ্ম আবেদন আছেই, যাহা তর্কস্থলে কেহ স্বীকার না করিলেও মনের আড়ালে নিজের কাজটুকু করিয়াযাইতে থাকে। মাতা যেখানে বৃদ্ধা, পিতা যেখানে উপার্জ্জনহীন, সেখানে প্রাপ্তবয়স্কা শিক্ষিতা উপার্জ্জনশীলা কন্যার সন্দিগ্ধ আচরণ নিয়া প্রতীকার-চেষ্টায় বড় বিচক্ষণতার প্রয়োজন ঘটে। আজ যাহার বিবেক সুষুপ্ত, কাল তাহার বিবেক জাগ্রত হইতে পারে, এই শুভ-সম্ভাবনার ক্ষীণ আলোটুকুর দিকে তাকাইয়া তোমরা ধৈর্য্য ধরিয়া কালপ্রতীক্ষা কর।"

পুত্র উন্মার্গগামী হইলে

ঐ পত্রেরই পরবর্ত্তী অংশে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুত্র যদি উন্মার্গগামী হয়, তাহা হইলে তাহার সম্পর্কে এত নিরীহ উপায় অবলম্বনীয় নহে। তাহাকে জানিতে দিতে

হইবে যে, তুমি সব জানিয়াছ কিন্তু পুত্রস্নেহবশতঃ তুমি কোনও চূড়ান্ত শাসন করিতে পারিতেছ না। তাহাকে বুঝিতে দিতে হইবে যে, তাহার বন্ধু-স্বজনেরাও সব জানিতে পারিতেছে এবং তাহার প্রতি ক্রমশঃ শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছে কিন্তু হায়, ইহার প্রতীকারোপায় তোমার হস্তে নহে, ইহার প্রকৃত প্রতীকার নিজ চরিত্রকে সংশোধন করিয়া নিয়া তোমার পুত্রকেই করিতে হইবে। জানি নাই, বুঝি নাই বলিয়া ভাণ করিও না কিন্তু পুত্রকে নিজের শক্তিতে নিজের উদ্ধার করিয়া নিবার প্রেরণা স্বতঃ এবং পরতঃ যখন পার দিও। সন্তান একবার চরিত্রভ্রষ্ট হইলে তাহাকে সন্নীতির পথে টানিয়া আনা বড় শক্ত ব্যাপার।"

কুমারী কন্যার দীক্ষা সম্পর্কে

ফরিদপুর জেলান্তর্গত তুলাসার-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গায়ে পড়িয়া কাহাকেও দীক্ষা দেই না, ইহা ত' জান। নিজরা আগ্রহ করিয়া যাহারা দীক্ষা নিতে আসে, তাহাদের ভিড় কমাইবার জন্য অনেক সময়ে বহু লোককে দীক্ষাদান হইতে বিরত থাকি, ইহাও ত' জান। তথাপি লক্ষ্য করিও যে, কুমারী মেয়েরা অত্যধিক সংখ্যায় দীক্ষা নিতেছে। পিতামাতার অনুমতি না নিয়া কেহ দীক্ষা নিতে আসিলে

তাহাকে আমি দীক্ষা প্রদান করি না, তাই ইহারা পিতা-মাতার অনুমতি নিয়াই আসে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধন-ভজনে এত গভীর ভাবে নিমগ্ন হয় যে, দেখিলে ভক্তি আসে। কিন্তু একটী চিন্তা আমাকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেই ত' ভবিষ্যতে বিবাহিতা হইবে। পিতামাতা সুপাত্র দেখিয়াই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। কিন্তু সেই সকল জামাতা যদি ঈশ্বরদ্রোহী হয়, তখন কি হইবে? সেই সকল জামাতা ঈশ্বরানুরাগী হইয়াও যদি ভিন্ন পথের পথিক হইয়া থাকে এবং স্ত্রীকে তার পরিগৃহীত পথ পরিত্যাগ করিতে পীড়াপীড়ি করে? অথবা সেই সকল জামাতা এই সকল দিক দিয়া নিজে কোনও প্রকারের অশোভন মনোভঙ্গী পোষণ না করিলেও যদি জামাতার পিতামাতা ও পরিজনেরা বধূর ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনপন্থার প্রতি বিদ্বেষী ও অসহিষ্ণু হয়? এ সকল কথা হজরৎ মহম্মদ নিশ্চয়ই চিন্তা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য বিধান দিয়াছিলেন যে, মুসলমান-কন্যাকে বিবাহ করিতে হইলে বরকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেই হইবে। নিজ ধর্ম্ম পরিহার করিয়া কোনও মুসলমান পরধর্ম্ম গ্রহণ করুক, ইহা পৃথিবীর একটী মুসলমানও সহ্য করিতে সমর্থ নহে। এই অসহিষ্ণুতা রাজনৈতিক দিক দিয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে লাভবান্ করিয়াছে, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। হিন্দুরা ধর্ম্মাচরণের ব্যাপারকে রাজনৈতিক

সুবিধা-অসুবিধার দৃষ্টিকোণ হইতে কদাচ দেখে নাই এবং একই পরিবারের মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব বা বৈদান্তিকের একত্র অবস্থানকে একটা সমস্যা বলিয়া অধিকাংশ সময়েই ধারণা করিতে যায় নাই। কিন্তু কুমারী কন্যার দীক্ষার প্রয়োজন সত্যই আছে এবং সেই দীক্ষাটী পাইবার পরে বিবাহিতা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধন-মার্গ লইয়া সঙ্কট সৃষ্ট হওয়া তাহার পক্ষে সত্যই উদ্বেগজনক। এই বিষয়ে আমি নিরন্তর ভাবিতেছি। .... তবে একদা আমার কুমারী কন্যাগণ যে সাধনে দীক্ষিতা হইয়াছে, তাহাই তাহাদের সমস্ত সধবা-জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রকে যে সুনিশ্চিতই আলোকিত ও পুলকিত করিবে, এই বিষয়ে আমি কণামাত্রও সন্দেহ পোষণ করি না। আপদ-বিপদ যেখানে যাহা ঘটুক, উহাকে মধ্য যুগের মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার বলিয়া মনে করি। তোমরা যখন তোমাদের কুমারী কন্যাকে আমার নিকটে দীক্ষিতা করিয়া একবার নিয়াছ, তখন তাহাদিগকে নিষ্ঠা-সহকারে সাধন করিতে অবিরাম প্রেরণা দিতে থাক। তাহাদের সাধন-নিষ্ঠা তাহাদের চরিত্রবল বাড়াইবে এবং সমগ্র জীবন জুড়িয়া নিজেদের সৎপ্রভাব দ্বারা অন্যদের মানসিক গঠনের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নিবার যোগ্যতা দিবে। দুর্ব্বার বিক্রমে ইহারা সাধন করিতে থাকুক, সাধনের ফলে দিগ্বিজয়ের ক্ষমতা ইহারা অর্জ্জন করুক। একদা পরের সংসারে গিয়া ইহারা নিজেদের নেতৃত্ব নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।"

উৎকৃষ্টতর পথপ্রদর্শক

হুগলী জেলান্তর্গত হরিপাল-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দেশহিতৈষী চিন্তাশীল এমন অনেক মনীষী আছেন। যাঁহারা নিজেদের সুচিন্তিত ও স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত-সমূহের দ্বারা জনসমাজকে পথ-নির্ণয়ের সুযোগ করিয়া দেন। তাঁহারা নমস্য। তাঁহারা অনেক কাজেই নিজেরা হাতেকলমে যোগদান করিতে সমর্থ হন না বলিয়া উপেক্ষণীয় নহেন। কিন্তু যাঁহারা নিজেদের শুদ্ধ চিন্তার অবিরাম পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যতঃ তাহার কতক কতক দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করেন, তাঁহারা উৎকৃষ্টতর পথ-প্রদর্শক। কেবল বচনামৃত বিলাইয়া বা রচনামৃত শুনাইয়া ততখানি কাজ করা যায় না, নিজে আবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিলে দিগ্‌ভ্রান্তদের যতখানি সহায়তা করা যায়।"

সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দেওয়ার অর্থ

জনৈকা পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি তোমার মনঃপ্রাণ আমাতে ঢালিয়া দিতে চাহ। কেন চাহ, তাহা তুমিই জান কিন্তু আমাকে কি কখনও সমুদ্রের চেয়ে গভীর, আকাশের চেয়ে উদার, হিমালয়ের

চেয়ে উর্দ্ধগামী, নক্ষত্রগণের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সূর্য্যদেবের ন্যায় আলোর উৎস বলিয়া বুঝিয়াছ? যদি দৈবক্রমে তেমন কিছু উপলব্ধি পাইয়া থাক, তবে আমাতে তোমার আত্মনিমজ্জন সম্ভবও হইবে, সফলও হইবে। আমাকে যদি রক্তমাংসে গড়া একটা মানুষ, দোষে-গুণে গড়া একটা জীব, ভালমন্দের মিশ্রণে একটা ব্যক্তিবিশেষ মাত্র বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, তবে এই আত্মনিমজ্জন সম্ভব হইবে না। যে আমাকে সব দেয়, আমি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করি, এই কথাটা শাশ্বত সত্য। কিন্তু সব দাও, সব দাও বলিয়া আমি কখনও কোনও রব তুলি নাই বা মনে মনেও অভিলাষ পোষণ করি নাই। যে দিবার, সে আপনা আপনিই দিবে এবং সাধন করিতে করিতে তাহার দিবার রুচি, আগ্রহ ও সামর্থ্য আসিবে। যে আমাকে তার সর্ব্বস্ব দেয়, সে পবিত্র থাকে, নিষ্কলঙ্ক থাকে, নির্ম্মল থাকে। আমি তোমাদের কাছে ধন চাহি না, মান চাহি না, পার্থিব জগতের কোনও প্রকারের আদান-প্রদান তোমাদের সঙ্গে রাখিতে চাহি না, অথচ তোমাদের সর্ব্বস্ব পাইলে আমি খুশী হই। এখন ভাবিয়া দেখ, এই সর্ব্বস্বটা কি বস্তু, কেমন বস্তু, এই বস্তু তোমাতে আছে কিনা, না থাকিলে তোমার আসিবে কি করিয়া। থাকিলেও অনেকে অনেক কিছুই দিতে পারে না, দিবার সময়ে তুমি দিবে কি করিয়া, ইহাও ভাব। আমি

তোমার কিছুই চাহি না, অথচ আমি তোমার সর্ব্বস্ব চাহি, এই কথার তাৎপর্য্য কি, একবার ভাবিয়া দেখ। আমি গুরু, আমি কোনও অবস্থাতেই তোমাদের নিকটে লঘু হইতে পারি না। কোনও কিছুর জন্য লালায়িত হওয়া-মাত্রই গুরুর গুরুত্ব হ্রাস পাইয়া থাকে। আমি সুদীর্ঘকাল নির্লোভ, নিষ্কিঞ্চন জীবন-যাপন করিয়া আসিতেছি, আমি জীবনের দ্বাদশটী মূল্যবান বৎসর স্ত্রীমুখ-দর্শন হইতে যত্ন-সহকারে বিরত ছিলাম,—সুতরাং পার্থিব ভাবে নিজের সুখ বা স্বার্থের জন্য তোমার কাছে যে কিছুই চাহিতে ত' দূরের কথা, প্রত্যাশাও করিতে পারি না, ইহা ত' স্পষ্টই বুঝিতেছ। তথাপি তোমার সর্ব্বস্ব চাহিতেছি কি প্রকারে? তোমার সমস্তটী জীবন তুমি তোমার সেবা জগদ্বাসীকে দিবে, ইহাই হইবে তোমাকে আমার পাওয়া। ভগবান্ তোমাকে ভাবী জীবনে যেখানে যে অবস্থাতে রাখুন, তুমি সেই অবস্থার সুযোগটুকু নিয়া, সেই অবস্থার দুর্য্যোগগুলিকে আগ্রাহ্য করিয়া নিজেকে জগতের কল্যাণকর কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া রাখিবার আপ্রাণ প্রয়াস পাইবে,—ইহাই হইবে তোমাকে আমার পাওয়া। তুমি ত' উজাড় করিয়া নিজেকে দিতে চাহ, আমি ত' সম্পূর্ণরূপে তোমাকে চাহি, কিন্তু এই দেওয়া এবং এই পাওয়ার প্রকৃত পন্থা হইতেছে, উপরে যাহা বলিলাম, তাহা। হাঁ মা, প্রতিটি মুহূর্ত্তে তুমি নিজেকে দিতে থাক, আমিও প্রতিটি মুহূর্ত্তেই

তোমাকে গ্রহণ করিতে থাকিব। তোমার মনে ভাবের জোয়ার আসিয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিতেছি। এইরূপ ভাবের জোয়ার অনেকের মনে আসে। দীক্ষাদাতা গুরুদেবেরা অনেক সেই জোয়ার-জল নিজেদের ব্যক্তিগত অভিলাষ, স্বার্থ, সুখলোভ ও চারিত্রিক দুর্ব্বলতা দ্বারা পঙ্কিল করিয়া নিয়া মহাপ্লাবন-ধন্যা যমুনার তীর-ভূমিতে পুরীষোৎসর্গ করিয়া তাহাকে কলঙ্কিত করিয়া দেয়। আরও অনেকের জীবনে মা তোমার জীবনের মতই যখন জোয়ারের বান্ ডাকিতে দেখিবে, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিও। এমন একটী কাজও যেন তাহারা না করে, যাহা নিন্দনীয়, এমন একটী কথাও যেন তাহারা না বলে, যাহা অপ্রশংসনীয়, এমন একটী চিন্তাও যেন তাহারা না করে, যাহা জুগুপ্সিত। পথ পিচ্ছিল থাকে, তখন তাহা বিপজ্জনক কিন্তু হিমালয়ের শৃঙ্গে উঠিয়া কাহারও পতন ঘটিলে সেই পতন মারাত্মক।"

শৈশবের শিক্ষা

হুগলী জেলান্তর্গত কামারপুকুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ছোট শিশুটীকে এখন হইতেই নানা কুকথা শুনাইয়া বা নানা কুকার্য্যে দেখাইয়া কুশিক্ষার একটী আড়তে পরিণত করিও না। এই শিশুর অস্ফুট মনে এখন যে সব রেখায়

ছাপ পড়িবে, সেগুলি সবই ভবিষ্যতে বৃহৎ ও সুস্পষ্ট হইয়া তাহার জীবনে প্রকাশ পাইবে। তোমরা এই কচি বয়সেই পুত্রকন্যাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে পার না বলিয়াই এই সব শিশুকে তাহাদের কৈশোরে শিক্ষকেরা আর বাগ মানাইতে পারিতেছে না। যৌবনে তাহারা হইতেছে উদ্ধত এবং পূর্ণ বয়সে মাতাপিতার প্রতি চূড়ান্ত-ভাবে উদাসীন বা অকৃতজ্ঞ। রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের কারণ জানা প্রয়োজন। সমগ্র দেশ যে মনোবিকারে ভরিয়া গেল, ইহার অলক্ষ্য মূলদেশ যে পিতামাতার অসতর্কতার মধ্যে নাই, একথা হলপ করিয়া কে বলিতে পারিবে? পিতামাতারা পুত্রকন্যার জনক-জননী হইয়াই ভাবিতে বসিয়া গেলেন যে, শিক্ষকেরা ইহাদের মানুষ করিবে,—ইহা গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার মতন মূর্খতা। পিতামাতা শৈশবের শিক্ষাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে দিয়া উঠিতে পারিলে তবে ত' শিক্ষকদের আর অধ্যাপকদের পরিশ্রম পরবর্ত্তী কালে অশেষ কুশলের কারণ হইবে। ছেলে হইল, না গাধা হইল, ইহার চূড়ান্ত নির্ণায়ক ত' পিতামাতা। শিক্ষক ঘোড়াকে আরও ভাল ঘোড়া, নির্গুণ গাধাকে গুণশালী গাধায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। পিতামাতা পুত্রকন্যাকে যাহা দিয়া দিতে সমর্থ, তাহা যদি অবহেলা করিয়া না দেন, তবে শিক্ষক কদাচ তাহার অভাব পুরণ করিতে পারেন না।"

লোকের বিপদে সান্ত্বনা-দান

হুগলী জেলান্তর্গত খানাকুল-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাহারও বাড়ীতে বিপদ ঘটিয়াছে জানিলে তাহাকে সান্ত্বনা, সাহস ও প্রবোধ দিবার জন্য হিতৈষীদের কর্ত্তব্য তাহার বাড়ীতে যাওয়া, ধীর ভাবে বিপন্ন বা শোকার্ত্তদের কথাগুলি শোনা এবং সকল কথা শুনিবার পরে সর্ব্বদা সহযোগের আশ্বাস প্রদান করা। মনুষ্যত্বের বোধযুক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা কর্ত্তব্য। সাধারণ পশুপক্ষীর মধ্যে এই কর্ত্তব্যের প্রেরণা না দেখা যাইতে পারে কিন্তু কোনো কোনো পশুতে ও পক্ষীতে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। একটী বানর বা হস্তী বিপন্ন হইলে সহস্র বানর বা শত হস্তীকে পরিত্রাণের উপায় অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। যে মানুষটা মরিয়া গিয়াছে বা গৃহদাহে যে জিনিষ-পত্রগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সে বা তাহাদের মধ্যে কোনও কিছু তোমার প্রবোধ-বচনে ফিরিয়া আসিবে না কিন্তু শোকার্ত্তের শোক, দুঃখার্ত্তের দুঃখ, বেদনাহতের বেদনা, ব্যথাতুরের ব্যথা তাহাতে কমিবে। শোক, দুঃখ, ব্যথা ও বেদনার শারীরিক কোনও রূপ নাই, তাহারা, মনের জিনিষ। আবার মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে মুখের ভাষা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তুমি যদি

তোমার মুখের কয়েকটী অকপট স্নিগ্ধ-করুণ মধুর বাক্যের দ্বারা কাহারও মনের ক্লেশ কমাইয়া দিতে চেষ্টা কর, তবে তাহা তোমার একটী সুমহতী সেবা বলিয়া গণ্য হইতে অধিকারী। মুখের অপকথায় জীবন্তও মরে বা ম্রিয়মাণ হয়, মুখের মধুর ভাষায় মুমূর্ষুও বাঁচে, নবজীবন পায়। স্বভাবতঃ যদি কর্কশভাষী না হইয়া থাক, স্বভাবতঃ যদি মানুষের গুণ-দর্শনে পটু হইয়া থাক, স্বভাবতঃ যদি অপরের দুঃখে সংবেদনশীল হইয়া থাক, তবে লোকের বিপদে আপদে তাহাকে সান্ত্বনা ও সাহস দিবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করিবে। কিন্তু লোককে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া তাহার বাড়ীতে ভদ্রতা, শিষ্টতা, সুজনতার ত্রুটী হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিবার মতন দোষদর্শী চরিত্রের লোক যদি তুমি হইয়া থাক, তবে তোমার সান্ত্বনা-ভাষণ শুনাইবার জন্য কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। তোমার অপ্রত্যাশিত গমনের ফলে যদি সান্ত্বনালাভকারী শোকার্ত্ত ব্যক্তির বা পরিবারের কোনও অসুবিধার সৃষ্টি ঘটিতে পারে বলিয়া মনে কর, তবে এমন ক্ষেত্রে দূর হইতেই মনে মনে তাহাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিও। যেখানে গায়ে পড়িয়া সান্ত্বনা দিতে গেলে সন্দিগ্ধতা সৃষ্টির অথবা অপব্যাখ্যা হইবার সম্ভাবনা, সেখানে লোক-দেখানো সান্ত্বনা-দান হইতে বিরত থাকিও। যেখানে শোকার্ত্ত ব্যক্তির সহিত তোমার নিজের বা স্বকীয় পরিচিত বান্ধবদের

কোনও পরিচয় নাই, সেখানে গিয়া সান্ত্বনা-বচন না ঝাড়াই সঙ্গত। লোককে সান্ত্বনা-দান যাহাতে তোমার একটা ফ্যাশানে পরিণত না হয়, তদ্বিষয়েও সাবধান থাকিও।"

অপপ্রচারে ক্ষোভ রাখিও না

দিনাজপুর জেলান্তর্গত বালুরঘাট-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি যে দেশ বা সমাজের জন্য কিছু কাজ করিয়াছ, তাহার বিবরণ যে কোনও সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিল না বা তদ্বিষয়ে লোকমুখে যে একটী প্রশংসা-বাক্যও উচ্চারিত হইল না, তজ্জন্য মনে কোনও ক্ষোভ বা দুঃখ রাখিও না। দেশসেবা এক চমৎকার কাজ, যাহাতে আত্মপরিচয় গোপন রাখিতে হয়, যাহাতে কাজ করিতে হয় সকলের চক্ষুর অন্তরালে, যাহাতে নাম-যশ আদি আসিলেই কাজে ভেজাল ঢুকিতে শুরু করে। বড় বড় নেতাদের আচরণ ও বিচরণ হইতে অধিকাংশ স্থলেই তোমাদের শিক্ষণীয় জিনিষ বিশেষ কিছু নাই। নামযশে আস্থাহীন প্রকৃত কর্ম্মী জনসেবক যদি কখনও দেখিয়া থাক বা যদি এমন মানুষের খবর কখনও লোকমুখে পাইয়া থাক, তবে সেই সুদুর্লভ-চরিত্র মানুষটার দৃষ্টান্তই অনুসরণ কর। অপ্রচারে দুঃখিত হইও না, কিন্তু কাহারও দ্বারা কোনও প্রকারের অপপ্রচার ঘটুক, তাহার

কোনও রাস্তা বা রন্ধ্র খোলা রাখিও না। তোমার কাজ এমন হউক যেন নিতান্ত দোষদর্শী ব্যক্তিও তোমাকে মিথ্যা নিন্দা দ্বারা আক্রমণ করিবার কোনও সঙ্গত সুযোগ না পায়।"

স্ত্রীশূদ্রে প্রণবাধিকার ও তার যোগ্যতা

দিনাজপুর জেলান্তর্গত ভুরকুটপাড়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হিন্দুর শাস্ত্র অগাধ ও অপরিমেয়। এই শাস্ত্র-নিবহের কোন্ স্থানে কি কথাটী যে আছে, কোন্টুকু যে প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্টুকু সত্য সত্য ঋষিবাক্য, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা কাহারও আছে বলিয়া মনে করি না। এমতাবস্থায় শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়া যাঁহারা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের বিপরীত কথা সব প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা হয় জ্ঞানপাপী বলিয়া ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছেন, নতুবা জ্ঞানিজনগণমধ্যে সুসম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞান বলিয়াই বাল্যকালের সঞ্চিত পারিবেশিক কুসংস্কারের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আবল তাবল বকিতেছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে। ওঙ্কার-মন্ত্র জপ করিলে কামুকের কাম বাড়ে, ক্রোধীর ক্রোধ বাড়ে, ঈর্ষ্যীর ঈর্ষ্যা বাড়ে, লম্পটের লাম্পট্য বাড়ে, দুশ্চরিত্রের ভ্রষ্টচরিত্রতা বাড়ে, এই সকল উদ্ভট কথা যাঁহারা প্রচার

করিতেছেন, আমি বলিব, তাঁহারা জীবনে কখনো ওঙ্কার-মন্ত্রের সাধনা করিয়া দেখেন নাই, অন্য মন্ত্রের প্রতি নিজেদের আসক্তিহেতু বা স্ত্রীশূদ্রাদির প্রতি অকারণ বিদ্বেষহেতু জানিয়া শুনিয়া অসত্য-ভাষণ ও অসত্য-প্রচার করিতেছেন। এমন ব্যক্তিরা সমাজে সম্মান পাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের নির্ব্বোধ উক্তি-সমূহকেও বেদবাক্যের সম্মান দিতে হইবে, আমি তাহা মনে করি না। ওঙ্কার-মন্ত্র জপ করিলে কুম্ভীপাকে পড়িতে হইবে, রৌরবে যাইতে হইবে ইত্যাদি বলিয়া যাঁহারা মানুষকে নরকের ভয় দেখাইয়া সর্ব্বমন্ত্রের সার হইতে, শ্রেষ্ঠমন্ত্র প্রণব হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাহেন, তাঁহারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লোক-প্রতারণাই করিতেছেন। আমাকে যাহারা বিশ্বাস কর, তাহারা নির্ভয়ে ওঙ্কার-মন্ত্র জপ করিয়া যাইতে পার। ইহাতে যদি তোমাদের নরক হয়, তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে নরকে যাইতে প্রস্তুত আছি। তবে, আমি যে স্ত্রী-শূদ্রে নির্ব্বিচারে প্রণবাধিকার দিয়া যাইতেছি, তাহার সহিত একটি সর্ত্ত আছে। তোমাদিগকে দর্প, দম্ভ, অহঙ্কার ও অভিমান হইতে মুক্ত সুন্দর সৎ জীবন যাপন করিতে হইবে। মদের বোতল বুকে জড়াইয়া গলির মোড়ে নর্দ্দমার মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিবে আর বলিবে, 'ওঙ্কার জপ করিব', পরের বধূকে প্রণয়-পত্র লিখিবে আর বলিবে 'ওঙ্কার জপ করিব', কেহ ঈশ্বরেচ্ছায় উচ্চ কুলে

জন্মিয়াছে দেখিলে তাহার প্রতি অপ্রতিরোধ্য বিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকিবে আর বলিবে—'ওঙ্কার জপ করিব', অপরের ধন-জন-সমৃদ্ধি দর্শনে ঈর্ষ্যাকাতর হইয়া তাহার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইবে আর বলিবে 'ওঙ্কার জপ করিব', অপরের মত, পথ, মন্ত্র তোমা হইতে ভিন্ন বলিয়া তাহার প্রতি হিংসাভাব পোষণ করিবে এবং তাহাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিন্দা, মিথ্যাচার, অসত্য-প্রচার ও অসৌজন্য অবলম্বন করিবে আর বলিবে 'ওঙ্কার জপ করিব',—ইহা হইতে পারে না। ওঙ্কার জপ করিতে হইলে, ইহা জপের জন্য মানসিক ও আত্মিক যোগ্যতা সঞ্চয়ের জন্যও তোমাকে চেষ্টিত হইতে হইবে। পরমেশ্বরের যে-কোনও নামে যে-কেহ ভজনা করুক, তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই এই কথাটী খাটে।"

ব্রাহ্মণ ও গায়ত্রী

হাওড়া জেলান্তর্গত আমতা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতেই ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা হীনবল হইয়া গেল, সুতরাং গায়ত্রী তাহাদের ত্যাগ করাই উচিত,—তোমার এই মত তথ্যের দিক দিয়াও ভুল, সিদ্ধান্তের দিক দিয়াও ভুল। আজকাল ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা গায়ত্রী-মন্ত্রকে ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়াই তাহাদের বর্ত্তমান অধোগতি। তাহারা

নিজেরাই গায়ত্রী-মন্ত্র ছাড়িয়া দিয়া অন্য শত শত মন্ত্র জপ করিয়া যাইতেছে। গায়ত্রী-মন্ত্রের মধ্যে মানুষের কামনা-বাসনার প্রসঙ্গ নাই, আপাতরমণীয় স্বর্গভোগাদির প্রলোভন নাই বা অন্য কোনও প্রকার চিত্তচমৎকার স্বার্থকে লাভ করিবার প্ররোচনা নাই দেখিয়াই মূর্খাদপি মূর্খ ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা স্বেচ্ছায় ইহার পত্রচ্ছায়া পরিহার করিয়া দূরে সরিয়া রহিয়াছে এবং অব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকদিগকে ইহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। গায়ত্রী জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানহীন জাতি দুর্ব্বল ও ক্লীব। সমগ্র জাতিকে জ্ঞানের শক্তি হইতে বঞ্চিত রাখার ফলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণেরাও দুর্ব্বল হইয়াছেন। হাত, পা, পেট, পিঠ সব দুর্ব্বল থাকিলে মস্তিষ্কটাও কি সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না। অপরকে জ্ঞান এবং সাধনা হইতে বঞ্চিত রাখিলে সেই বঞ্চনার প্রতিফলন বঞ্চনাকারীর উপরেও আসিয়া পড়ে। জ্ঞান এবং সাধনার অধিকার সকলকে সমান ভাবে দান করিয়া যাইতে থাকিলে ব্রাহ্মণের সেই পাতিত্য ঘটিত না, যাহা বর্ত্তমানে ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা স্ত্রী-শূদ্রাদি সকলকে আস্তে আস্তে উচ্চতম মন্ত্র ও সাধনার অধিকার দিতে যে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহার সমগ্র দোষটাই তাঁহাদের উপরে নিক্ষেপযোগ্য নহে। যাহাদিগকে ইহা দিবেন, তাহাদের উপরেও ইহা বহুলাংশে নির্ভর করে। অনেক বার ব্রাহ্মণেরা কেহ কেহ স্ত্রীশূদ্রাদিকে ইহা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু

কুসংস্কার বশতঃ, সাহসের অভাব বশতঃ, আত্মদৈন্য বশতঃ, দুর্ব্বলতা বশতঃ, অজ্ঞানতা বশতঃ, এবং সর্ব্বশেষে কদাচারের প্রতি আসক্তি বশতঃ নারীরা, বহু শূদ্রেরা এই অধিকার অর্জ্জনের দিকে আগাইয়া আসে নাই। এই সকল ত্রুটি আজিকার মানুষগুলির মধ্যে ব্যাপক ভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে। দয়ানন্দ সরস্বতী বা রামমোহন রায়কে কেবল সনাতনী পণ্ডিতেরাই বিরুদ্ধতা দেন নাই, সমাজের নিম্নস্তরের মানুষগুলিও অগ্রসর হইয়া ইঁহাদের সমীপস্থ হয় নাই। রামমোহন বড়দের সান্নিধ্যে বিচরণ করিতেন, ছিলেন উপাধিধারী এক রাজা, এই তথ্যের উপরে নির্ভর করিয়া একথা বলা চলে না যে, তিনি আগ্রহী নিম্নজাতীয় লোকগুলিকে হাতের কাছে পাইলে কোলে তুলিয়া নিতেন না। দয়ানন্দ কেবল রাজা ও জমিদারদেরই গুরু ছিলেন না, তিনি নীচ জাতি বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই। এমন কি তিনি ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুদের পাতিত্যদশায়ও তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে কুণ্ঠিত হন নাই। তবু কি তাঁহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে? পারিলেন কি তিনি ছোট বড় সকলকে ব্রহ্মগায়ত্রীতে উদ্বুদ্ধ করিতে? যাহারা গরজ করিয়া নিকটে আসিতে চাহিল না বলিয়াই দূরে পড়িয়া রহিল এবং পরবর্ত্তী আর এক ধর্ম্ম-প্লাবনে ভিন্নতর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জ্জনের ভিন্নতর এক খেলার ক্রীড়াসামগ্রী হইয়া রহিল,

তাহাদের পাতিত্যের দায়িত্ব এই সকল সমাজ-সংস্কারকামী মহাপুরুষদের নহে। রামমোহন ও দয়ানন্দ উভয়েই যে ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন, একথা সর্ব্বজনবিদিত।"

কাম নিরর্থক নিষ্প্রয়োজন জিনিষ নহে

অপরাহ্ণে দুর্গাবাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণির ময়মনসিংহের ত্রয়োদশ ভাষণ শুরু হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাম যে স্বাভাবিক, কামের তাড়নাও যে স্বাভাবিক, এই কথাটা আগে বুঝে নাও। কাম নামক একটা বস্তুর এই জগতে প্রয়োজন আছে বলেই কাম আছে। তার প্রয়োজন কি এবং কতটুকু, এই বিষয়টা ভাল ভাবে চিন্তা ক'রে নাও। তারপরে কেবল সঙ্কল্প কত্তে থাক যে, এর তুমি সদ্ব্যবহার ছাড়া অন্য রূপ ব্যবহার কর্ব্বে না। কামের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে যার ধারণা যত সুস্পষ্ট, কামকে দমন করার ক্ষমতা তার তত বেশী। অধিকাংশ মানুষই কাম সম্পর্কে অত্যন্ত অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করে। সত্যিকারের কথাটুকু জানবার বা জানাবার সাহস পর্য্যন্ত অনেকের নেই। তারই ফলে কামকে কিম্ভূত-কিমাকার এক ভূতুড়ে বস্তু ব'লে ভয় ক'রে ক'রে মানুষ নিজের উপরে কামের রাজত্বকে স্থায়ী ক'রে বসে আছে। অনেক সময়ে কামকে চিনতে পারা বড়

শক্ত কিন্তু তার প্রকৃত সদ্ব্যবহারটুকুর সীমা ও মর্য্যাদা চিনতে অনেক সময় লাগবার কথা নয়। যারা কামকে চিনতে পারে, তারা অনায়াসে তাকে রূপান্তরও দিতে পারে। কিন্তু সত্যই তাকে চেনা বড় কঠিন। কখনো কাম আসে দয়া-রূপে, মায়া-রূপে, স্নেহ-রূপে, সহানুভূতি-রূপে, কখনো কাম আসে ক্রোধ-রূপে, দ্বেষ-রূপে, অধৈর্য্য অসহিষ্ণুতার রূপে, কর্ত্তৃত্বস্পৃহার রূপে। আরজিনা সাপের মতন কাম যে গাছের পাতায় পাতায় ঘোরে, সেই গাছের পাতার রংটী নেয়। কাম কখনো সেবার মূর্ত্তি ধরে, কখনো ধরে দানের মূর্ত্তি, কখনো ধরে ধার্ম্মিকতার ভাণ—যেন বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ। কাম সম্পর্কে সাবধান থাকাও কঠিন, কেননা তাহ'লে সারাদিন সারারাত কেবল আতঙ্কেই কাটাতে হয় যে, ঐ বুঝি কি একটা নূতন রূপ ধারণ ক'রে কাম এল। সুতরাং অত কাণ্ড করার দরকার নেই। স্পষ্ট ক'রে জেনে নাও আর বুঝে নাও যে, কামের সত্যিকারের প্রয়োজন তোমার পক্ষে কি এবং কি ভাবে তার ব্যবহার কর্লে তার সদ্ব্যবহার করা হবে। কামকে নিশ্চয়ই তোমার জীবনে প্রকৃত কাজে নিয়োগ কত্তে হবে। তার জন্যও প্রস্তুতি চাই, তার জন্যও সাধনা চাই। কামকে প্রকৃষ্ট রূপে ব্যবহারে আনতে হ'লেই আগে তোমাকে ব্যায়াম অভ্যাস ক'রে শরীরকে বলশালী কত্তে হবে। সচ্চিন্তার অভ্যাস ক'রে মনকে শুচিশুদ্ধ কত্তে হবে। বলশালী দেহ ও শুচিশুদ্ধ

মন নিয়ে যে কামকে ব্যবহার কত্তে পারে, তার কাম জগৎকে অসামান্য বস্তু দান ক'রে থাকে। কাম নিরর্থক নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষ নহে।

কামুকের নির্জ্জনতা ও সজ্জন-সঙ্গ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অত্যন্ত কামাসক্ত যার মন, তার পক্ষে একা একা নির্জ্জনে বাস করা হিতকর নয়। তাকে নিয়ত প্রকাশ্যে এবং সংসঙ্গে বাস কত্তে হবে। তার ফলে তার অভ্যস্ত কামচিন্তা আস্তে আস্তে তাকে ত্যাগ ক'রে স'রে যেতে বাধ্য হবে। সাধন-ভজনে মনকে গভীরভাবে নিবিষ্ট কত্তে ইচ্ছুক সাধককে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—অরতি-জনসংসদি—জনসমাগম থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু নিতান্ত কামাতুর ব্যক্তির পক্ষে নির্জ্জনে বৈরাগ্য রক্ষা সুকঠিন। তাই তাদের জন্য উপদেশ হচ্ছে—ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা,—ভবসমুদ্র পার হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য সজ্জনের সঙ্গ কর। পাঠ, কীর্ত্তন, সমবেত উপাসনা ইত্যাদিও সজ্জন-সঙ্গতিরই এক একটা নমুনা। এসব কাজে সর্ব্বদা নিজের অবসর সময়টুকুকে লাগিয়ে রাখলে কামের কলরব ক'মে যায়।

কামার্ত্ততা ও ঈশ্বর-প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বর-প্রেম কামার্ত্ততার আবর্ত্ত থেকে মানুষের দেহমনকে অতি সহজে রক্ষা করে। এই জন্যই সাধু-সন্তেরা দিকে দিকে কেবলই ঈশ্বর-প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন ক'রে থাকেন। তাঁরা সবাই মিলে ধাপ্পা দিচ্ছেন ব'লেই লোকে তাঁদের কথা মেনে নিচ্ছে, এরূপ সংশয় তোলা ভুল। ঈশ্বরপ্রেম অনেকের জীবনকে কামের পূতিগন্ধ থেকে রক্ষা করেছে, তার সহস্র সহস্র প্রমাণ আছে। অবশ্য, ঈশ্বর প্রেমের নাম ক'রে কেউ কেউ জগতে জিতেন্দ্রিয়ত্বের ভণ্ডামি করেছেন এবং লোক ঠকিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু বাজারে মেকি টাকা দুটা, চারটা বা দশ বিশটা পাওয়া যায় ব'লেই খাঁটি টাকাগুলিও জাল টাকা হ'য়ে গেল, এমন কথার যুক্তি নেই। ঈশ্বর-প্রেম অন্তরে দেয় বিমল প্রশান্তি, আর শান্তি এলেই কাম গেল। এজন্যই ঈশ্বর-প্রেমের পথে কামকে কব্জায় আনার চেষ্টা এই জগতে নানা দেশে সকল যুগে অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ক'রে এসেছেন।

কামদমন ও স্বদেশ-প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ঈশ্বর-প্রেম সকলের প্রাণে আবেদন জাগায় না। শিক্ষার গুণে, প্রতিবেশের প্রভাবে,

পরিবেশের মহিমায়, পরিস্থিতির প্রতাপে এবং নিত্য নূতন মানসিকতার আমদানীতে লোকের মন নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। তারা আর নিত্য, সত্য, শাশ্বত, সনাতন, অব্যয়, অক্ষয় পরমেশ্বরকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। তাদেরও ঔষধ আছে। দারুণ কামুকতায় বিহ্বল দুর্ব্বলতার সময়ে তীব্র স্রোতে নীয়মান নিজের অস্তিত্বকে বাঁচাবার জন্য মোটা মোটা গাছের শিকড় মাটির ভিতর দিয়ে এসে পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর খরধারার মধ্যে পড়েছে, যা হঠাৎ ধ'রে ফেলে সে সত্যই বাঁচবে। এ সকল শিকড়ের একটীর নাম স্বদেশ-প্রেম। বিগত ত্রিশ বৎসরের বাঙ্গালী-যুবকদের জীবনেতিহাস যদি অধ্যয়ন কর, তবে দেখতে পাবে, তারা স্বদেশকে ভালবেসে কি অসাধারণত্ব অর্জ্জন করেছিলেন, যার দরুণ তাঁদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-পথে পদস্খলন এক অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। স্বদেশ-প্রেম যখন খাঁটি থাকবে, ততক্ষণ সে ইন্দ্রিয় ঘটিত অমিতাচার ও অহিতাচার থেকে মানুষকে রক্ষা কর্ব্বেই কর্ব্বে। স্বদেশ-প্রেম সত্ত্বেও যতক্ষণ মানুষকে দেখা যাবে বিপথে বেপরোয়া হ'য়ে চলতে তখন বুঝতে হবে যে, এই স্বদেশ-প্রেমে ভেজাল রয়েছে। এই স্বদেশ-প্রেমকে ঘুণে ধরেছে। বাঙ্গালী-যুবকের শ্রদ্ধাপ্লুত চখের সামনে স্বদেশপ্রেম আর ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠ কাম-কাতরতার উর্দ্ধদেশে অবস্থিত সংযত জীবন একার্থবাচী।

বিশ্বপ্রীতি বা মানবপ্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনো কোনো দেশে কোনো কোনো কালে স্বদেশ-প্রেমকে অপরাধ ব'লে মনে করা হয়। ফলে স্বদেশ-প্রেমিকদের উপরে নির্য্যাতন চলে। তাতে প্রেমিকের প্রেম কমে না, বরং বাড়ে। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমের চেয়েও একটা বড় জিনিষ একদল কবি, একদল দার্শনিক ও একদল অর্থনীতি-বিশারদের কাছে ধরা পড়েছে। তার নাম বিশ্বপ্রেম, তার নাম বিশ্বমানবতাবাদ, তার নাম জগজ্জনমাত্রেরই জন্য ভালবাসা। এই ভালবাসা সত্য সত্য যার আছে, সে অতি সহজে কামজয়ী হয়। কামের রন্ধ্রপথে তার যে শক্তির অপচয়িত হবার ছিল প্রচুর সম্ভাবনা, আদর্শের মোহন-বংশীধ্বনি শুনে সেই শক্তি ছুটে যায় বিশ্বমানব-সেবায়।*

ময়মনসিংহ

৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৪২

(২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

পরিকল্পনা ও কর্ম্ম

দিনাজপুর জেলান্তর্গত লাহিড়ী-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

* পুরাতন পাণ্ডুলিপি ইন্দুরে কাটিয়া ফেলাতে বক্তৃতার উপসংহারীয় অংশ আর মুদ্রণ করা সম্ভব হইল না।

"যে-কোনও কাজ করিবে, সাধ্যমত গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া একটী পরিকল্পনা স্থির করিয়া নিয়া কাজ ধরিবে। কারণ, তোমার এই একটী কাজের সহিত ভাবী কালের অন্যান্য বহু কল্যাণ-কর্ম্মীর সৎপ্রয়াসে সংযোগ বা সহযোগ ঘটিতে পারে। দশ জনের দশটী পৃথক্ চেষ্টায় আরব্ধ কাজ একদা যে একটী বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ কাজের রূপ ধরিবে না বা তদ্রূপ রূপ-ধারণের আবশ্যকতা আসিবে না, তাহা কি করিয়া বলা যায়? অন্যদের নানাবিধ সৎপ্রয়াসের সহিত যাহাতে অবিরোধে তোমার প্রয়াস-পুষ্ট কাজটী চলিতে পারে, তাহার দিকে তাকাইয়াও পরিকল্পনা রচনা প্রয়োজন। কিন্তু কয়েক ওয়াগন কাগজ খরচ করিয়া পরিকল্পনা রচনা করিলে, তারপরে সেই কাগজের স্তূপ হয় অগ্নিগর্ভে, নয় ত' কীটের উদরে প্রবেশ করিল, তোমরা মহান্ কর্ম্মীর দল নিজ নিজ ঘরে যে যেমন ঘুমাইতেছিলে, সে তেমনি নাসিকা-গর্জ্জন করিয়া কুম্ভকর্ণের শিষ্যত্ব ঘোষণা করিতে লাগিলে,—ইহা হইলে ত' চলিবে না। আমি অনেক দূরের লক্ষ্যকে স্থির করিয়া নিয়াছি একটী মাত্র মুহূর্ত্তের ধ্যাননিবিষ্ট মন দিয়া—কাগজে, কলমে, ব্লুপ্রিণ্টে আর নক্শায় আলমারি ভারী করি নাই, তিল তিল করিয়া একটু একটু করিয়া আমার শিশুপ্রয়াস নিয়ত নিজের পদক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে, হয়ত আরও ত্রিশ চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর পার হইবার আগে দেখিবার মত বস্তু তোমরা কিছুই পাইবে না। তবু কাজ আমার চলিতেছে,

কাজে বিরাম নাই। আমার কাছে যদি উপদেশ নিতে আস, তবে এগুলি আগে তোমাদের জানিতে হইবে। অযাচকের আশ্রম, সহকর্ম্মীগুলিকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারি না। ফলে দুই চারি ছয় মাস পরে পরেই কিঞ্চিৎ-শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীরা চলিয়া যাইতেছে, আবার নূতন অদক্ষ কর্ম্মীরা আসিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতেছে। তাহাদিগকে নিপুণ করিয়া তুলিবার জন্য পুনরায় আমাকে নূতন করিয়া শ্রম করিতে হইতেছে। ইহা যে কি এক বিরক্তিকর ব্যাপার, কি বলিব। কিন্তু এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কাজ আমার বন্ধ হয় নাই। বন্ধ হইতে দেই নাই। কণা কণা করিয়া পাথর খুঁড়িতেছি এই আশায় যে, একদা এই প্রস্তরাকীর্ণ জলহীন মরুভূমিতে বিরাট জলস্থলীর সৃষ্টি হইবে,—মরুভূমির শুষ্ক বেলা সাজবে সবুজ বেশে।”

হরিওঁ কীর্ত্তনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ছফুল্লাকান্দি-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“নামকীর্ত্তন নানা জনে নানা সুরে করিতে পারে। যেখানে অহোরাত্র বা উদয়াস্ত কীর্ত্তনের আয়োজন, সেখানে একই দল কীর্ত্তনিয়া সারাদিন বা সারা রাত্রি গাহিতে পারে না। নূতন নূতন দলের নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়। আবার একই দল দীর্ঘকাল একই সুরে গাহিতে বিরক্তি বোধও করিতে পারে।

এমত স্থলে নানা জনের দ্বারা নানা সময়ে নানা সুরে, নানা তালে, নানা রাগরাগিণীতে কীর্ত্তন চলিতে পারে। কিন্তু কতকগুলি স্থল আছে, যেখানে হরিওঁ কীর্ত্তন একমাত্র ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরেই গাহিতে হইবে। যেমন, সমবেত উপাসনার মধ্যে হরিওঁ-কীর্ত্তনের সময় সীমাবদ্ধ এবং তখন একমাত্র ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরেই ইহা গীত হইবে। মনে কর, বিরাট শোভাযাত্রায় সহস্র লোকের সমকণ্ঠে সমতালে গাহিবার প্রয়োজন। তখন সবাই যদি বিশুদ্ধ সুর শিখে, তবেই একতান একমান হইয়া গাহিতে পারিবে। সম্মুখ-দেশে একজন ব্যাণ্ড-মাষ্টারের যোগ্যতাসম্পন্ন লোক লাঠি উঁচাইয়া তালের গতি ও লয় দেখাইতে থাকিবে আর সকলের কণ্ঠ এক লয়ে গাহিতে থাকিবে। এই সময়ে একমাত্র বিশুদ্ধ ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর ছাড়া অন্য সুর কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে। সমবেত উপাসনার আসরে অখণ্ড-সংহিতা পাঠের পরেই ‘জয় জয় ব্রহ্ম’ আরম্ভ হইয়া যাইবে। ইহাতে সঙ্গীত আমদানী করিও না।”

শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি ও সমবেত উপাসনা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত মেজ্ভা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“আমাদের সমবেত উপাসনার ভিতরে আড়ম্বরের প্রশ্রয় নাই। ইহা যতটা অনাড়ম্বর ভাবে হইতে পারে, তাহাই

ভাল। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, উলুধ্বনি প্রভৃতির কি ইহাতে স্থান আছে? নাই এবং আছে। অখণ্ড-সংহিতা পাঠ আরম্ভ হইয়া যাইবার পরে শান্তিবাচনের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নাই। ইহার আগে এবং ইহার পরে আছে যদি কেহ শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি বা উলুধ্বনিকে মাঙ্গলিক কর্ত্তব্য হিসাবে করে। পূর্ব্ব হইতে শিক্ষা ও অনুশীলন থাকিলে বিনা বিশৃঙ্খলার একাজটুকু হইতে পারে। যেখানে শৃঙ্খলার শিক্ষা নাই, সেখানে এই ব্যাপার নিয়া একটা হুলস্থূল লাগিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কাতেই শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালীতে এই বিষয়ে একেবারে নিঃশব্দ থাকিতে হইয়াছে। হৈ-চৈ পাইলে আমরা শান্ত ভাবে কোনও কাজ করি না। অথচ সমবেত উপাসনার ফল-স্বরূপ অন্তরের প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য্যটুকু নিয়া ঘরে ফিরিবার যোগ্যতাটুকু আমাদের কত প্রয়োজন। প্রসাদের ব্যাপারে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় কোলাহল হয় বলিয়া আমি অনেক স্থানে সম্প্রতি উপাসনাতে ভোগ-নৈবেদ্য দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রসাদ বিতরণে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনাযুক্ত ক্ষেত্রে ভোগ-নৈবেদ্য ছাড়াও সমবেত উপাসনা হইতে পারে।"

কাজে লাগিয়া থাক

হাওড়া-জেলান্তর্গত মুগকল্যাণ-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোনও একটা কাজ ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহা ছাড়িয়া

দেওয়া উচিত, যদি বুঝা যায় যে কাজটা অসৎ বা অসঙ্গত বা অসময়োচিত। কিন্তু সৎকাজ, সঙ্গত কাজ, সময়োচিত কাজ ধরিয়া তারপরে উৎসাহের অভাব বশতঃ, আর্থিক অনটন বশতঃ, শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ, সহযোগীর অভাব বশতঃ বা পরিস্থিতির প্রতিকূলতা বশতঃ ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। অন্ততঃ আমি এইরূপ ব্যাপার কদাচ অনুমোদন করিব না। প্রয়োজন-স্থলে কাজের ঢং বদলাও, কৌশল পরিবর্ত্তন কর বা কর্ম্মসূচীর সংশোধন কর কিন্তু আসল কাজটী ছাড়া হইবে না। উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক মনীষা বা উচ্চস্তরের কাব্যপ্রতিভার জন্য যে সম্মান এবং মূল্য নির্দ্ধারিত আছে একই কাজে অনলস প্রযত্নে, ধারাবাহিক ভাবে, অবিচ্ছিন্ন প্রয়াসে মাটি কামড়াইয়া লাগিয়া থাকিবার ধৈর্য্য, সাহস ও দৃঢ়তার সম্মান বা মূল্য তাহার চেয়ে এক কণাও কম নহে, এই কথা বিশ্বাস করিও। কবি বা দার্শনিকেরা কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ না করিয়াও যশ পান শুধু ভাল ভাল চিন্তা বা কল্পনা-রাশি উপহার দিয়াই, আর কর্ম্মীরা বুকের রক্ত দিয়া মৃত্তিকা সিঞ্চিত করিলেও অধিকাংশ স্থলে অস্বীকৃত, যশোবঞ্চিত, কীর্ত্তিহীন, চিরবিস্মৃত অন্ধকারে লীন হইয়া থাকেন,—এই পার্থক্যের যথার্থ্য জানিয়াও তোমাদিগকে কাজেই লাগিয়া থাকিতে হইবে, অন্য পথ তোমাদের জন্য নাই।"

ময়মনসিংহের চতুর্দ্দশ ভাষণ

অদ্য দুর্গাবাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণির ময়মনসিংহের চতুর্দ্দশ ভাষণ। অদ্যই শেষ ভাষণ। কাল শ্রীশ্রীবাবামণি চলিয়া যাইবেন। অদ্যকার জন-সমাবেশের কোনও তুলনা হয় না। শ্রীশ্রীবাবামণি প্রথমে ধন্যবাদ দিয়া লইলেন। বলিলেন,—আগ্রহ ক'রে বক্তার বক্তৃতা শোনেন, এমন শ্রোতা সব দেশেই সকল যুগেই কম মিলে। একই বক্তার একই বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিনের পর দিন চললে তাও আবার আগ্রহ ক'রে শোনার লোক ত' অতি বিরল। কিন্তু আপনারা অনেকেই নিয়মিত ভাবে অধিকাংশ বক্তৃতাই আমার শুনেছেন। আপনাদের সুন্দর চেহারাগুলি এই কয় দিনে আমার কাছে চিরপরিচিতের মতন হ'য়ে গিয়েছে। তথাপি আজ অনেক নূতন নূতন আগ্রহাকুল মুখকান্তি নিরীক্ষণ কচ্ছি। তাই আমি গত কয়দিনের তেরোটি বক্তৃতার চুম্বক বা সারাংশ প্রথমে আপনাদের কাছে নিবেদন কর্ব্ব। পুরোণো জিনিষকে নূতনের মতন ক'রে পরিবেশন হয়ত করা হ'য়ে উঠবে না। তবু সদ্বিষয়ের ত' চর্চ্চা হবে। সদ্‌বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা ও অনুশীলন যত বেশী হয়, ততই ভাল।

নয় পুরুষ ব্যাপী ব্রতনিষ্ঠা

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাষ্ট্রিক, আর্থিক,

সামাজিক, ধার্ম্মিক ও প্রথাগত যত সব সমস্যা ভারতীয় জীবনকে যে ভাবে বজ্রবেষ্টনে ধরেছে, তার দিকে তাকিয়ে বিচার কত্তে গেলে, তার নানা বিচিত্রতা, ক্ষয়িষ্ণুতা এবং সংক্রামকতার প্রকৃত হিসাব নিতে গেলে জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হৃৎকম্প উপস্থিত হবারই কথা। আমাদের দেশের হিতচিন্তক মহাপুরুষেরা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এই আতঙ্ককর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদিগকে বারংবার সজাগ ক'রে দেবার চেষ্টা করেছেন। ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলী-হেলন ক'রে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেই আমাদিগকে আশার-বাণী শুনাতে পারেন নি। কারণ, নিকট-অতীত এবং সদ্যঃ বর্ত্তমানকে বিচার ক'রে দেখতে গেলে উদ্দীপনা ঘটা খুবই একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। তথাপি যাঁরা প্রবল বিক্রমে উৎসাহজনক সম্ভাবনার ইঙ্গিতময়ী বাণী পরিবেশন করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার মনের সমর্থন সকলের চেয়ে বেশী। সুদূর অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলির সঙ্গে সুদূর এক ভবিষ্যতের অধিকতর গৌরব-ভাস্বর অধ্যায়গুলি সংযোজন হ'তে পারে, যদি আমরা নয়টী প্রজন্ম-ব্যাপী অর্থাৎ তিনশত বৎসর-ব্যাপী একটী সাধনার পরিকল্পনা গ্রহণ কত্তে পারি এবং সেই পরিকল্পনানুযায়ী মানবগোষ্ঠী-সমূহের সামূহিক নব-বিবর্ত্তনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে দিতে পারি। ইহা কোনও অসাধ্য ব্যাপার নয়, তবে দুঃসাধ্য সুনিশ্চিতই। এক পুরুষ বা দুই পুরুষে একটা সাধনা অবিচল ভাবে চলতে

থাকা কঠিন নয় কিন্তু নয় পুরুষব্যাপী প্রচলন একটা অসাধারণ নিষ্ঠারই ফল। প্রপিতামহের নিষ্ঠা পিতামহে, পিতামহের ব্রতনিষ্ঠা পিতায়, পিতার ব্রতনিষ্ঠা পুত্রে, পুত্রের ব্রতনিষ্ঠা পৌত্রে, পৌত্রের ব্রতনিষ্ঠা প্রপৌত্রে ইত্যাদি ক'রে ধারাবাহিক-ভাবে একই সাধনাকে চালু রাখা কেবল ব্যক্তিগত রুচিসাপেক্ষ নয়। এর জন্য বংশানুগত ভাবে একটা প্রথা বা tradition সৃষ্টি করা চাই। এইটীই আমার জীবনের এক মধুর স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নই আমাকে দেশদেশান্তরে নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় অক্লেশে ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য যুগিয়ে যাচ্ছে।

বক্তৃতা তিন ঘণ্টাকাল হইল।

ধন্যবাদপ্রদান-প্রসঙ্গে দুর্গাবাড়ী কমিটির সভাপতি এবং ময়মনসিংহ উকিল সভার একজন সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট সদস্য শ্রীরাজেন্দ্র কুমার উকিল মহাশয় বলিলেন,—"আচার্য্য স্বরূপানন্দ সংযম-প্রচারে এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দজী যাহাদিগকে দিনের পর দিন চোস্ত ভাষায় গালাগালি করিতেছেন, তাঁহারাই দিনের পর দিন শ্রোতৃমণ্ডলীর ভীড় বাড়াইতেছেন এবং নিঃশব্দে মুগ্ধ-শ্রবণে প্রত্যেকটী কথা শুনিতেছেন। ইহাই এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।"

সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ

শ্রীশ্রীবাবামণির ময়মনসিংহের বক্তৃতাবলী শ্রবণের পরে ঐখানকার কলেজের দুই জন অধ্যাপক "Swarupananda

as a Moral Teacher" নামে দুইটী সন্দর্ভ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত তেরো পৃষ্ঠাব্যাপী সন্দর্ভের শেষাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। * যথা,—

"In the political and economic fields and even in the field of education, young men are generally found to be eager for immediate apparent success, and rarely found to be prepared for paying the proper price for real and permanent success. The want of a wide and comprehensive outlook and of strong manly character becomes evident in all the fields of out activities. In spite of the depth of degradation into which we may have fallen from the political, economic, social and hedonistic point of view, the truth that the ideal on which the ancient Indian Civilization is based is superior to that underlying the Western Civilization is now recognised even by the best minds of the West. It is also admitted that the adoption of the Indian ideal alone by the West can save the modern Civilization from the destruction towards which it is rapidly heading.

* অপর অধ্যাপকের সন্দর্ভখানা "সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ" বা Swarupananda as a Moral Teacher গ্রন্থে আলাদা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

The inheritors of the ancient Indian moral and spiritual ideal have by Divine dispensation, a special responsibility in the matter.

"What is urgently neceessary in our country at the present age is the formation of a sturdy moral character, that can hold its own under all different circumstances, the infusion of a new life to the eternal spiritual ideal and its reinterpretation in harmony with the practical needs of the present age, and the creation of an unshakable self-confidence and a noble ambition in the minds of the people in general. and the young generation in particular.

"Since the advent of Sree Ramkrishna Paramhansa, the most dynamic embodiment of the Indian spiritual Sadhana in the present age, and of "the cyclonic monk" Swami Vivekananda, the most powerful modern interpreter of this 'Sadhana' in this ancient land of its birth as well as in the centre of the modern civilization in the West, there has been a tide, though not strong enough, in the cultural atmosphere of the country towards that direction. Many individuals and organisations have devoted their energy to the exposition of the moral and spiritual principles of India, to the establishment of Brahmacharya institutions for the systematic discipline of the thoughts, feelings and habits of the

boys and girls in accordance with these principles, to the composition and publication of books expounding these principles and giving practical directions for pursuing them, and so on.

"The appearance of Srimat Swami Swarupananda Paramhansa, the founder of the Pupunki Ayachak Ashrama in the district of Manbhum, in this field of activity is a great blessing to our country at the present stage of its cultural revival and regeneration. In my opinion, his appearance is an outstanding event in the moral, cultural and spiritual history of India in general and of Bengal specially. He has prepared himself for his great mission by an intensive moral and spiritual Sadhana since the prime of his youth. For a considerable period, he observed the vow of silence, kept aloof from all associations and concentrated his energy for awakening and developing his inner powers. He subjected himself to stringent measures of self-discipline, strictly observed the rules of Brahmacharya, practised regularity of habits with the utmost care, and made the most systematic endeavour to establish effective control over his body and mind. The result of his self-discipline is evident in the mode of life he lives in the midst of the manifold activities now in his preaching tours throughout the country.

"The habit of punctuality and regularity has been turned into his second nature. His control over his tongue and temper is really charming. He has reduced his physical needs to the minimum. He lives a plain and simple life, and all the honours and distinction that he receives from different quarters can not turn his head. Even when thousands of men of diverse mentalities flock together with different kinds of feelings to listen to his words and he exhorts them to pursue the moral and spiritual ideals of India and even when he finds it necessary to tell them many an unpalatable truth and to criticise most severely the vices, the evil tendencies and the immoral doctrines from which our country-men must be drawn back, he is scarcely found to lose his calmness and balance of thought and speech. All these are clearly intelligible results of his self-discipline and spiritual Sadhana.

"As on the one hand, Swamiji has fully prepared himself to take the most responsible position of a moral and spiritual teacher of the younger generation by undergoing a long and strenuous course of moral and spiritual self-discipline, so on the other hand he has fully provided himself with the necessary equipments for rationally expounding the noble ideals and principles and the practical ways of pursuing

them in actual life by a thorough and critical comparative study of the writings of the most of the authoritative moral and religious teachers of the East and the West. The vast range of his study, his extraordinary critical insight, his clarity of thought, his power of simplifying abstruse ideas and principles, his impartial criticism of and well-balanced judgment upon the conflicting ideals and practices that are the sources of confusion to ordinary minds,—all these create a great impression upon his hearers.

"A harmonious combination of intellectual equipments with moral and spiritual achievements is of great importance in all ages, and particularly in the present age, for making a teacher truly successful in his mission. The power of reason, the power of the will and the power of the heart must combine to make a permanent impression upon the social mind. An intelligent acquaintance with the particular thoughts and ideals prevailing in the world and a critical insight into their merits and defects, an appreciation of the particular circumstances,—the particular physical and mental conditions,—to which the particular regulative ideals and principles have reference, a capacity to pick out the universal truths from the particular garbs in which they are clothed,

an aptitude for arguing logically and systematically from patent facts to general truth and from recognised principles to particular cases of their application,—these are necessary for giving power to reason. An effective control over passions and prejudices, a sincere and earnest spirit of service, a formed habit of concentration of attention and energy, a character in which the truths preached are realised or ardently sought to be realised and in which nothing incompatible with them is noticeable, and a fervent desire for the good of all and the evil of none, are the unfailing sources of the power of the will. The power of the heart is developed by the cultivation of the feeling of sincere love, sympathy and compassion for those to whose service energy is devoted, a spirit of reverence for the essential purity and goodness of the inner nature of all men, a strong faith in the brightness of their future and a genuine and unpretensive attitude of modesty and humanity.

"All these factors are eminently present in Swami Swarupananda Paramhansa and it is no wonder that within a short space of time he has outwardly devoted himself to the moral and spiritual regeneration of the country, he has attained so much success and produced such a deep

impresssion upon the cultural atmosphere of the land. He has chosen for his head-quarters a small unknown village in the district of Manbhum in which he has founded a Brahmacharya Ashrama for specially training a group of youths in accordance with his ideal. But his services are requisitioned from all parts of Bengal, Bihar and Assam. All the Bengali-speaking people who take any interest in the moral and spiritual problems of life are eager to listen to his lectures and invite him to the places of their habitation. Wherever he goes, young men in their hundreds and thousands flock towards him for taking practical lessons as to the ways and means for improving the health and strength of their body and mind, for building up their character and for ennobling their life. Even when he goes to any new place where he is not generally known, in the very first lecture he makes his power felt and attracts the people towards himself and the ideals he preaches. He generally delivers a series of lectures in every place he has the occasion to visit, and these lectures cover most of the social, moral and spiritual problems of the present day, with special reference to the ideals and principles of the Indian culture and civilization and to the practical application of them under our present political and economic

conditions and the cultural conditions created by the close contact between the East and the West.

"I have noticed several specific features of the mode of his addressing the people. He seldom shows any undue zeal carry his audience with him by the mere power of his oratory, which he possesses in a prominent degree. He generally appeals to the reason of the people instead of appealing to their emotions and passions. Whatever problem he may have to deal with, he is in the habit of acquainting his audience with the various ways in which it was tackled in the past by the representative thinkers of the East and the West, the different forms the problems assumed in different ages, countries and sects and the form in which it has appeared before us and then having critically examined them, he arrives at his own conclusion. The mode of exposition and argumentation dispels all worng or confused notions about the problems and their solutions and makes the impression deep and permanent in the rational mind of the audience. He is fearless in his scathing criticism of the demoralising influences exerted upon the impressionable young minds by many anti-moral

and anti-religious doctrines and ideals of the present day, by however powerful and idolized writers and leaders they might have been propunded or preached. He is not afraid of using the strongest language in denunciation of the doctrines, which are injurious to the real good of his countrymen from the standpoint of the ideal of humanity, even though he may otherwise cherish the most respectful attitude towards the exponents of these views. But he always establishes his points by sober reasoning, and never wants to rouse the passions of the people against any person or organization. He has resources to his oratorical flourishes only to impress his conclusions deeply upon the hearts of the audience and to make their minds revolt against the false ideals and dehumanising doctrines.

"I have been impressed by another feature of his mission. He has undertaken the task of teaching morality instead of preaching religion. In the present circumstances, this choice has its deeper significance. Now-a-days the conception of religion is in ordinary minds, associated with the ideas of some particular dogmas, particular rites and ceremonies and particular communal interests. Since these are apparently

different in different religious systems, the people belonging to particular religious sects, instead of directing their attention to the universal spiritual ideals and principles involved in all these tenets and practices are found to attach greater importance to the distinctive feature of each sectarian system. Thus the followers of different systems, instead of being attracted towards each other by the realization of the spiritual unity of all men are found to be alienated from one another by reason of the differences in the external features of the system. Hence by irony of fact, religion which ought to be the strongest and sweetest bond of union between men and men,—which ought even to unite men spiritually with the entire animal world and physical universe,—by awakening in them the consciousness of the Divinity immanent in all, and which ought to inspire every mind with the feeling of love and the spirit of service to one and all, has become a fruitful source of disunion and discord of rivalries and hostilities, of oppression and depression. Many irreligious and inhuman atrocities have been perpetrated in the human society by men upon men by brothers upon brothers, in the name of religion. It is therefore quite intelligible why many good men,

engaged in the mission of peace and unity, are afraid of invoking the aid of religion. They fear that religion would bring with it the ugly spirit of communalism, which may easily degrade itself into the worst form of barbarism. Consequently, they speak of morality and spirituality, instead of religion.

"I don't know if Swami Swarupananda Paramhansaji belongs to this class of thinkers. But he is thoroughly practical. If men are to be made truly religious in the present scientific age, their conception of religion, their ideas about religious life, religious practices, religious sentiments and religious beliefs have to be rationally recast and re-oriented in accordance with take universal ideal and principle of morality and spirituality and they have to be taught to estimate, by reference to these universal standard, the real significance of the particular dogmas, rituals and practices, the particular ways of self-discipline, that have evolved in particular sects. At any rate, if religion is not based on morality, if the edifice of religious life is not erected on the solid foundation of moral discipline, it is very likely to break down and deteriorate into a mass of soul-less forms, heartless practices and superstitious ideas.

"I heartily admire Swamiji's concentration of his inexhaustible energy upon the problem of the purification of the moral atmosphere of the country, the reawakenment of the moral conscionsness of the people, particularly of the younger generation, the re-creation in their minds of a moral and spiritual outlook on life and the human relations and the affairs of the world, and of a moral and spiritual sense of the values of the human achievements and the worldly objects. As a moral teacher, he is rendering a great service of far–reaching importance and permanent values to the society and the nation. If the moral consciousness of the youths of the country is awakened, if they imbibe a robust faith in their inherent capacity and potentiality, if a strong determination is formed in their minds for building up a true manly character, that would not bend down before any temptation, passion or fear and if they acquire the habit of valuing all things from the moral and spiritual standpoint, which is the foundation of the Indian civilization, the country is sure to advance forward in all directions without being vitiated by the evils that are leading the European civilization towards

destruction and that are being imported from it into this land of the Rishis and holy men.

"Another noticeable feature in his method of educative propaganda is that he does not generally deal with the abstract principle of morality and spirituality. He is a man of great practical wisdom. He takes up the concrete problems of our personal, domestic and social life, draws the pointed attention of the people to the different aspects of these problems and the different stand-points from which they are actually viewed by different school of thinkers, carries his audience by force of argument step by step to what he regards as the true solution of the problems in accordance with the principles and ideals of morality and of spirituality, and shows the practical bearing of such problems and their solution upon the different departments of out life. He always remembers that he is a man of the modern world, in which the particular view of things is more appreciated by the people at large than a purely idealistic view. His mode of reasoning is also thoroughly modern. His silvery tongue and mastery over appropriate language give additional force to his arguments. All these together contribute

to his immense popularity and magnificent success as a teacher in the present age. we pray for the fulfilment of his life's noble mission."

(বঙ্গানুবাদ)

"রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে, এমন কি শিক্ষা-ক্ষেত্রেও তরুণদিগকে সাধারণতঃ দেখা যায় আপাত-সফল সদ্যঃ কর্ম্মসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হইতে, যথার্থ এবং স্থায়ী সাফল্যের প্রকৃত মূল্য দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ইহাদিগকে কদাচিৎই দেখা যায়। সমগ্র ব্যাপারটাকে দিগন্তবিস্তৃত জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া নিবার শক্তির অপ্রাচুর্য্য এবং মানবোচিত সুদৃঢ় চরিত্র-বলের অভাব আমাদের প্রতিটি কর্ম্মক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভোগ-সুখ-বাদাশ্রিত দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে গেলে আমরা অধঃপতনের যে গভীর অতলে ডুবিয়াছি, তাহা সত্ত্বেও, এই সত্যটী আজ পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দ্বারাও স্বীকৃত হইতেছে যে, যে আদর্শের ভিত্তির উপরে প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা, পাশ্চাত্য সভ্যতা যাহার উপরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। ইহাও স্বীকৃত হইতেছে যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা নক্ষত্রবেগে যে ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, ভারতীয় আদর্শবাদকে গ্রহণের দ্বারাই মাত্র সেই ধ্বংসের হাত হইতে পরিত্রাণ মিলিতে

পারে। পরমেশ্বরের দিব্য বিধানে প্রাচীন ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের উত্তরাধিকারীদের এই ব্যাপারে একটী নিগূঢ় দায়িত্ব রহিয়াছে।

"বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা হইতেছে এমন এক সুদৃঢ় চরিত্র-গঠন, যাহা যাবতীয় বিপরীত অবস্থার মধ্যেও অটল ভাবে নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। প্রয়োজন আমাদের শাশ্বত আধ্যাত্মিক আদর্শের মধ্যে এক নব-চেতনার সঞ্চারণা, প্রয়োজন তাহার এক নবভাষ্য-রচনা যাহা বর্ত্তমান যুগের বাস্তব দাবী-সমূহ সুসঙ্গত ভাবে মিটাইবে, প্রয়োজন সর্ব্বসাধারণের মনে এবং বিশেষ করিয়া তরুণদের প্রাণে এক অবিচলিত আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি এবং উন্নত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিকাশ-সাধন।

"ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম শক্তিধর বিগ্রহ-স্বরূপ বলিয়া যাঁহাকে গণনা করা যায়, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাবের পর হইতে এবং "ঝটিকাবর্ত্ত-সৃষ্টিকারী সন্ন্যাসী" স্বামী বিবেকানন্দের পর হইতে (যিনি এই সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যাখ্যাকার রূপে এই সাধনার জন্মভূমি এই ভারতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমিগুলিতে সর্ব্বত্র সমাদৃত), এতদ্দেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে একটা স্রোতের উদ্ভব হইয়াছে,—যদিও তাহা খুব তীব্র নহে,—যাহা ভারতীয় সাধনার পুনরুজ্জীবন লক্ষ্যে প্রধাবিত। বহুজনে ব্যক্তিগত ভাবে, এবং বহু সংঘ

ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সমূহের ব্যাখ্যানে, ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় স্থাপনে এবং উক্ত আশ্রম-সমূহ স্থাপনার দ্বারা চিন্তা, চিত্তবৃত্তি ও অভ্যাস-সমূহকে সংযম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়া বালক-বালিকাদিগকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সমূহের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে, গ্রন্থাদি রচনায় ও প্রচার করিতে যত্নবান হইয়াছেন।

"মানভূম জেলার অন্তর্গত পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের এই সময়ে আবির্ভাব এবং সাংস্কৃতিক এই পুনরুজ্জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আমাদের দেশের প্রতি ভগবানের এক বিশেষ আশীর্ব্বাদ। সাধারণ ভাবে ভারতের এবং বিশেষ করিয়া বাংলার নৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ইতিহাসে তাঁহার আবির্ভাব একটী অসাধারণ ঘটনা, ইহাই আমার মত। তরুণ কৈশোর হইতে কঠোর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা তিনি নিজেকে তাঁহার লক্ষ্য-সংসাধনের জন্য উপযুক্তভাবে আগে তৈরী করিয়া নিয়াছেন। সুদীর্ঘ কালের জন্য তিনি মৌনব্রত পালন করিয়াছেন, সর্ব্বজন-সংসর্গ হইতে দূরে রহিয়াছেন, এবং নিজের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন আভ্যন্তরীণ তপঃশক্তিকে প্রাবোধিত করিবার জন্য। আত্মসংযমের কঠোরতম কৃচ্ছ্র-সমূহের অধীন থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য্যের যাবতীয় নিয়ম কঠোরতার সহিত পালন করিয়া, অভ্যাস-সমূহকে কঠোর শাসনে সময়ানুবর্ত্তী করিয়া তিনি সুশৃঙ্খল সাধনা করিয়া দেহ ও

মনের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপনের অধ্যবসায় করিয়াছেন। তাঁহার আত্মগঠনের সুফলসমূহ তাঁহার প্রতিদিনকার জীবন-যাপন প্রণালীর সরলতা এবং সবলতার মধ্যেই সুস্পষ্ট হইবে,—যেই সময়ে তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে বক্তৃতাদান করিয়া করিয়া ভ্রমিয়া বেড়াইতেছেন এবং তাহারই মধ্যে কত রকমের কাজে ব্যস্ত আছেন।

"সময়ানুবর্ত্তিতা ও নিয়ম-নিষ্ঠা তাঁহার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা-সংযম ও মেজাজের উপরে প্রভুত্ব সত্যই মনোমুগ্ধকর। শারীরিক প্রয়োজনগুলিকে তিনি স্বল্পতম সীমার মধ্যে আনিয়া বাঁধিয়াছেন। তিনি শাদাসিধা রকমের জীবন-যাপন করেন এবং যে সম্মান ও প্রশংসা তিনি নানা দিক হইতে পান, তাহা তাঁহাকে গর্ব্বিত করিতে পারে না। এমন কি, যখন হাজার হাজার ভিন্ন রুচির লোক বিভিন্ন মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে সমাগত হয় এবং তিনি তাহাদিগকে ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকে অনুসরণ করিবার জন্য প্রেরণা দেন। এবং যখন তিনি প্রয়োজন বোধ করেন তাহাদিগকে অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে, যখন তিনি অতীব কঠোর ভাবে সেই সকল পাপ, অন্যায়, অসঙ্গত রুচি, অনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে রসনা পরিচালন করেন, যাহা হইতে দেশবাসীকে ফিরাইয়া আনা অত্যাবশ্যক, তখনও তাঁহাকে মনের প্রশান্তি, চিন্তার সাম্যভাব, ভাষার সংযম হারাইতে দেখা যায় না।

এগুলি সুস্পষ্টতই তাঁর আত্ম-সংযম ও আধ্যাত্মিক সাধনার দ্যোতক।

"একদিকে যেমন স্বামীজী সুদীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তপস্যার দ্বারা যুবক-জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার দায়িত্বপূর্ণ পদটী গ্রহণের জন্য নিজেকে সম্যক্ ভাবে তৈরী করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনি তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিকাংশ প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রামাণ্য নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষাদাতাদের রচনাবলীর যুক্তিনিষ্ঠ ও তুলনামূলক অধ্যয়নের প্রগাঢ়তা দ্বারা নিজেকে সেই সকল আবশ্যকীয় যোগ্যতায় মণ্ডিত করিয়াছেন, যাহা দ্বারা যুক্তিপূর্ণ-ভাবে সেই সকল মহনীয় আদর্শ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা এবং তাহাদিগকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা যায়। তাঁহার অধ্যয়নের বিশাল ব্যাপকতা, তাঁহার অসাধারণ সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণী অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার চিন্তার স্বচ্ছতা, দুরূহ দুর্ব্বোধ্য বিষয়-সমূহের সরলীকরণের ক্ষমতা, পরস্পর-বিরোধী আদর্শ ও আচরণ-সমূহ, যাহার দরুণ সাধারণ মানুষের মনে কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা সৃষ্টি করে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অপক্ষপাত সমালোচনা,—এই সমস্তই তাঁহার শ্রোতাদের মনের উপরে গভীর ছাপ সৃষ্টি করে।

"একজন প্রচারককে যথার্থই সফল হইতে হইলে, সকল যুগেই, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান যুগে, বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার সহিত সমভাবে প্রয়োজন নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনোৎকর্ষ।

সামাজিক মনের উপরে স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হইলে বিচার করিবার যোগ্যতা, অভিপ্রায়ের শক্তিশালিতা এবং হৃদ্বৃত্তির প্রবলতা,—এই তিনের চাই সমন্বয়। পৃথিবীতে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ চিন্তা এবং আদর্শের সহিত রসজ্ঞ পরিচয়, তাহাদের দোষ এবং গুণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ক্ষম অন্তর্দৃষ্টি, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিগুলির গুণ-বিবেচন, যে সকল বিষয়ে এই সকল অবশ্য-প্রতিপাল্য আদর্শ ও তত্ত্বের রহিয়াছে সম্পর্ক, তদ্বিষয়ে বিশেষ বিশেষ জাগতিক ও মানসিক অবস্থা, বিশেষ বিশেষ বেশে আচ্ছাদিত খণ্ড সত্য হইতে সর্ব্বজনীন সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করার যোগ্যতা, সীমাবদ্ধ বিশেষ একটী তথ্য হইতে ন্যায়-সঙ্গত ভাবে ও পদ্ধতিবদ্ধ যুক্তি দিয়া সর্ব্বজনীন সত্যে পৌঁছিবার পটুতা এবং সর্ব্বসম্মত আদর্শবাদ হইতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগে পৌঁছিবার দক্ষতা—যুক্তিকে শক্তি যোগাইতে হইলে, এইগুলির আবশ্যকতা আছে। ইচ্ছার শক্তিকে অব্যর্থ করিতে হইলে প্রয়োজন আছে হৃদয়াবেগের এবং ব্যক্তিগত কুসংস্কারের উপরে সবল কর্ত্তৃত্বের, অকপট এবং একাগ্র সেবাবুদ্ধির, একাগ্রতা ও শক্তি-সামর্থ্যকে একমুখ রাখিবার সুসংবদ্ধ অভ্যাসের, এমন একখানা অনবদ্য চরিত্রের যাহাতে প্রচারিত সত্য পূর্ণতঃ প্রতিষ্ঠিত অথবা যাহাতে উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চলিয়াছে প্রয়াস, এবং যাহাতে আদর্শের সহিত সঙ্গতিহীন কোনও কিছু নাই এবং সকলের

কুশল সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন এমন উদগ্র আকাঙ্ক্ষার যাহাতে জগতের কাহারও অকুশল-কামনা নাই। হৃদয়ের শক্তি বাড়ে, যাহাদের সেবায় শক্তিকে করা হইয়াছে উৎসর্গীকৃত, তাহাদের প্রতি অকপট প্রেমভাবের অনুশীলন দ্বারা, তাহাদের প্রতি সমবেদনা দ্বারা, করুণা দ্বারা, সকল মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির স্বাভাবিক শুচিতা ও মহত্ত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাভাব পোষণের দ্বারা, তাহাদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতা সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসের দ্বারা এবং অকৃত্রিম ও ভাণবর্জ্জিত বিনম্রতা ও মানবিকতা দ্বারা।

"এই সকল সদ্গুণের সুপ্রকট সমাবেশ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের মধ্যে রহিয়াছে এবং ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই যে, যে অল্প সময়টুকু ধরিয়া তিনি বাহ্যতঃ দেশের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই তিনি এতটা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন এবং দেশের সংস্কৃতির বাতাবরণের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মের মূলকেন্দ্র-রূপে মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রামকে বাছিয়া নিয়াছেন এবং সেখানে তিনি একদল তরুণকে নিজ আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তুলিবার জন্য একটী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেবা পাইবার জন্য সাগ্রহ আহ্বান আসিতেছে বাংলা, বিহার ও আসামের সকল অঞ্চল হইতে। বঙ্গবাসী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা-সমূহের সমাধানে বিন্দুমাত্রও উৎসাহী, তাঁহারা প্রত্যেকে স্বরূপানন্দজীর ভাষণ শুনিবার জন্য আগ্রহী এবং তাঁহারা তাঁহাকে নিজ নিজ বাসস্থানে পাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। যেখানেই তিনি যান, শত সহস্র যুবা ও কিশোর তাঁহার চারিদিকে নিজ নিজ শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ও শক্তি বর্দ্ধনের কার্য্যকর উপায়-সমূহ শিখিবার জন্য, চরিত্রগঠনের জন্য, জীবনকে মহত্ত্বে মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। এমন কি, তিনি যখন কোনও নূতন স্থানে যান, যেখানে তিনি বিশেষ পরিচিত নহেন, সেখানেও তিনি তাঁহার প্রথম ভাষণটী দ্বারাই লোককে তাঁহার শক্তি অনুভব করাইয়া দেন এবং জনসাধারণকে করেন তাঁহার প্রতি ও তৎপ্রচারিত আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট। তিনি সাধারণতঃ প্রত্যেকটী স্থানে ধারাবাহিক কয়েকটী বক্তৃতা দেন এবং সেই সকল বক্তৃতায় আধুনিক যুগের অধিকাংশ সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্যা-সমূহের আলোচনা থাকে। বিশেষ করিয়া থাকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই সকল আদর্শ ও তত্ত্বের আলোচনা, আধুনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তাহাদের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা, আর থাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ-জনিত অভিনব সাংস্কৃতিক অবস্থার কথা।

"জনসমক্ষে তাঁহার বক্তৃতাদানের ভঙ্গীতে কয়েকটী বিশেষত্ব আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী

করিবার জন্য তিনি তাঁহার বাগ্মিতাশক্তির ব্যবহারে খুব কমই আগ্রহ প্রকাশ করেন, যে শক্তিটি তাঁহার অমিত পরিমাণেই রহিয়াছে। মনের আবেগের বা হৃদ্বৃত্তির কাছে আবেদন না করিয়া তিনি সাধারণতঃ জনগণের বুদ্ধিশক্তির ও যুক্তির নিকটে আবেদন উপস্থিত করেন। যে সমস্যাটি নিয়াই তিনি আলোচনা করুন না, তাঁহার অভ্যাসই হইতেছে তদ্বিষয়ে অতীতে প্রতিনিধি-স্থানীয় চিন্তাবীরেরা নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে তাহার সম্পর্কে যে আলোচনা-প্রত্যালোচনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে স্বকীয় শ্রোতৃবৃন্দকে সমগ্র বিষয় আগে সম্যক্ অবগত করানো। এই সমস্যাটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রূপান্তর পাইয়াছে, যেই মূর্ত্তিতে এই সমস্যাটি আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া এবং অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি-সমূহের দ্বারা তাহাদের মূল্য নির্ণয় করিয়া তবে তিনি তাঁহার নিজের সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছেন। সকল ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটাইয়া তাঁহার প্রকাশের ভঙ্গিমা ও যুক্তি-পরম্পরা শ্রোতাদের যুক্তিনিষ্ঠ মনে গভীর ও স্থায়ী ছাপ অঙ্কিত করে। যত শক্তিশালী বা জনগণের মনোবিমোহন নেতা বা লেখকের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত, প্রচারিত বা সমর্থিত হউক না কেন, সহজে-গ্রহণশীল তরুণ মনের উপরে যে সকল অনৈতিক ধর্ম্মবিরোধী মতবাদ ও আদর্শ চারিত্রিক দৌর্ব্বল্যের বীজ বপন করিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে নির্ম্মম

সমালোচনায় তিনি ভয়হীন। মানবতার দৃষ্টিকোণ হইতে দেশবাসীর প্রকৃত মঙ্গলের বিরোধী মতবাদের প্রবর্ত্তকের সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরের ভাব অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হইলেও, এই সকল চরিত্র-বল-বিরোধী মতবাদের নিন্দায় কঠোরতম ভাষা ব্যবহারেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন। অথচ তিনি তাঁহার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেন সুসংযত যুক্তির দ্বারা, কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রোতার ক্রোধ বা ঘৃণাকে উদ্দীপিত করিয়া নহে। তাঁর সিদ্ধান্ত-সমূহকে শ্রোতার মনের উপরে দৃঢ় ভাবে বসাইয়া দিবার প্রয়োজনে এবং শ্রোতাদের মনকে অসত্য আদর্শ ও মনুষ্যত্ব-বিরোধী মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তুলিবার জন্যই মাত্র তিনি তাঁহার বাগ্‌বিভূতির উচ্ছ্বাসকে প্রয়োগ করেন।

"তাঁহার কর্ম্মলক্ষ্যের আর একটী বিশেষত্ব দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি ধর্ম্মশিক্ষাদানের দায়িত্ব না নিয়া নীতি-শিক্ষাদানের ব্রত নিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই নির্ব্বাচনের একটী গভীরতর তাৎপর্য্য রহিয়াছে। আধুনিক কালে সাধারণ মানুষের মনে ধর্ম্মের সংস্কার বিশেষ বিশেষ মতবাদ, বিশেষ বিশেষ কর্ম্মকাণ্ড এবং বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সহিত বিজড়িত হইয়া বিরাজ করিতেছে। যেহেতু এইগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মমতে দৃশ্যতঃ পৃথক্, সেই হেতু বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষদিগকে নিজ নিজ মনোযোগ এই সকল মতবাদ ও কর্ম্মকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট

সর্ব্বজনীন আধ্যাত্মিক আদর্শ ও পরমতত্ত্বের দিকে ধাবিত না করিয়া দেখা যায় নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক বিশেষত্বগুলির প্রতিই অধিকতর মূল্য দিতে। এই ভাবে প্রত্যেকটী ভিন্নপন্থানুবর্ত্তীকে মানব-মাত্রেরই আধ্যাত্মিক একত্বের উপলব্ধি-ফলে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে নিজ নিজ বিভিন্ন মতবাদের বাহ্য পার্থক্যগুলির দরুণ পরস্পরের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন হইতে দেখা যায়। এই ভাবে ঘটনার পরিহাস-বশতঃ ধর্ম্ম,—যাহার হওয়া উচিত মানুষে মানুষে মিলনের মধুরতম বন্ধন,—ধর্ম্ম,—সর্ব্বভূতে বিরাজমান পরমেশ্বরের অবস্থিতির উপলব্ধিকে জাগরিত করিয়া যাহার উচিত সমগ্র প্রাণি-জগৎ এবং জড়-জগতের সহিত মানুষকে আধ্যাত্মিকতায় বাঁধিয়া রাখা, ধর্ম্ম,—যাহার উচিত প্রতিটি মনকে প্রত্যেকের প্রতি প্রেম-ভাবে ও সেবাবুদ্ধিতে উদ্দীপ্ত করা, তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে অনৈক্যের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও শত্রুতার, অত্যাচার ও অবসানের ফলবন্ত উৎস। বহু অমানুষিক অধর্ম্মোপেত অত্যাচার-সমূহ মানব-সমাজে মানুষের দ্বারা মানুষের উপরে, ভ্রাতার দ্বারা ভ্রাতার উপরে ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, অনেক সৎলোক, যাঁহারা শান্তির এবং ঐক্যের লক্ষ্যে কাজ করিতেছেন, তাঁহারা কেন ধর্ম্ম নামক বস্তুটীর সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, ধর্ম্ম তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত নেশাকে আমদানী করিতে পারে,

যাহা অনায়াসে ইহাকে নিকৃষ্টতম বর্ব্বরতায় পরিণত করিয়া দিতে পারে। সুতরাং তাঁহারা নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কথাই বলেন, ধর্ম্ম নিয়া মাথা ঘামান না।

"আমি জানি না স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী এই শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌গণের মধ্যে পড়েন কিনা। কিন্তু তিনি সর্ব্বতোভাবে একজন বাস্তববাদী ব্যক্তি। বর্ত্তমান এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষকে যদি সত্যই ধার্ম্মিক করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম্ম-সম্পর্কিত ধারণা, ধার্ম্মিক জীবন, ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাবলি, ধর্ম্মীয় চিন্তাবেগ ও ধর্ম্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে তাহাদের চিন্তাধারাকে যুক্তির গণ্ডীতে আনিয়া নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বজনীন আদর্শ ও তত্ত্বের দ্বারা পুনর্গঠিত নবারুণস্নিগ্ধ করিয়া লইতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার এই সকল সর্ব্বজনীন মাপকাঠি নিয়া কি করিয়া সেই সকলের প্রকৃত মূল্যমান নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যে সকল ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মীয় কর্ম্মকাণ্ড, ধর্ম্মীয় শৃঙ্খলার বিশেষ বিশেষ বিধান-সমূহ এক একটা সম্প্রদায়ের ভিতরে বিকশিত হইয়াছে। মোট কথা, ধর্ম্ম যদি নৈতিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়, ধর্ম্মজীবনের বিরাট প্রসাদ যদি নৈতিক সংযমের দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে এই সম্ভাবনাই অত্যধিক যে, উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং কতকগুলি প্রাণহীন কঙ্কালে, হৃদয়হীন কর্ম্মকাণ্ডে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণায় পরিণত হইবে।

"যে কর্ম্মশক্তিকে কদাচ নিঃশেষিত করা যায় না, স্বামীজী তাঁহার সেই অক্ষয় সামর্থ্যকে যে দেশের নৈতিক বাতাবরণের শুচিতা বিধানের জন্য এবং সর্ব্বসাধারণের, বিশেষ করিয়া, কিশোর-সমাজের, নৈতিক চেতনার নবজাগরণের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট দিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন, ইহা গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি চাহিতেছেন তাহাদের মনে জীবন সম্পর্কে একটী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করিতে, মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক এবং জগতের ঘটনাবলীর সম্পর্কে, মনুষ্য-জীবনের বিরাট সাফল্য-সমূহের মধ্যে প্রকৃত মূল্যমান নির্দ্ধারণের ক্ষমতা দান করিতে। নীতি-শিক্ষাদাতা-রূপে তিনি দেশ ও সমাজের পক্ষে স্থায়ী এবং সুদূর-প্রসারিণী গুরুত্বপূর্ণ একটী সেবা দিয়া যাইতেছেন। যদি দেশের যুবকগণের নৈতিক কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগ্রত হয়, যদি তাহারা তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির এবং সম্ভাবনার উপরে সুদৃঢ় আস্থা ন্যস্ত করিতে পারে, যদি তাহাদের মনে প্রকৃত মানবোচিত চরিত্রগঠনের প্রবল প্রতিজ্ঞা জাগ্রত হয়, এমন চরিত্র, যাহা কোন প্রলোভনের কাছে, কামকলুষ বা ভয়ের সম্মুখে নত হইবে না, এবং যদি তাহারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানদণ্ডের দ্বারা প্রত্যেক ব্যাপারে প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে শিক্ষা করে,—এবং ইহাই ছিল ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি,—তাহা হইলে এই দেশ নিশ্চিতই সর্ব্বতোমুখিনী উন্নতির দিকে ধাবিত হইবে এবং যেই সকল

অমঙ্গল পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া নিতেছে, এবং যাহা ঋষি মুনিগণের দ্বারা অধ্যুষিত পুণ্যভূমিতে আমদানী করা হইতেছে, তাহারা আমাদের অভ্যুদয়কে পঙ্কিল করিতে পারিবে না।

"স্বামী স্বরূপানন্দজীর শিক্ষাদানমূলক বক্তৃতা-সমূহের ভঙ্গিমার মধ্যে লক্ষ্য করিবার মত একটী বিশেষত্ব এই যে, বাস্তবের সহিত সম্পর্ক-শূন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সমূহের শুষ্ক আলোচনা তিনি করেন না। তিনি দারুণ বাস্তবতা-বোধ-সম্পন্ন একটী মানুষ। তিনি আমাদের ব্যক্তিগত সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের এক একটী নয়ন-গ্রাহ্য সমস্যাকে তুলিয়া ধরেন, এই সমস্যাগুলির বিভিন্ন দিকের প্রতি জনতার একাগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, বিভিন্ন মতের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কে ইহাকে কি ভাবে দেখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, তাহা বলেন এবং জনসাধারণকে আস্তে আস্তে তাঁহার যুক্তিশক্তির সহায়তায় সেই মতে টানিয়া আনেন, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার আদর্শবাদের দিক্ হইতে তিনি যাহাকে এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান বলিয়া মনে করিতেছেন। এই সকল সমস্যা আমাদের জীবনের উপরে এবং তাহাদের সমাধানগুলি জীবনের বিভিন্ন বিভাগের উপরে কি প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা তিনি দেখাইয়া দেন। তিনি সর্ব্বদা মনে রাখেন যে, তিনি বর্ত্তমান জগতের একটি মানুষ, যেই জগতের ভাব-সর্ব্বস্বতান্ত্রিক আলোচনার চেয়ে

মানুষ বাস্তবের আলোচনায় অধিক আনন্দ পায়। তাঁহার যুক্তি-পরম্পরা বিস্তারের ধারাও সম্পূর্ণ-রূপে আধুনিক। তাঁহার মধুময় সুর-ঝঙ্কৃত কণ্ঠ এবং যোগ্য ভাষার উপরে পূর্ণ আধিপত্য তাঁহার যুক্তিগুলিকে আরও শক্তিশালিনী করিয়া তোলে। এই সব মিলিয়া তাঁহার অসামান্য জনপ্রিয়তার সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাদাতা-রূপে বিরাট সাফল্য দিয়াছে। আমরা তাঁহার জীবন-লক্ষ্যের সিদ্ধিলাভ কল্পে প্রার্থনা করি।"

ঢাকা

৮ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪২

(২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ময়মনসিংহ হইতে ঢাকা পৌঁছিয়াছেন। ষ্টেশনে যে যুবকেরা অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঝড়ে নাকি পুপুন্কী আশ্রমের টিনের ছাবড়া উড়াইয়া নিয়া গিয়াছে, তাহার কি হইল।

অযাচকের সুবিধা ও অসুবিধা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঝড়ে সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে, কোনো কিছুরই চিহ্ন মাত্রও থাক্‌বে না, এই কথাটাকে ধ্রুব সত্য জেনেই ত' কুটীর নির্ম্মাণ করেছিলাম। পুপুন্কীর ঘরদোর ঝড়ে উড়িয়েছে, বেশ করেছে, আবার ঘর বানাব, আবার

নষ্ট হবে, আবার তৈরী কর্‌ব আমার সাময়িক আশ্রয়-নীড়। জীবন ভ'রেই এই মারাত্মক খেলা খেলে যেতে হবে। একথা জেনেছি ব'লেই মনে আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। অযাচকের অনেক ক্লেশ, অনেক কৃচ্ছ্র, কিন্তু কেন ঘরটী নূতন ক'রে নির্ম্মাণ কর্ল্লাম না, বা পারলাম না, এজন্য কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবারও প্রশ্ন ওঠে না। এটা হচ্ছে অযাচকের পরম শান্তি। একটী পয়সা যে দিন তোমাদের কাছে চেয়ে নেব, তার পরদিন থেকেই তোমাদের হাজার কৈফিয়তের দাবী মেটাতে কেবল কারণের পর কারণ দেখাতে সময় নষ্ট কর্ব্ব। সে কি এক কম ঝক্‌মারি? কাজের লোক কাজ ক'রেই আনন্দ পায়, কথা ক'য়ে, অর্থের জন্য আবেদন ক'রে বা কাজের অকাজের কৈফিয়ৎ দিয়ে আনন্দ পায় না। তবে অযাচকের সব চেয়ে বড় অসুবিধা এইখানে যে, তার অযাচকত্ব তাকে অন্য সর্ব্বসাধারণ থেকে এমনই আলাদা ক'রে রেখে দেয় যে, সে তার কাজে অধিকাংশ লোকেরই কোনো সহযোগিতা প্রত্যাশাও কত্তে পারে না। দেশবিখ্যাত কোনো মহান্ দাদা নিত্য কামনা কচ্ছিলেন যে, আমি যেন মুখ ফুটে তাঁর কাছে দান প্রার্থনা করি, তা' হ'লেই তিনি আমার ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে দেবেন। কিন্তু আমি চাইলুম না, চাইতে প্রলুব্ধ হলাম না, নানা রকম ঘটনার মধ্যে প'ড়েও নিজের শিরদাঁড়াকে একটুখানিও বক্র হ'তে দিলাম না, ঘাড়টার উপরে মাথাটা একেবারে সোজা ক'রেই রেখে

দিলাম। সুতরাং আসব ব'লে কান্নাকাটি ক'রেও সেই ধন আমার কাছে এল না। ফলে ইচ্ছুক দাতার সঙ্গেও আমার কর্ম্মযোগের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল না। অযাচকের এইটাই এক মস্ত বড় অসুবিধা। পুপুন্‌কীতে আশ্রম ক'রে মানভূমকে আমি সাধ্যাতীত সেবা দেবার চেষ্টা ক'রে এসেছি, কিন্তু আমি যে অযাচক। আমার কাজে মানভূমবাসীদেরও যে সহযোগ-হস্ত নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন, একথা তারা বুঝবে কি ক'রে? আমি গিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আবেদন শুরু কর্‌লে তবে ত' তারা বুঝতে পার্ব্বে যে, তাদের এগিয়ে আসবার প্রয়োজন আছে! এই যে শহর ময়মনসিংহ থেকে এলাম, চৌদ্দটা ত' বক্তৃতা দিয়েছি, একটা কথাও কি উচ্চারণ করেছি যে, আমার অর্থের প্রয়োজন? শহর আমাকে আতিথ্য দিয়েছেন, প্রতিদিন আমার বক্তৃতা শুনেছেন, এটাই ত' আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার এই শহরে আসবার মধ্যে শহরবাসী একটী প্রাণীরও কোনো পার্থিব স্বার্থ ছিল না, তবু যে তাঁরা আতিথ্যের সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন এবং আমার মুখের কথাগুলি শোনবার জন্য দলে দলে আগ্রহাকুল হ'য়ে প্রতিদিন এসেছেন, এতেই ত' আমি কৃতার্থ। কিন্তু অধ্যাপক অক্ষয়বাবু বলেছিলেন,—'শহরবাসীদের উচিত আপনাকে কিছু টাকা তুলে দেওয়া।' আমি বলেছিলাম,—'আমি ত' টাকা তোলার জন্য বক্তৃতা দিতে পারি না মশায়! আমার বক্তব্য বলার জন্যই এসেছি, টাকা

তোলার জন্য নয়।' অক্ষয় বাবু বল্লেন,—'এটাই আমার কাছে এক নিদারুণ আশ্চর্য্য ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার আদেশ ও অনুমোদন ছাড়া আমরা কিছু কত্তে পারি না। এজন্য এই ক্ষেত্রে আমরাও নিরুপায়।'

বক্তৃতার বীজমন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি স্থিতিস্থানে আসিলে সন্ধ্যার সময়ে ঢাকার কতক জন বিশিষ্ট নাগরিক দেখা করিতে আসিলেন।

একজন বলিলেন,—এবার আবার ঢাকাতে কয়েক দিন বক্তৃতা দিয়ে যান।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক ঔষধ হজম না হ'তে ডাক্তার তার রোগীকে নূতন ঔষধটী গলাধঃকরণ কত্তে দেন না। একবার এসে সকলের কাণ ঝালাপালা ক'রে যা ব'লে গিয়েছি, ত' আগে এখানকার শ্রোতাদের হজম হ'য়ে যাক্, তারপরে আবার বক্তৃতা শুরু করা যাবে।

ভদ্রলোক বলিলেন,—একথা সত্য। আমাদের দিক্ থেকেও কর্ত্তব্য ছিল। আপনার ঢাকার ধারাবাহিক বক্তৃতাবলির পরে আমাদের কর্ত্তব্য ছিল, সেই সকল বাণীর সারাংশ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান করা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই। বক্তা বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। তার মানে এই যে, তিনি তাঁর পরমায়ু ক্ষয় ক'রে গেলেন। অর্থলোভ যাঁর আছে, তিনি টাকা তুলে নিয়ে

গেলেন, যাঁর নেই তিনি শূন্য হস্তে নিজের খরচেই চ'লে গেলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য-বিষয়ের ভালমন্দ নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা হ'ল না। ফলে যে চিন্তাগুলিকে তিনি মুক্তহস্তে বিতরণ ক'রে গেলেন বক্তৃতামঞ্চ থেকে, সেই চিন্তাগুলি ভূমিতে আর উপ্ত হ'ল না, শূন্যে মিশে গেল। হয়ত একেবারে ব্যর্থ হ'ল না। কিন্তু যার ফলে যা' ঘট্‌তে পারত, ত' আর ঘট্‌ল না। এসব ক্ষেত্রে বক্তৃতাদান একটা ব্যসন মাত্র। স্বদেশী আমলে দেখেছি, বিপিন পাল জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে গেলেন, পিছে পিছে নিঃশব্দপদসঞ্চারে এলেন পুলিন দাস তাঁর বিপ্লবী অনুশীলন নিয়ে। দেশের লোক, কল্পনাও কত্তে পারল না যে, বিপিন পালের নিক্ষিপ্ত বীজ থেকে পুলিন দাস কি দারুণ ফসল তুল্‌লেন। আমি অবশ্য বিপিন পাল নই কিন্তু আমার বক্তৃতাগুলিও বীজমন্ত্র, ছড়িয়ে ত' দিলাম, তাকে মাটিতে বপন ক'রে ফলপ্রসূ করার জন্য আপনাদের নিশ্চয়ই কিছু করণীয় আছে।

ভদ্রলোক কথাটি অস্বীকার করিতে পরিলেন না।

সতীদাহ ও রামমোহন

একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম-প্রচারক রামমোহন রায়ের কথা তুলিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সতীদাহ নিবারণকে রাজা রামমোহনের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ব'লে মনে না

করলেও চলে। কারণ, সতীদাহ তখন বাধ্যকর কোনো সামাজিক প্রথা ছিল না। আমরা ভারতবাসীরা যে নারী-উৎপীড়ক এবং নিষ্ঠুর, এই কথাটা প্রচারের ভিতরে যাদের রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল, নিষ্ঠুরতার বার্ত্তা তারাই ফলাও ক'রে প্রচার করেছে। যেমন, অন্ধকূপ-হত্যা একটা মিথ্যা রটনা মাত্র, যার মূলে এক কণা সত্যও নেই, তাকেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ ক'রে ইংরেজরা এদেশে ও বিদেশে প্রচার কত্তে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করে নাই। আজ নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এই রটনাটা একেবারেই ভিত্তিহীন এক অবিমিশ্র মিথ্যা, তাই আমাদের মনে চিন্তা জেগেছে যে, কল্‌কাতা ড্যালহাউসি স্কোয়ারের হত্যার মিথ্যা কলঙ্কটাকে ভেঙ্গে ধূলিসাৎ কি ক'রে ক'রে দেওয়া যায়। তবে, প্রথারূপে সতীদাহ যে ছিল, একথা সত্য। সহমৃতা নারী হিন্দুর চক্ষে গৌরবাস্পদা ছিলেন, তাঁকে কুলপাবনী ব'লে জ্ঞান করা হ'ত। পতিসর্ব্বস্ব হিন্দু স্ত্রী যে কত সহজে, স্বেচ্ছায় এবং অকাতরে স্বামীর শবের সঙ্গে চিতারোহণ কত্তেন, তার ইতিহাস-গ্রাহ্য প্রমাণ আছে। সহমরণ যে বাধ্যকর ছিল না, তার একটি জলন্ত প্রমাণ এই যে, যে সময়ে প্রচারিত হচ্ছে যে রামমোহনের ভ্রাতৃবধূ অলকমণি স্বামী জগমোহনের চিতার আগুনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন, ঠিক সেই সময়েই দেখতে পাচ্ছি, রামমোহনের মাতা তারিণী দেবী পতির মৃত্যুতে সহমৃতা হন নি ব'লে সমাজে নিন্দিতা, ধিকৃতা বা

তিরস্কৃতা হন নি। অর্থাৎ সহমরণ বাধ্যকর ছিল না। অহল্যা বাঈ, রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি প্রভৃতি মহীয়সী মহিলারা প্রত্যেকেই বিধবা ছিলেন, তাঁরা স্বামীর সঙ্গে চিতায় মৃত্যু বরণ করেন নি ব'লে তাঁদের বিরুদ্ধে কদাচ কোনও প্রতিবাদ বা নিন্দা উত্থিত হ'তে শোনা যায় নি। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সহমরণ বাধ্যকর ছিল না। কিছু কিছু স্ত্রীলোক আত্মীয়-স্বজনের ষড়যন্ত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগ্নিকুণ্ডে যে নিহত হতেন, একথা সত্য কিন্তু অনেক নারীই অন্তরের গৌরববোধ থেকে অবহেলে অগ্নিতে প্রবেশ কত্তেন। শাসক ইংরেজরা যে এই প্রথার অবসান কামনা কচ্ছিলেন, তার মধ্যে দুটো কারণ বিদ্যমান। একটা তাঁদের মানবোচিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি, যার প্রশংসা অবশ্যই কত্তে হবে। অপরটী হচ্ছে, ভারতবাসীকে জগদ্বাসীর চোখে আংশিক হ'লেও হেয় দেখিয়ে জগদ্বাসীর কাছে নিজেদের জাতির জন্য আলাদা একটা মহিমার সৃষ্টি করা। অত্যন্ত মহানুভব ইংরেজেরও স্বজাতিপ্রীতি এত গর্ব্বিত যে, পৃথিবীর কাছে নিজের জাতিকে বড় করার চেষ্টায় তাঁদের বিরাম নেই। একদিন যদি ভারতের রাজপাট ছেড়ে এঁদের কখনো স্বদেশে ফিরে যেতে হয়, তাহ'লেও তাঁরা এমন কিছু কাণ্ড-কারখানা ক'রে যাবেন, যাতে তাঁরা নিজেরা জগতের কাছে অসীম উদার, পরম দাতা ও কল্পনাতীত সৎ জাতি রূপে কীর্ত্তি অর্জ্জন কত্তে পারেন,— তার ফলে ভারতবাসীর ভাগ্যে যাই কেন ঘটুক না। হিন্দুরা

অনেকেই যাকে একটা গৌরবজনক ব্যাপার মনে করে, তার বিরুদ্ধে আইন রচনা কত্তে গিয়ে ব্রিটিশ শাসককে আবার সিপাহী-বিদ্রোহের আমলে ফিরে যেতে না হয়, তার জন্য মহানুভব লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রয়োজন ছিল শাস্ত্রজ্ঞ কোনও হিন্দুরা বিশেষ সমর্থন। রামমোহন মানবিক কারণেই ইংরেজ সরকারকে সে সমর্থন দিয়েছিলেন এবং দেশব্যাপী সমর্থনের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। সতীদাহ নিবারণের ব্যাপারে রামমোহনের প্রসিদ্ধি যে ভাবে বেড়েছিল, তা-ই তার অন্যতর কাজগুলিতে শক্তি যুগিয়েছিল।

একেশ্বরবাদ ও রামমোহন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রামমোহন রায়ের শ্রেষ্ঠ কাজ মানুষের মনকে একেশ্বরবাদের দিকে আকৃষ্ট করা। একাজটী অন্য ভাবে অন্যেরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে করেছেন কিন্তু রামমোহন যে ভাবে কর্‌লেন, তার মূল অনেক গভীরে। নানক অলখ-নিরঞ্জনের দিকে মানুষের মনকে আকৃষ্ট ক'রে একাজ করেছেন কিন্তু শাস্ত্রানুগত হিন্দু-সমাজের মনে তার রেখাপাত হয় নি। শ্রীচৈতন্য, বিষহরি, শীতলা আদি দেবতাদের চরণ থেকে ভক্তজনের মনকে টেনে এনে একমাত্র কৃষ্ণতে আশ্রয়ীভূত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে সমগ্র জাতির লক্ষ্য সেখানে গিয়ে পড়ে নি, যেখানটায় পড়লে সবাই একটী মাত্র ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব দিতে পারেন। শাস্ত্রের পথে রামমোহন

একমেবাদ্বিতীয়মের আশ্রয় গ্রহণের যৌক্তিকতা অনেক শতাব্দীর পরে সকলের চোখের সামনে তুলে ধর্‌লেন। এইটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। তিনি যদি মোগল-সম্রাটের দরবারী মামলা নিয়ে বিলেত না যেতেন। তিনি যদি বিলেতেই ইহলীলা সম্বরণ না কত্তেন, তিনি যদি সময় মত দেশে ফিরে আসতে পাত্তেন, তিনি যদি তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণতা দানের জন্য স্বদেশে আমৃত্যু অবস্থান কত্তে পাত্তেন, তাহ'লে আমরা আরও কিছু বিস্ময়কার দান তাঁর কাছে পেতে পাত্তাম। তিনি নিশ্চয়ই চিন্তা ক'রে দেখ্‌তেন যে, একেশ্বরবাদী মন তৈরী কত্তে হ'লে একেশ্বরবাদী সংসার প্রয়োজন, একেশ্বরবাদী সংসারকে সচল রাখতে হ'লে একেশ্বরবাদী সমাজের প্রয়োজন, একেশ্বরবাদী সমাজ গ'ড়ে তুলতে হ'লে তিন শত বৎসর ধরে অর্থাৎ নয়টী প্রজন্ম ব্যেপে একেশ্বরবাদের অনুশীলনের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমাদের মহাপুরুষেরা প্রায় প্রতি জনেই কাজ অসমাপ্ত রেখে চ'লে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, এটাও কি একটা কম সমস্যা?

ছেলে চুরি, মেয়ে চুরি, নারীহরণ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— ছেলে চুরি আর মেয়ে চুরির ফলাও কারবার বোধ হয় অনাদি কাল থেকে জগতের প্রতি দেশে চলে এসেছে।

সীতাহরণ নিয়েই রামায়ণের কাহিনী। হেলেন হরণ নিয়েই ইলিয়ডের কাহিনী। আজকাল ছোট ছেলে চুরি হয় ভিখারীগিরির ব্যবসায়টীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তরুণী কিশোরী চুরি হয় নানা স্থানে নানা দেশে গণিকার বাজার জমজমাট করার জন্য। একদা এই ভারতবর্ষ থেকে ভিন্ন দেশাগত বিজয়ী সেনাপতিরা হাজার বা লাখ লাখ মেয়ে কেড়ে নিয়ে নিজের দেশে চ'লে গেছে খোলা বাজারে নিলামের দরে বিক্রী করার জন্য। নরমাংস ভক্ষণের জন্য ছেলেমেয়ে চুরি হয় কিনা, এই খবরটা সঠিক ভাবে এখনো জানা যায় নি কিন্তু এরূপ একটা আশঙ্কা অনেকের মনে রয়েছে। শ্মশানকালীর কাছে বলি দেবার জন্য দুটো একটা ছেলে কোনো কোনো অঞ্চলে প্রতি দেওয়ালীর অমাবস্যায় চুরি হয়, এ ত' সকলের জানা। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের শুশ্রূষা কাজের জন্য নার্সরূপে যে সকল মেয়েকে কাজে নেওয়া হয়, তাদের সকলেই শেষ পর্য্যন্ত নার্সই থেকে যায়, না, অন্য রকম জীবন-যাপন কত্তে বাধ্য হয়, এই বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলার উপায় নেই। জানলেও বলা বিপজ্জনক, কারণ ওটা হ'ল মিলিটারী-সিক্রেট। পাশ্চাত্য দেশে এখনো হাজার হাজার কনভেণ্ট আছে, যার সেবিকারা চিরকৌমার্য্য-ব্রতধারিণী তপস্বিনী। কিন্তু পাশ্চাত্য ছুটেছে দুরন্ত বেগে ভোগবিলাসের পিছনে। চারদিকে সম্ভোগ আর নরক। মদিরা আর ব্যভিচার কচ্ছে রাজত্ব। এমন পরিবেশে পাশ্চাত্য

মেয়েরা সন্ন্যাসিনী হ'য়ে জীবন মাটি কর্ব্বে কতজন আর কত দিন? তখন হয়ত নানা ভাঁওতা দিয়ে বিদেশ থেকে কুমারী মেয়ে সংগ্রহ ক'রে কনভেন্টগুলিতে চালান দিতে হবে, সিস্টারের চাকুরীর জন্য। নানা প্রলোভন দেখিয়ে এভাবে মেয়েদের টেনে নেওয়া প্রকৃত প্রস্তাবে হবে নারীহরণেরই মতন একটা কদর্য্য ব্যাপার। সমগ্র জাতি যদি না সাবধান হয়, তাহ'লে এসব পাপ নিবারণ সম্ভব নয়।

পুঞ্জীকৃত চিঠিপত্র জমিয়া রহিয়াছে। অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

সংসার-সংগ্রামে জয়ী হও

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উপার্জ্জক পিতা কিছুমাত্র সঞ্চিত বিত্ত না রাখিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনের ভিতরে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তুমি 'কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ' বলিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীস্বরূপে রওনা হইলে কনখল-লছমনঝোলা, ইহা আমি অনুমোদন করিতে পারিলাম না। তুমি সন্ন্যাসী হইয়া কতজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছ, এই কথাটি আগে ভাব। তুমি হরিদ্বার বা বৃন্দাবনে গিয়া উপার্জ্জন

করিয়া খাইবে, না, বাঁচিয়া থাকিবে ভিক্ষান্নের উপরে, যেই অন্ন অন্যেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিয়াছিলেন দান। প্রথম সময়ে তুমি সমাজকে বা দেশকে কোনও সেবাই দিতে সমর্থ হইবে না, বরং জলৌকার মত শোষণ করিবে শ্রমশীল অভাবীদের অর্জ্জিত অন্নের সারাংশটুকু। ইহা এক প্রকারের জাতীয় অপচয়। অন্য দিকে তুমি তোমার নিরাশ্রয়া মাতা, ভগিনী ও অশিক্ষিত ভ্রাতৃবর্গের বিপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবার সুযোগটুকু নষ্ট করিয়া দিবে। বৈরাগ্য যদি আসিয়া থাকে, তবে বিরাগ নিয়াই সংসারের জীবগুলির সেবার কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত কর, আসক্ত হইও না,—এই উপদেশ আমি তোমাকে দিব। পিতা গতাসু হইয়াছেন তোমাকে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবার গৌরব অর্জ্জন করিতে সুযোগ দিবার জন্য, কাপুরুষের ন্যায় সংসারের কর্ত্তব্যের চাপ দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিবার জন্য নহে।"

শিক্ষাক্ষেত্রে পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন আবশ্যক

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের পিতামাতারা নিজ

নিজ পুত্রকন্যাদের জীবন-গঠনের জন্য আশ্রম-জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আসিতেছে। নানা যুগে নানা ভাবে এদেশে নানাবিধ আশ্রম প্রতিষ্ঠিতও হইয়াছে। আশ্রমগুলির সহিত রাজকীয় প্রাধান্যের বা রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহের শুভসংযোগ প্রায়শই ছিল না বলিয়া দরিদ্র ঋষিরা দীন ভাবে নিজ নিজ আশ্রম পরিচালন করিতেন। গুরু শিষ্যদের অন্ন নিজে যোগাইতেন, শিষ্যরা নিজ নিজ বংশানুগত কৌলীন্যের কথা বিস্মৃত হইয়া নিদারুণ শ্রমের দ্বারা এই জীবিকা-সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করিত। রাজার ছেলেকেও গুরুগৃহে আসিয়া ধেনু চরাইতে হইত, শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমির পর ঘোর কান্তারসমূহ অতিক্রম করিয়া গাভী এবং বৎসদিগের তনুরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইত, বর্ষাকালে কৃষিক্ষেত্রে জল সংরক্ষণের জন্য আইল ভাঙ্গিয়া গেলে নিজের সমগ্র দেহকে শায়িত রাখিয়া জলবেগ আটকাইতে হইত, খাদ্যাভাব ঘটিলে আকন্দ পাতার মত ক্ষতিকর পাতা খাইয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে হইত। কিন্তু এত সব করিবার পরেও আসল লাভ তাহার যাহা হইত, তাহা হইতেছে একটী পূর্ণাঙ্গ মানুষের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিমূর্ত্তিতে সে পরিণত হইত, সে একটী খাঁটি মানুষ হইত। শিক্ষাক্ষেত্রে সেই পুরাতন জীবন-চর্য্যার পুনরাবর্ত্তন আজ আমাদের প্রয়োজন।"

দুঃখ, প্রেম ও লয়

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রেম আসিলেই শান্তি আসে, কারণ প্রেম দুঃখ ভুলায়, প্রেম দুঃখের মূলীভূত কারণ অজ্ঞানতাকে দূর করে, প্রেম দুঃখকে সহিয়া সহিয়া জয় করিবার শক্তি দেয়, প্রেম পার্থিব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ও অভিজ্ঞতাকে অপার্থিব অগ্রগতির সহায়তা করে। একান্ত ভাবে প্রেমাশ্রয়ী হও। দুঃখের অধিষ্ঠান-স্থল শরীরেও বটে, মনেও বটে। তাহার প্রকৃত জন্মভূমি অজ্ঞানতায়। পরমেশ্বর তাঁহার নামের প্রোজ্জ্বল মহিমায় অন্ধের নয়নে জ্ঞানের আলো ফুটাইয়া তোলেন, তাই সাধকেরা সর্ব্বাবস্থায় নামাশ্রয়ী হন। মঙ্গলময় নামে মন রাখিলে তাহাতেই শান্তি আসিবে। সংসারকে নামময় কর, তাতেই সংসার প্রেমময় হইবে। তাহা হইলেই দেহে, মনে, প্রাণে, সংসারে এবং সর্ব্বত্র শান্তি পাইবে। শান্তি খুঁজিতে হয় না, শান্তি আপনি আসে। প্রেমে প্রাণ পূর্ণ হইলেই শান্তি আসে না। দিবানিশি নাম করিতে করিতে প্রেম আপনিই আসে। প্রেমকেও খুঁজিয়া নিতে হয় না। প্রেম নিজের স্বভাবে তোমাতে আসিয়া সুস্থিত হইবে। কেবল নাম করিয়া যাও। নাম করায় কত যে সুখ, কত যে শান্তি, তাহা, যাহারা নাম করিয়াছে, মাত্র তাহারাই জানে,—অপরের জানিবার বা

বুঝিতে পারার কথা নয়। যাহারা ইহার রহস্য জানে না, তাহারা তিক্ত ও কটু মন্তব্য করিতেছে বলিয়া তাহাদের উপরে বিরক্ত হইও না। চিরকাল তাহারা এভাবে একাজ করিতে পারিবে না। ধৈর্য্য ধর।"

অসবর্ণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধাধিকার

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দীর্ঘকাল ধরিয়াই শাস্ত্র ও প্রথা তথা স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ব্যবস্থাপক পণ্ডিত-সমাজ ও পুরোহিতবর্গ অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধতা করিয়া আসিতেছেন, ইহা সত্য, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী চলে না, চলে অর্থনৈতিক অবস্থার তরঙ্গ-তাড়নে উৎক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত, আলোড়িত ও আবর্ত্তিত হইয়া। আর, স্ত্রীপুরুষের মিলন-ব্যাপারে প্রজাপতি নামক এক অদৃশ্য দেবতার ভ্রূকুটির ইঙ্গিতে নানা সময়ে স্মার্ত্তবিধি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে সমাজ-শাসকবর্গের তাৎকালিক শক্তি-সামর্থ্য-প্রভাব অনুযায়ী কাহারো কাহারো জাত্যন্তর ঘটিয়াছে কিন্তু পুত্রের শ্রাদ্ধাধিকার কেহই হরণ করিতে পারেন নাই। শ্রাদ্ধকালে পুরোহিতকে যজন-যাজন করিতে দিব না বলিয়া সামাজিকবর্গ হুঙ্কার তুলিয়াছেন আর শ্রাদ্ধকার্য্যে আগ্রহী পুত্র অন্যত্র গিয়া কিছু বেশী দক্ষিণা দিয়া অন্য পুরোহিতের দ্বারা কাজটী সমাপ্ত করিয়াছেন। আধুনিক কালে অবস্থাপন্ন অসবর্ণ-বিবাহকারীর জাতিপাত বা

জাত্যন্তর মোটেই ঘটে না, কিছুকাল একঘরে হইয়া থাকিবার পরে সুযোগ সুবিধামতন যে যার পূর্ব্ব মর্য্যাদায় ফিরিয়া যায়। তবে, সামাজিকবর্গকে বা সমাজের সাধারণ লোককে অভিভূত করিয়া দিবার মত ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়। শ্রাদ্ধে যাহার বিশ্বাস আছে, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলেও সে পিতামাতার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধ করিবেই, দেশে না পারিলে ত' সঙ্কটতারণ গয়াধাম আছে, সেখানকার পাণ্ডারাও আছেন। তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়া যদি মামলা বাধে, তবে কোথাকার জল কোথায় গড়াইবে, ইহা বলা কঠিন। এমত ক্ষেত্রে পিতার জীবৎকালের মধ্যে শরীরের সুস্থ থাকা অবস্থায়ই পুত্রের বা পুত্রদের ভাবী স্বত্বাধিকারীরা অনুকূলে একটী চরম ইচ্ছাপত্র বা উইল রেজিষ্টারী করিয়া দিলে যাবতীয় আশঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে। প্রাচীন ঋষিরা নিজেরাই অনেকে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের জাতিপাতও ঘটে নাই, তাঁহাদের পুত্রদের শ্রাদ্ধাধিকারও বিলুপ্ত হয় নাই। অবিরাম নানা শ্রেণীর শোণিত-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে হইতে জাতিটা যখন একটা বিশ্বরূপ ধারণ করিতে চলিয়াছিল,—এমন সময়ে সহসা পশ্চিম দিক হইতে সর্ব্বগ্রাসী এক নবধর্ম্ম উদ্যতদণ্ড হইয়া দেশবাসীর ধর্ম্মের মধ্যে আপতিত হইলে আত্মরক্ষার তাগিদে হিন্দু-সমাজ একটা নিদারুণ কমঠ-নীতি অবলম্বন করিয়া অসবর্ণ বিবাহকে অচল করিয়া দিলেন বলিয়া কোনো কোনো মনীষী ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি।

কথাটা অনুমান হইলেও অযৌক্তিক নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে অসবর্ণ বিবাহ যে দিনের পর দিন দুইটা একটা করিয়া কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং এরূপ চলিতেও থাকিবে, লক্ষণে তাহা সুস্পষ্ট হইতেছে। বর ও বধূর আত্যন্তিক ও আন্তরিক আকর্ষণে যাহা ঘটিবেই ঘটিবে, তাহার সহিত লড়াই করিয়া যে পারা যাইবে না, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া আস্তে আস্তে প্রাচীনপন্থী সজ্জনেরাও অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে উদারতর হইতেছেন, লক্ষ্য করা যাইতেছে।"

অসবর্ণ বিবাহ ও বিশ্বমানবের একীভবন

অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সর্ব্বত্র অসবর্ণ বিবাহ হইতেই থাকুক, এইরূপ কোনও নির্দ্দেশবাণী আমি কখনো তোমাদের কাহাকেও দেই নাই। কারণ, স্ববর্ণে বিবাহের প্রথা এদেশে এমনই বদ্ধমূল এবং তাহার সহিত মানুষগুলির মন এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট ও আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, কাহারও কোনও চিরপোষিত সংস্কারে আঘাত করিতে গেলে উৎক্ষেপের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ব্যতিক্রম-স্থলে কোথাও কোনও অসবর্ণ বিবাহ ঘটিয়া গেলে আমি কদাপি তাহার বিরুদ্ধতা করি না। নানা যুগে নানা ভাবে নানা দেশে নানা রকমের বিভিন্ন ও বিচিত্র রুচি

মানুষের মধ্যে সাংসারিক আদান-প্রদান ঘটিতে ঘটিতে আস্তে আস্তে বর্ত্তমান মানব-সমাজগুলির সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটিয়াছে। আমাদের প্রতিজনের শরীরে কোনও না কোনও সময়ে এমন কোনও না কোনও বংশের শোণিত আসিয়া মিশিয়াছে, যাহা নির্ণয় করা আজ অসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন নৃতত্ত্ববিদের পক্ষেও অসম্ভব। ব্যতিক্রমরূপে যে শোণিত-সংমিশ্রণ আদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে, তাহা সূক্ষ্ম ভাবে এই ইঙ্গিতই করিতেছে যে, একদা পৃথিবীর সমস্ত মানব-গোষ্ঠীগুলির সহিত অন্য সকল মানব-গোষ্ঠীর ধীরে ধীরে মিলন ও একীভবন একটা আশ্চর্য্যজনক বা অসম্ভাবিত ব্যাপার নহে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ গঠনের দিক দিয়া মানুষ এক হইতে পারে নাই, তাই বাহ্যতঃ রক্তসংমিশ্রণ করিয়া এক হইবার মত একটা অভিনয় হইলেও সমস্ত পৃথিবী এভাবে এক হইয়াও হইতে পারিবে না। যাবতীয় মানুষের মন অন্য ভাবে, অন্য উপায়ে, অন্যতম কৌশলে একীভূত হইয়া গেলে শোণিত-সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া একীভবন একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র হইবে।

পরীক্ষা-ব্যবস্থার আবশ্যকতা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরীক্ষা নেওয়ার প্রথা আমাদের দেশে যাহা চলিয়া

আসিতেছে, তাহাকে নিশ্চয়ই খুব একটা আদর্শস্থানীয় বলা যায় না। কিন্তু এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার কি ভাবে করিতে হইবে, একথা ত' স্পষ্ট ভাবে আজ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই বা বলিতে পারেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান-প্রচলিত পরীক্ষা-বিধির মধ্য দিয়াই জগদীশ চন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, গৌরী শঙ্কর দে, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি বরেণ্য ও ধীমান্ পুরুষদিগকে আমরা পাইয়াছি। পরীক্ষা না থাকিলে কি করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে যে, ছাত্র দিনের পর দিন বা সপ্তাহের পর সপ্তাহ বা মাসের পর মাস ধাপে ধাপে উন্নতির পথে চলিতেছে কিনা? কতটুকু শিখিল, এই বিষয়ের সঠিক মান পরীক্ষার উত্তর-পত্র দেখিয়া নির্ণীত না হইতে পারে কিন্তু নিজের আয়ত্ত করা জ্ঞানটুকুকে ছাত্র কতটা নিজের লেখনীর মুখে প্রকাশ করিয়া ধরিতে পারে, পরীক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা তাহার একটা আভাষ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। এই আভাষটা পাওয়া যায় বলিয়াই একজন ছাত্র বিশ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম, অপর জন দ্বিতীয় এবং অপর জন তৃতীয় স্থান অধিকার করিল বলিয়া বিবেচনা করা যায়। একজন ছাত্র লেখাপড়া শিখিল কিনা, তার চেয়েও বড় কথা এই যে, সব ছাত্রদের মধ্যে নিজের অধীত বিদ্যাকে লেখনীমুখে প্রকাশ করিয়া ধরিবার যোগ্যতায় কাহাদের মধ্যে কি তারতম্য আছে, পরীক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা তাহার একটা কাছাকাছি অনুমান জন্মিতে পারে। শিক্ষাদান-

কার্য্য অব্যাহত ভাবে ও ধারাবাহিকতায় চালু রাখিতে হইলে পরীক্ষা-ব্যবস্থা একটী থাকা নিতান্তই প্রয়োজন,—তাহার বিধি-ব্যবস্থাদি কি হইবে, তাহার নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণ কি ভাবে চলিবে, তাহার শুচিতা, সম্মানীয়তা, সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা কি ভাবে রক্ষিত হইবে, তাহা নিয়া সংশোধন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, আংশিক পরিত্যজন বা নবতর সংস্করণ চলিলে চলিতে পারে। বিজ্ঞ চিকিৎসক একটী রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করিতে আসিয়া যদি হঠাৎ আবিষ্কার না করিতে পারেন যে, রোগীর আলজিহ্বার নিকটে একটী গ্রন্থির ক্রিয়া দূষিত, না স্বাভাবিক, তবে তাঁহাকে সুচিকিৎসক বলিব না। ছাত্র ক্লাসে বসিয়া কেমন পাঠ নিল এবং ঘরে বসিয়া সে পাঠ কতটা অভ্যাস করিল, পরীক্ষক এই পরীক্ষাটী নিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি না বুঝিতে পারেন যে, পরীক্ষা-কালে এই ছাত্র কতটা রাখিল আত্মসম্মান, আর কতটা করিল চুরি, তাহা হইলে তাঁহাকে সুপরীক্ষক বলিব না। কিন্তু তাঁহার হাতে শুধু নম্বর-বিতরণ বা নম্বর-কাটা ছাড়া অন্য কোনও ক্ষমতা নাই। শিক্ষকগণের হাতে তাহা আছে। ছাত্ররা পরীক্ষার হলে আসিয়া যদি অসদুপায় অবলম্বন না করে, অন্যের শ্রমের ফলকে নিজের শ্রমের ফল বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা না করে, তাহারা যদি একে অন্যকে অবৈধ ভাবে উত্তীর্ণ হইবার সহায়তা না করে বা একে অন্যের কাছ হইতে তেমন অসম্মানকর সহায়তা না নেয়, তাহা হইলে এই ছাত্ররা পাশ

করুক আর ফেল মারুক, এই ধ্রুব সত্যটী প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেল যে, শিক্ষকেরা পড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হইবার বিদ্যাটাও কতকটা ইহাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন। পরীক্ষার আসল জয় ত' এইখানে। যে ছেলে দায়ে পড়িয়াও অন্যের খাতা দেখিয়া টুকিল না, বাহিরের বন্ধুদের প্রেরিত সাহায্যকারী কাগজপত্রের সহায়তা নিল না, সে ত' আমার মতে একজন জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম বা একজন উর্ব্বশী-প্রত্যাখ্যানকারী মহাবীর অর্জ্জুন। পরীক্ষা-ব্যবস্থা যাহাই হউক, পাশ করিবার জন্য ছাত্ররা যে টুকিল না, নকল করিল না, বাহিরের সাহায্য নিল না, তাহাদের এই চরিত্রবলটুকু দেখিয়া নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পারি যে, ভবিষ্যতের এক শুভ দিনে স্বদেশ-প্রেমের যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে জীবনের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিবার সময়ে ইহারা সুসজ্জিতা সকামা সুন্দরী সুপ্রিয়া রমণীর প্রলোভনে জীবন-সাধনায় জলাঞ্জলি দিবে না, প্রচুর ক্ষমতা হাতে পাইয়া ইহারা দেশবাসীর ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের বিলাস-ব্যসনে ব্যয়িত করিবে না, পরকে ধোকা দিয়া জুয়াচুরি করিয়া ইহারা মনুষ্য-সমাজে পূজিত এবং ইতিহাসে বন্দিত হইবার অপচেষ্টা করিবে না। পরীক্ষা-ব্যবস্থা যাহাই হউক, পরীক্ষার হলে গিয়া খাতাপত্র হাতের কাছে পাইয়াও যাহারা ঘৃণাভরে তাহার সহায়তা-গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করিবে, আমি বলিব, একমাত্র ইহাদেরই কাছে অনেক কিছু আমাদের প্রত্যাশা করিবার রহিয়াছে।"

নামের নেশায় মাতোয়ারা হও

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বলিতে শুনিয়াছি, পুত্রশোক বজ্রাঘাত-তুল্য, এ শোক সহ্য করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। কিন্তু দিন যায়, ক্ষণ যায়, শোকও একদিন চলিয়া যায়। ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, পুত্রশোকও ভোলা যায় কিন্তু টাকার শোক ভোলা যায় না। বিশ্বাস করিয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া বা নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র নির্লোভ ব্যক্তি জানিয়া কোনও বান্ধবের কাছে গোপনে টাকা গচ্ছিত করিয়া তারপরে যখন ঐ টাকা মারা যায়, সেই সময়েই এই কথাটা বেশী শোনা যায়। কিন্তু মাস যায়, বছরও যায়, মানুষ টাকারও শোক ভুলিয়া যায়। নূতন কোনও নেশা যদি মানুষকে ধরে, যেমন জুয়ার নেশা, মদের নেশা, মেয়ে মানুষের নেশা বা জালিয়াতির নেশা,—তাহা হইলেই যে-কোনও শোক ভুলিয়া থাকা যায়। সব কিছু ভুলাইয়া দিতে পারে বলিয়াই ত' উহার নাম নেশা। কিন্তু সকল নেশার রাজা হইতেছে নামের নেশা, মানে ভগবানের নাম করিতে করিতে অন্তরে প্রেমরসসিক্ত যে কুহেলীঘেরা এক আশ্চর্য্য মাদকতার সৃষ্টি হয়, সেই নেশা। এই নেশা মানুষকে পাপ হইতে পরাঙ্মুখ করে, দুর্ব্বলতার সোজা ও কুটিল রাস্তাগুলি হইতে বিমুখ করে, কুকথা, কুচিন্তা, কুতর্ক,

কুসঙ্গ ও কদাচার হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আনিয়া বারংবার স্নেহ-কোমল করে, শ্রীভগবানের চরণের অঞ্জলি করিয়া দিয়া তবে ছাড়ে। অর্থনীতি-বিশারদেরা এই নেশার মধ্যে অনেক শোষণ ও লুণ্ঠন কল্পনা করিয়া ভীতি গ্রস্ত হইতে পারেন কিন্তু ভয়কে জয় করিবার এই নেশাই যথার্থ মহৌষধ। তোমরা নামের নেশায় মাতোয়ারা হও।"

নিজ পথে অটল থাক

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একজন আজীবন কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া কষ্টার্জ্জিত সঞ্চয়ের ধনটুকু দিয়া একখানি আশ্রয়কুটীর নির্ম্মাণ করিল আর হঠাৎ একজন শক্তিশালী দাম্ভিক পুরুষ বলপূর্ব্বক গৃহদ্বারে কুলুপ লাগাইয়া চাবিটি নিজের পকেটে রাখিতে রাখিতে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—সাবধান, এই গৃহ আমার, ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এরূপ ঘটনা এই পৃথিবীতে ঘটে। তুমি আজীবন শ্রম করিয়া একটী কূপ খনন করিলে পানীয় জলের আশায়, আর আমি আচম্বিতে গিয়া কূপের মুখে তক্তা চাপাইয়া কূপ বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলাম, এ কূপ আমার, তোমরা ইহা হইতে জল তুলিতে পারিবে না। এরূপ ঘটনাও এ জগতে ঘটে। পরিত্যক্ত ও বনজঙ্গলে দুর্ভেদ্য ভাবে আবৃত এক মূল্যহীন ভূমি পরিষ্কার করিতে করিতে দেখিলে প্রাচীন

ইষ্টকের স্তূপ। ঐগুলি সরাইতে সরাইতে দেখিলে ইহা সত্য সত্যই এক পরিত্যক্ত দেবমন্দির। তোমার মনে সাধ জাগিল যে, এখানে তুমি তোমার বাঞ্ছিত মতে শ্রীভগবানের উপাসনা করিবে। অমনি লাঠিসোটা টেঁটা-বর্শা আদি নিয়া এমন একদল লোক আসিল, যাহাদের আনন্দ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর মন্দির-বিনাশে। তাহারা বলিল, এটা আমাদের পূজিত পরমেশ্বরের পূজার স্থান, তোমাদের নহে, তোমরা এখান হইতে সরিয়া যাও, যে পূজা করিবার আছে, আমরা করিব, তোমরা নহে।—এরূপ ঘটনাও এই দুনিয়ায় অলভ্য নহে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও তোমাদের কাজ তোমাদিগকেই করিয়া যাইতে হইবে। তোমরা রুপিলে বৃক্ষ, অন্যে পাড়িবে ফল ইহা এই পৃথিবীর নিত্যকার দুর্ঘটনা হইলেও, তোমাদিগকে নিজ পথে অটল থাকিয়া চলিতে হইবে। অপরের শত দোষ ভুলিয়া যাইয়া নিজেকে দোষ-প্রমুক্ত করিবার সাধনায় তোমাকে লগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে, কাপুরুষতা বর্জ্জন করিতে হইবে।"

শিক্ষকদের সমস্যা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শিক্ষকদের সমস্যার অন্ত নাই। তার মধ্যে একটা সমস্যা এই যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের ছাত্রদের ক্রমিক অগ্রগতি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখেন,—ছাত্র পড়ায় মনোযোগী

নহে, তাহার মনোযোগী হওয়া দরকার,—অমনি মাতাপিতা গর্জ্জন করিয়া বলিবেন,—না, এমন কথা হইতেই পারে না; বাড়ীতে থাকিতে আমরা দেখিয়াছি সে সারাদিন বই নিয়াই পড়িয়া আছে। শিক্ষকেরা যদি মন্তব্য করেন যে,—ছাত্র, উদ্ধত ও দুর্বিনীত, ঔদ্ধত্য কমিলে ও বিনয় আসিলে সে সহজে উন্নতি করিতে পারিবে,—তাহা হইলে পিতামাতা গর্জ্জন করিয়া বলিবেন,—কি, আমার সন্তানকে এভাবে মন্দ কথা বলা হইল, এমন বিনয়ী, নম্রস্বভাব ছেলে এই শহরে আর কাহার কয়টা আছে? অর্থাৎ, শিক্ষক যদি ছাত্রের মঙ্গল-কামনায় ছাত্রের ত্রুটিগুলি মা-বাপের চোখের সামনে তুলিয়া ধরেন, তবে পিতামাতা পুত্রের সংশোধনে সহায়তা না করিয়া করিবেন অসহযোগ এবং ক্রোধ-প্রকাশ। শিক্ষক-জীবনে ইহা একটী অসামান্য সমস্যা। আবার কোনও কোনও অভিভাবক শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্যকে এমন শক্ত করিয়াই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন যে, উহারই অজুহাতে পুত্রের বা ভ্রাতুষ্পুত্রের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া শিশুমনের অঙ্কুরটুকুকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেন। এমন ছাত্রের প্রতিভা থাকিলেও আর উন্নতি সম্ভব হয় না, তাহার জীবনের সর্ব্বনাশ ঘটে। একথা বুঝিয়া অনেক শিক্ষক অভিভাবকদের কাছে ছাত্রের সম্পর্কে আবশ্যকীয় মন্তব্য প্রেরণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। ইহাও কম সমস্যা নহে।"

ঢাকা
৯ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
(২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

জন্মশাসন ও ব্রহ্মচর্য্য

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার প্রেরিত পুস্তকখানা আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ভাবী কালের নিদারুণ অন্ন-সঙ্কটের সম্ভাবনার বিষয় চিন্তা করিয়া ইঁহারা জনসংখ্যা সীমিত রাখার প্রয়োজনে জন্মশাসনের নানা পদ্ধতির কৃত্রিম উপায়ের উপযোগিতা বর্ণনা করিতেছেন। ইঁহাদের অভিমত এই যে, ব্রহ্মচর্য্যের-পন্থা অবলম্বন করা জনসাধারণের পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যের পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা কেহ করিবে না বা করিলে হাস্যাস্পদ হইবে, ইহা অসঙ্গত কথা। ব্যাপক ভাবে যদি জন্মশাসনকে সফল করিতে হয়, তাহা হইলে পরিবেশ-পরিশুদ্ধির জন্য ব্যাপকতর ভাবে ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তাকে প্রচার করিতে হইবে। নতুবা জন্মশাসনের কৃত্রিম প্রণালী-সমূহ, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এমন অনেক ব্যভিচারী আচরণের সৃষ্টি করিবে, যাহা সভ্য-সমাজে আদরণীয় নহে। জন্মশাসনের আন্দোলন যদি কুমারীদের কৌমার্য্যহরণ করিবার

পথ সুগম করিয়া দেয়, অক্ষুণ্ণ-চরিত্র পুরুষের পাপ-বাসনাকে উদ্দাম, অবাধ ও সহজ-পূরণীয় করিয়া দেয়, তবে লাগাম-ছাড়া এই সমাজ-ঘোড়া কোন্ বিপথে ছুটিয়া গিয়া বিঘোরে মরিবে, তাহার কোনও স্থিরতাই নাই। এখনও দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ লাগে নাই কিন্তু একদা লাগিবে। তখন দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য মানুষেরা ভ্রূণহত্যাকেও আইনত সিদ্ধ করিয়া নিবার জন্য প্রয়াস পাইবে। দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াও মানুষ বিবাহ করিবে কিন্তু দাম্পত্য-জীবন নামে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকিবে না। এখন যাহারা ভাবী কালের দুর্ভিক্ষের কথা ভাবিয়া জন্মশাসনের কৃত্রিম উপায়-সমূহের বিবরণ দিয়া পুস্তক-পুস্তিকা ছাপিতেছেন, তাঁহারা যে বিদেশী ব্যবসায়ীদের উদ্‌ভাবিত পণ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের বাজার খুলিয়া দিবার জন্য লেখনী পরিচালনা করিতেছেন না, এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি কি? অন্নাভাবে মানুষ মানুষের মাংস পর্য্যন্ত খাইতে শিখিবে, তথাপি জন্মনিয়ন্ত্রণ করিবে না, ইহাই মানুষের জৈব-প্রকৃতি। কিন্তু জৈব প্রকৃতির উপরে দৈব আদর্শের জয় ঘোষণা করিবার জন্য কি প্রকৃত মানুষেরা উদ্যম নিয়োজিত করিবেন না? গল্প, কবিতা, নাটক সবই লিখিল কামোদ্দীপক করিয়া, কারণ তাহাতে ঘরে আসে নগদ রৌপ্যমুদ্রা, আর প্রত্যাশা করিব যে সকল মানুষ ব্রহ্মচারী হইয়া যাউক,—ইহা সত্যই দুরূহ। একদিকে একদল

লোক যখন জন্মশাসনের কৃত্রিম প্রণালীসমূহকে জনপ্রিয় করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে চাহিতেছেন, অন্যদিকে তেমন তখন আর একদল লোকের প্রয়োজন হইতেছে মানুষকে স্বাভাবিক সংযমের সহজ আনুকূল্যের মলয়-পবনের শান্তিপ্রদ স্পর্শ পাইবার সুযোগ দানের। অতএব কেবল জন্মশাসনের উদ্দেশ্যেই নয়, মানুষের মনকে এক শুচিস্মিত সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে রাখিবার যোগ্যতা দানের জন্যও ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন আছে। যেদিন এমন নিরাপদ ও বিরূপ-প্রতিক্রিয়াহীন সদুপায় আবিষ্কৃত হইবে যে, পৃথিবীর সবগুলি মানুষ জন্মদানকে স্বেচ্ছাধীন করিয়া নিতে পারিবে, সেইদিনও সেইদিনও এই শুচিতার প্রয়োজনেই ব্রহ্মচর্য্যের দরকার হইবে।"

সমবেত উপাসনার মহিমা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাগুলি তোমরা শান্তিতে ও আনন্দের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা করিও। মনে রাখিও যে, ইহার মধ্য দিয়াই ঘটিবে তোমাদের সামগ্রিক এক অভ্যুদয়। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার স্থান লইয়া, বার লইয়া, তারিখ লইয়া, সময় লইয়া বা নিয়ম

লইয়া তোমাদের মধ্যে কোনও কলহ, মতভেদ, মনান্তর অশান্তির যাহাতে সৃষ্টি না হইতে পারে, এই বিষয়ে প্রতিজনে অবহিত থাকিও। জেদ বা গোঁড়ামি, দম্ভ বা গোয়ার্ত্তুমি যেন এই পবিত্র অনুষ্ঠানটীর ভিতরে না প্রবেশ করে। সমবেত উপাসনার নিয়ম-কানুন আগে হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। সকলে যদি একটী নিয়মই অনুসরণ করে, তাহা হইলে ত' বিভেদ বা সংঘর্ষ ঘটিবার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। জনে জনে নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা হইও না। যেই নিয়মটীর যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পার না, তাহা পরবর্ত্তী কাল-মধ্যে বুঝিয়া নিবার আগ্রহ নিয়া সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হও। সমবেত উপাসনা যদি তোমরা কোনও গ্রামে বা শহরে নির্ঝঞ্ঝাটে ধারাবাহিক তিনটী বৎসর করিয়া যাইতে পার, তবে জানিও, তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমরা ঐ অঞ্চলের মাটীর ভিতরে অতীব শক্তিশালী সম্পদ নিহিত করিয়া রাখিলে, যাহা একদা নিজ বীর্য্য সুনিশ্চিতই প্রকাশ্যে প্রকট করিবে। সমবেত উপাসনার আধ্যাত্মিক সুফলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের আর একটী বিশেষ কুশল আমি এই চাহি যে, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি নিবিড়তর হউক এবং এই সম্প্রীতি সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বজাতিতে, সর্ব্ববর্ণে, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিতে বিসর্পিত ও সঞ্চারিত হউক। তোমাদের প্রতি কুশলবুদ্ধি আমাকে জগতের প্রতি স্নেহশীল করিয়াছে। আমি তোমাদের কুশল এমন ভাবে চাহি, যাহা নিখিল জগতের প্রতিজনের

পক্ষে কুশলবর্দ্ধক হয়। শুধু পারমার্থিক কুশলের দিকে তাকাইয়া নহে, আধিভৌতিক কুশলও সমবেত উপাসনার এক অভাবনীয় শুভফল।"

কর্ম্মীর কৃতিত্বকে স্বীকার কর

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহার যে বিষয়ে যেটুকু যোগ্যতা আছে, তাঁহাকে সে বিষয়ে ততটুকু সমাদর ও সুযোগ নিশ্চয়ই দিতে হইবে। এই একটী নীতি যদি সর্ব্বদা পালন করিয়া চলিতে না পার, তাহা হইলে তোমাকে শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া জীবনের যাবতীয় ব্রত ও কর্ত্তব্য একাই পালন করিতে হইবে, অপরের সহযোগ তুমি পাইবে না। কি ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান, কি সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, কি রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহাদের প্রত্যেকটীর মধ্যেই এই নীতি পালনই হইবে প্রকৃত ও দূরদর্শী কর্ম্মীর বা নেতার যোগ্যতার একটী প্রধান মাপকাঠি। ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র যোগ্যতা আছে। তবু ত' আছে! ঐ ক্ষুদ্র যোগ্যতার অনুযায়ী ক্ষুদ্র একটুকু গৌরবজনক কাজের ভার তাহাতে অর্পণ কর। তাহাকে বিশ্বাস কর এবং তাহার প্রতি অকপট হিতৈষী হও। কৌশল করিয়া তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে রাখিয়া দিয়া লোকের কাছে গাহিয়া বেড়াইও না যে, সে নিজে কাজ করিতে অনিচ্ছুক, তোমরা তাকে নিয়া কি করিবে? মানুষের ব্যক্তিসত্তা কাজও চাহে, কৃতিত্বের স্বীকৃতিও চাহে। এই দুইটা

জিনিষই অকাতরে তাহার মাথায় তুলিয়া দিতে হইবে। কর্ম্মীর অভাব বলিয়া এত ত' চীৎকার কর কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী কি ভাবে গড়িয়া লইতে হয়, তাহাও ত' জানিতে হইবে। আমি আমার তুচ্ছতম সহকর্ম্মীকেও তাহার প্রাপ্য যশ ও সম্মানটুকু পাইতে দেই। তথাপি যে আমি কর্ম্মী রাখিতে পারি না, তাহার জন্য দায়ী আমার অযাচকত্ব। কেবল স্নেহ আর স্বীকৃতি পাইয়াই কাহারও পেট ভরে না। পেট ভরিবার জন্য অন্ন চাই। আমি অযাচক বলিয়া দরিদ্র এবং দরিদ্র বলিয়া নিরন্ন। আমার এখানে মানুষগুলি আধপেটা খাইয়া কাজ করে। কেবল তাহারাই আর্দ্ধোদরে বাস করে, তাহা নহে, তাহারা যেমন খায়, আমিও তেমনই খাই। তোমরা ত' চাঁদা তোল, চেষ্টা করিয়া দান সংগ্রহ কর, অন্নের ত' তোমাদের অভাব নাই, অনেক সময়ে অন্নের পরিবর্ত্তে তোমরা মালপোয়া খাও। তবু কেন কর্ম্মী থাকে না, এই প্রশ্নের দুইটী মাত্র জবাব আছে। হয় তোমরা কর্ম্মীর কৃতিত্বকে তার যোগ্যতানুযায়ী সম্মানটুকু দাও না, নতুবা তাহারা আশ্রমীয় ত্যাগ-জীবন গ্রহণের আদর্শটীর টানে আসে নাই, আসিয়াছে কারণান্তর বশত।"

পত্নী-বিয়োগে দারান্তর

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি যেরূপ সমস্যায় পড়িয়াছ, অনুরূপ সমস্যায় পড়িলে কিছুকাল আগের লোকেও নাবালক পুত্রকন্যাদের দেখাশুনা করিবার জন্য নিঃসঙ্কোচে একটী তরুণী ভার্য্যা সংগ্রহ করিত এবং সমাজের লোকেরা সকলেই জানিতে পারিত যে, চারি, পাঁচ, দশ ও বারো বৎসরের সদ্যোমাতৃহীন শিশুদের ঘরে একা ফেলিয়া পিতা যদি সারা দুপুর কর্ম্মস্থলে কাটাইয়া গভীর রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে, তবে এই শিশুগুলিকে দেখিবার লোক কেহ নাই বলিয়াই পিতাকে বিবাহকার্য্যটি করিতে হইয়াছে। কিন্তু এখনকার লোকের বিবেক এই বিষয়ে একটু অধিকতর জাগ্রত বলিয়া তাহারা ভাবিয়া থাকে যে, এই অবস্থায় নিকট-সম্পর্কিত কোথাও কোনও বিধবা মাসীমা, পিসিমা, বড় দিদি বা ছোট বোন নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিয়া থাকিলে তাঁহাকেই ডাকিয়া আনিয়া আশ্রয় দেওয়া উচিত এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শিশুদের বাড়িয়া উঠিতে দিয়া ইহাদের স্বাধীন বিকাশে সহায়তা করা উচিত। আমার শিষ্যদের মধ্যে কত কত জন ত' বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সংযম-সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। সেই অবস্থায় একজন বিপত্নীক শিষ্য কি পারিবে না বাকী জীবনটুকু হইতে স্ত্রীসঙ্গের আগ্রহকে একেবারে দূরে সরাইয়া রাখিতে? কথাটা ভাবিয়া দেখিও। কারণ, বিমাতা আসিয়া মৃতা সতীনের পুত্রকন্যাদিগকে ঠিক নিজের সন্তানের মতন দেখিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত সংসারে বড়ই অল্প। বিমাতার ঘরে পুত্রকন্যা পিতার

একেবারে পর হইয়া যায়। তখন তাহারা শান্তির খোঁজে মনকে অন্যত্র ধাবিত করে। ইহার সদ্যঃ-ফল যাহাই হউক, পরিণাম-ফল হইতেছে পিতার প্রতি পুত্রকন্যাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার অভাব। শিশুরা অনেক সময়ে না বুঝিয়া অন্যায় করে, গর্ভধারিণী মাতা তাহা সহ্য করিয়া স্নেহবশে তাদের আপন করিয়া রাখেন। সপত্নী-সন্তানের তুচ্ছ দোষ-ত্রুটিও বিমাতারা ক্ষমা করিতে পারে না এবং তাহা লইয়া তুমুল কাণ্ড সব ঘরে ঘরে ঘটিতেছে। এত সব ভাবিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিও। * * * পতি-বিয়োগে পত্নীর পুনর্বিবাহের অধিকার নাই, ইহাই হাজার হাজার বছর ধরিয়া সামাজিক প্রথা। এই অবস্থায় নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা যায় যে, পত্নী-বিয়োগে পতিই বা কেন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া বাকী জীবনটুকু সংযম, শুচিতা, পবিত্রতা ও জনকল্যাণের অনুশীলন করিবে না? পতিরা আবহমান কাল ধরিয়া পত্নীবিয়োগের পরে যেমন নিঃশঙ্কে নির্লজ্জ ভাবে কেবলই দারান্তর গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে পত্নীরা তেমন যদি পতিবিয়োগের পরে বৃথা জটলায় ও কুতর্কে মনোযোগ না দিয়া সোজাসুজি পছন্দ-মতন পত্যন্তর গ্রহণ করিতে থাকে, তখন সমাজের যে চিত্রটি ফুটিবে, ভাবিয়া দেখ, পতিরা যদি একপত্নী-পরায়ণ থাকিয়া পত্নী-বিয়োগের পরে সমাজ-কল্যাণের জন্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতকেই

জীবনের সার করে, তাহা হইলে তখন সমাজের ছবিখানা তাহার অপেক্ষা সুন্দরতর হইবে কিনা। সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা করিবার করিবে, হঠাৎ বুদ্ধিতে কিছু করিয়া বসিও না। বিবাহের ব্যাপারটা স্ত্রীর উপরে স্বামীরই নিরঙ্কুশ অধিকার নহে, স্বামীর উপরেও স্ত্রীর নিরঙ্কুশ অধিকার। একজন মরিয়া গেলে অপর জন তাহার স্মৃতি বুকে লইয়া বাকী জীবন পবিত্র ভাবে কাটাইবে, ইহাই আদর্শ সমাজের শ্রদ্ধার্ঘ্য আহরণ করিবে।"

পারিবারিক অশান্তিতে করণীয়

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিনা কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া স্ত্রী তাহার হাতের বঠিদাঁ-টা স্বামীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিল, স্বামী আহত হইল। বিনা কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া স্বামী তাহার হাতের চায়ের পেয়ালাটী স্ত্রীর মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল, স্ত্রীর কপাল কাটিয়া দর-দর-ধারে রক্ত ঝরিতে লাগিল। এইরূপ দৃশ্য সাধারণ ভদ্র গৃহেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কারণ নাই, তবু উত্তেজনা, ইহা কি সম্ভব। আসল কারণটী চোখে ধরা পড়ে নাই বা যুক্তিতে ধরা যায় নাই বলিয়াই ইহা অকারণ ঘটনা নহে। কারণ আছে মনের অতীব গভীরে,

যেখানে সহস্র সহস্র স্মৃতি ও সংস্কারের নীচে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে এক নিদারুণ ক্ষোভ, যে সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। গৃহীর জীবনে এত বড় শাস্তি আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু ইহার প্রতীকার সত্যই আছে। অকপট অন্তরে হৃদয় খুলিয়া দিয়া কুণ্ঠাহীন আনুগত্যে পরমেশ্বরের চরণে শরণাপন্ন হইয়া কেবল প্রার্থনা কর, বিস্মৃত পাপের অজ্ঞাত মূলদেশ তুমি উৎপাটন কর প্রভু, উৎপাটন কর।

"বিবাহ করে মানুষ শান্তির জন্য, অশান্তি সৃষ্টির জন্য নহে। বিবাহ এমন একটা সুন্দর বিধান, যাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বজায় থাকিলে স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর যাবতীয় সন্তাপ হরণ করিয়া একে অপরের তপ্ত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিবে, শীতল করিবে, সুখদ করিবে। একের প্রতি অপরের অনুরাগ উভয়কেই দিবে দুঃখ-দহনের, দারিদ্র্য-বহনের, সন্তান-পালনের ও সমাজ-কল্যাণ-সাধনের যোগ্যতা, রুচি ও সামর্থ্য। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে উভয়ের পূর্ণ মিলন ত' তাহাদিগকে দিবে,—দুইটী ভিন্ন পরিবেশে লালিত যৌবনের ভিন্নমুখী রুচি প্রকৃতি সত্ত্বেও,—পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য-বিধানের শক্তি ও সম্ভাবনা। বাল্যের পাপ, যৌবনের ব্যভিচার, তারুণ্যের বুদ্ধিবিকার ও হুজুগের রুচিবিকৃত অতীত জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তোমাদের যাহার যে ক্ষতিই করিয়া থাকুক, সব বাবা ভুলিয়া যাও। একমাত্র ঈশ্বর-চরণ-স্মরণকেই আশ্রয় কর। অকারণ দীর্ঘশ্বাস ও প্রতপ্ত আক্ষেপ এই পথেই বিদূরিত হইবে।"

স্বয়ং-নির্ব্বাচনে বর-বধূর বিবাহ

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিবাহের যোগ্য বয়স হইলে পুত্র বা কন্যা নিজ নিজ ইচ্ছামতন বর বা কনে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে, ইহা এই যুগে কোনও অভাবনীয় ঘটনা নহে। যদিও অতীতে চিরকালই পিতামাতারা বর বা কনে পছন্দ করিয়াছিলেন কিন্তু পুত্রকন্যার নিজ দায়িত্বে জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে বাছিয়া নিবার অধিকার ইহাতে লুপ্ত হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পুত্রকে বর্জ্জন করার নীতি অপেক্ষা বর ও বধূকে আদর করিয়া ঘরে তোলার নীতিই অধিকতর প্রশস্য হইবে। প্রণয়-মূলক বিবাহকে এদেশে মনে মনে অশ্রদ্ধা করিবার একটী রীতি আছে। তাহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তিও আছে। কিন্তু পিতামাতার প্রতি সন্তানের কৃতজ্ঞতা-হেতু আনুগত্যের প্রশ্ন বাদ দিলে এইটুকু সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পুত্র বা কন্যা যখন বিবাহিত হইয়াছে, তখন সর্ব্বতোভাবে তাহাদের ভাবী জীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময় হউক, এই আশীর্ব্বাদই সকলের করণীয়। প্রকৃত স্নেহশীল-পিতামাতা এই আশীর্ব্বাদ না করিয়াও পারেন না কিন্তু সামাজিক অভিমান বা পুত্রকন্যার ব্যবহারে ক্ষুব্ধতা

সেই আশীর্ব্বাদকে বাহ্য প্রকাশ হইতে বিরত রাখে। চুরি-ডাকাতি করিলেও পিতামাতার কাছে পুত্ররা ক্ষমা পায়, এমতাবস্থায় অসম্মতিতে বা অজানিতে বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে ক্ষমার অযোগ্য কেন মনে করিতে হইবে। দুঃশীল পুত্র দুর্বিনয় করিয়া হঠকারিতা বশাৎ এমন একটা বিবাহ করিয়াছে, যাহাতে অনুমোদন দেওয়া শক্ত জানিয়াও বাপ-মা শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমাই করেন। কিন্তু বিবাহ শুধু একটা পরিবারের প্রশ্ন নহে। ইহা একটা সমাজের প্রশ্ন। সমাজ আহত বোধ করিয়া থাকিলে যদি শাসন করেন, করিতে পারেন। সমাজ তাহার নিজ কর্ত্তব্য করুন, বরবধূ নিজেদের কর্ত্তব্য নিজেরা দেখুক।"

দুঃখদায়িনী স্ত্রীকে ক্ষমা

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—কোনও স্ত্রী যদি জীবনের প্রতিটি সৎকর্ম্মে স্বামীকে কেবল বাধাই দান করে এবং নিজ মতে আনয়ন না কত্তে পার্লে কটুকাটব্য করে, তবে সেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দাম্পত্য-জীবন এমনই একটা জীবন যে, দিনের বেলা যেখানে আকাশজোড়া মেঘ আর বজ্রগর্জ্জন, দিগন্তব্যাপী অন্ধকার আর মৃত্যুকুটিল আতঙ্ক, রাত্রি বেলায় হঠাৎ সেখানে জ্বলন্ত সূর্য্যের উদয় ঘটে গেল। সুতরাং

স্ত্রী যদি জীবনের প্রতিটি সৎকর্ম্মেও স্বামীকে কেবল বাধা দানই করে এবং নিজ পথে স্বামীকে আনয়ন কত্তে না পেরে কটুকাটব্য করে, এমন কি প্রহার, লগুড়াঘাত বা প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা আহত কর্ব্বারও চেষ্টা করে, তবু স্বামীর কর্ত্তব্য অটল ধৈর্য্য সহকারে তাকে এই ভেবে ক্ষমা ক'রে যাওয়া যে, আকাশের এই মেঘ ক্ষণস্থায়ী হ'তে পারে, বজ্রের এই গর্জ্জন দু' ঘন্টা পরে নিস্তেজ হ'য়ে যেতে পারে, বাধাদানের এই দুঃসাহস একদা একেবারে স্তিমিত হ'য়ে যেতে পারে। স্ত্রীর যদি গোপনে চরিত্রদোষ না ঘ'টে থাকে, তাহ'লে একমাত্র উন্মাদরোগিণী ছাড়া অন্য কোনও স্ত্রীলোক চিরকাল স্বামীর সঙ্গে প্রতিটি সৎকার্য্যের প্রসঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার কত্তে পারে না।

দাম্পত্য-জীবন বিশ্বাসের জীবন

আরও কিছু জিজ্ঞাসিত হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীকে চরিত্র-বিষয়ে সন্দেহ করা স্বামীর পক্ষে পাপ। স্বামীকে চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করা স্ত্রীর পক্ষে পাপ। একজন আর একজনকে কদাচ সন্দেহ কর্ব্বে না ব'লেই ত' পরস্পর পরস্পরের এত ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বিবাহিত জীবন কেবল চরম ঘনিষ্ঠতার জীবনই নয়, এটা পারস্পরিক বিশ্বাসের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের জীবন। এই জন্যই স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই এমন ভাবে চলা উচিত যেন কারো মনে বৃথা সন্দেহের সৃষ্টি না হয়।

নামব্রহ্মের ধ্যান

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁকে আমরা কখনো দেখিনি, তাঁকে ধ্যান করা যায় না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যে সকল গুণবাচক শব্দ আমরা শুনেছি, তাই থেকে একটা নির্ব্যক্তিক সত্তার উপস্থিত অনুমান কত্তে এবং অনুধাবন কত্তে পারি। নিরাকারের ধ্যান শক্ত ব্যাপার বলেই ধ্যানকে সহজে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পাঠ-রূপে সাকার ক'রে পরমেশ্বরের ধ্যান করা হ'য়ে থাকে। পরমেশ্বরের স্থলাভিষিক্ত ক'রে কৃষ্ণমূর্ত্তি, শিবমূর্ত্তি, দুর্গামূর্ত্তি আদির ধ্যান-চেষ্টা হয়। কিন্তু তুমি আমি যে কৃষ্ণ, যে বিষ্ণু, যে শিব বা যে কালীকে দেখেছি, সে কৃষ্ণ-বিষ্ণু-শিব-কালী ত' পটের কালী, ছবির কালী। পট বা ছবির অঙ্কনকারী শিল্পী নিজ চক্ষে এদের কাউকে দেখেন নি, কিন্তু লোকমুখে বা গুরুমুখে তাঁদের বর্ণনা শুনেছেন। সুতরাং তোমাকে যে-কোনও অবস্থাতেই কল্পিত মূর্ত্তিরই ধ্যান কত্তে হচ্ছে। এতে কোনো দোষ নেই। ধ্যানটা জমলেই হ'ল। কারণ, প্রকৃত ধ্যান জম্‌লেই নিজের কল্পনার বাইরের সত্য সামগ্রী এসে অবিমিশ্র অনুভূতি-রূপে ধরা দেয়। তখন অধরাকে ধরা যায়, অদেখাকে দেখা যায়। নানা রকম মূর্ত্তিধ্যান ক্ষতিকর—ধ্যান করবে ত' একটীরই কর। আর যদি নানা দেবে, নানা দেবীতে ভেদবুদ্ধি বশতঃ বিভ্রমের হয় সৃষ্টি, তবে সব চেয়ে ভালো হচ্ছে ওঙ্কার-মূর্ত্তি ধ্যান, মানে নামব্রহ্মের ধ্যান। ওঙ্কার

এমন এক মন্ত্র, যে মন্ত্রে সব মতের সব পথের মিল আছে। সুতরাং সম্প্রদায়ের নিরপেক্ষ ভাবে সবাইকে যদি ধ্যানের উপদেশ দিতে হয়, তবে ওঙ্কার-মন্ত্রকে ধ্যান কত্তে বলতে পারি। নামের চিন্তন নামের নাদকে অন্তরে জাগায়। অবার, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অবিরত নাম স্মরণ কত্তে কত্তে নামের ধ্বনিটি অন্তরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে। মনশ্চক্ষে দর্শন মনস্কর্ণে শ্রবণের সহযোগী হয়। তখন স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন আদি সর্ব্বপ্রকারের ক্রিয়া যুগপৎ হ'তে থাকে।

জপ ও ধ্যান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জপ ও ধ্যানে পার্থক্য অতি সামান্য। অবিরাম স্মরণ হ'ল জপ। অবিরাম দর্শন হ'ল ধ্যান। স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম ভাবে একটা দর্শন আমাদের হ'য়ে যায়, নতুবা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে কাকে স্মরণ কচ্ছি, এই অনুভূতিটুকু আসে কি ক'রে? কাকে স্মরণ কচ্ছি, এই কথাটী বুঝতে পারাই হ'ল ধ্যানের একটা সূক্ষ্ম অংশ। স্মরণ কচ্ছি কোন্ নামে, এইটীর খেয়াল রেখে একই নাম বারংবার ক'রে যাওয়ার নাম জপ। কোটি কোটি জপের সম্মিলিত সমন্বয়ী অনুভূতি হচ্ছে একটী ধ্যান। একটী ধ্যানের কোটি কোটি অংশের এক এক কণার শাব্দিক উপলব্ধি হচ্ছে জপ। পার্থক্যটা হচ্ছে degree and duration-এ, গভীরতা ও ব্যপকতায়। অন্য পার্থক্য কিছু নেই।

মাতৃধ্যান

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসিলেন,—গুরুধ্যান ও মাতৃধ্যান প্রভৃতি সম্পর্কে আপনার কি মতামত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কালীকে দেখিনি, মাকে দেখেছি। দুর্গাকে দেখিনি, মাকে দেখেছি। লক্ষ্মী-সরস্বতীকে দেখিনি কিন্তু মাকে দেখেছি। কালী, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতির ধ্যান কত্তে হ'লে অন্যের কল্পিত পটের ছবি থেকে আমাকে কল্পনা ধার নিতে হয়। মাকে স্বচক্ষে দেখেছি ব'লে তাঁকে ধ্যান কত্তে আমার কোনো কল্পনার আশ্রয়ই নিতে হয় না। যা প্রত্যক্ষ করেছি, তাকেই মাত্র পুনঃ স্মরণ কত্তে হয়। দেখা বস্তুকে ধ্যানে আনা অতি সহজ। কিন্তু লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী বা দুর্গাকে যেই সকল বিভূতির আকরীভূতা ব'লে কল্পনা ক'রে থাকি, মাকে সেই সকল বিভূতিতে মণ্ডিত দেখেছি কিনা, এটা একটা বিবেচ্য বিষয়। সুতরাং তাঁর ধ্যান করার সময়ে আকারগত ভাবে না হোক্ গুণগত ভাবে আমাকে কতকগুলি কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। তাতে যদি সফল হই, তাহ'লে ধ্যান জম্‌তে দেরী হবার কথা নয়।

গুরুধ্যান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঐ সকল কারণেই গুরুধ্যানও একটা সহজ ব্যাপার। এতে ক্লেশ বেশী নেই। কিন্তু দৈবের

চক্রে আমি একজন গুরুদেব। সুতরাং গুরুধ্যান সম্পর্কে কথা বলতে আমাকে বড় সতর্ক হ'য়ে বলতে হচ্ছে। গুরুকে যদি মানুষ ব'লে জ্ঞান কত্তে হয়, অর্থাৎ গুরুর দেহটাই তাঁর গুরুত্ব হয়, তাঁর জৈব জীবন ও পার্থিব ডাবী ও কর্তৃত্বই যদি তাঁর গুরুত্বের সীমা হয়, তাঁর রক্তচক্ষু, তাঁর অভিসম্পাত যদি গুরু ব'লে গণ্য করার হেতু হয়, তবে এই গুরুর ধ্যানটী না করাই ভাল। গুরুর মহিমা-সূচক যত শাস্ত্র ভারতে রচিত হয়েছে, তাদের আদি রচনায় বলা হয়েছে, আচার্য্যদেবো ভব, গুরুকে দেবতা জ্ঞান করো। সঙ্গে সঙ্গে এ'ও বলা হয়েছে, মাতাকে দেবতা জানো, পিতাকে দেবতা জানো, অতিথিকে দেবতা জানো। গুরুর মহিমা-সূচক অন্যান্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে, গুরুতে মানুষ-ভাব রেখো না, মানুষে গুরুভাব রেখো না, অর্থাৎ একটা ব্যক্তিকে দিয়ে গুরুত্ব শুরু হ'লেও চরম গতি গুরু নির্ব্যক্তিত্বে। আমি যাদের শিষ্য করি, তাদের বলি, আমি তোদের সঙ্গে আছি, তোদের সম্মুখে আছি, পশ্চাতে আছি, দক্ষিণে আছি, বামে আছি, নিদ্রায় আছি, জাগরণে আছি, কর্ম্মে আছি, বিশ্রামে আছি,—আর আছি নিয়ত তোদের সমসাধক হয়ে। ব্রহ্মার যিনি গুরু, বিষ্ণুর যিনি গুরু, শিবের যিনি গুরু, তিনিই আমার গুরু। আমার গুরুও যিনি, তোদের গুরুও তিনি। আমি আর আমার গুরু অভিন্ন। তোরা আর আমি অভিন্ন, অভেদ, এক। গুরু গুরু ভাবতে ভাবতে বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে গুরুকে দর্শন করার

চেষ্টা কর্, সর্ব্বভূতে তাঁকে পাবার প্রয়াস পা, সমগ্র জগৎ গুরুময় হোক্। গুরুভাবনা গভীর হ'লে নিজের আলাদা অস্তিত্বের কথা মনে থাক্‌বে না। তখন মানুষ অতি সহজে কামমোহের উর্দ্ধ জগতে চলে যায়, নিম্নস্তরের প্রবণতা তাকে আর স্পর্শ কত্তে পারে না।

দেববাদ ও ব্রহ্মবাদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতবাসীদের বিদেশীরা পৌত্তলিক ব'লে গালি দেয়। এ গালি নিরর্থক। ভারতবাসী পুতুলকে পূজা করে নি, পুতুলকে উপলক্ষ্য করেছে। পুতুল উপলক্ষ্য হ'ল অন্য এক উচ্চতর লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু পুতুলকে মানুষী ভাবসম্পন্ন হ'তে হ'ল। পুতুলের পশ্চাতে যে চৈতন্য-সত্তার চিন্তা করা হ'ল, তাকে মানুষ নিজের আকার দিয়ে আকারিত ক'রে নিল। ফলে নিজের অন্তরের যাবতীয় স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে সে ঐ চৈতন্যময় সত্তাতে আরোপ কর্ল্ল। তার ফলে ঐ কল্পিত দেবতার সঙ্গে তার একটা প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল। এই প্রেম গভীর হ'তে হ'তে এমন পর্য্যায়ে এল যে, একদা হয়ত ঐ দেবতাও আর নেই, এমন কি ঐ দেবতার পূজক সীমাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষটীরও আর মানস অস্তিত্ব নেই, অথচ চিরন্তন এক প্রেম-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি এপার থেকে ওপার, এধার থেকে ওধার, এজগৎ থেকে ওজগতে, ভূমি থেকে ভূমাতে, আকাশ থেকে

শব্দস্পর্শগন্ধাদি-বিবর্জ্জিত নিরাকাশে, বোধ থেকে বোধিতে অবিরাম আনাগোনা কচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের জগৎকে অতিক্রম কত্তে পারে নি ব'লে রোমের দেবতা, গ্রীসের দেবতা শিল্প, সঙ্গীত, নাট্য ও দিগ্বিজয়ের নানা ইতিহাস রচনা ক'রেও একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের ফলে লুপ্ত হ'য়ে গেল। আর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে অবলম্বন ক'রে আরম্ভ হ'য়েও ভারতীয় দেবোপাসনা শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র সৃষ্টি ক'রে নিল। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে এটা একটা বিচিত্র বিস্ময়। এই বিস্ময় কদাচ হ'ত না, যদি মানুষকে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকে মানুষ ভেবে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্ম ভাবার অনুশীলন ভারতীয় জীবনে না থাক্‌ত।

আত্মশক্তি, গুরুশক্তি, ও ব্রহ্মশক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পত্নী পতিকে দেবতা জ্ঞান করবে, এই শিক্ষা এই দেশের মেয়েরা অনেক যুগ আগেই নিয়েছিল। পত্নীকে সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি জ্ঞান কত্তে হবে, এই শিক্ষা আচার্য্যেরা দিয়ে এসেছেন, তত্ত্ব-হিসাবে এটাকে অধিকাংশ পুরুষ এদেশে স্বীকার ক'রে নিয়েছে কিন্তু অনুশীলন-হিসাবে তারা পিছনে পড়ে আছে। পারস্পরিক দেববুদ্ধিতে কেউ যদি কারো পিছে পড়ে না থাকে, তাহ'লে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রেমানুশীলন ক'রেও নরনারী পরস্পরের ইন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য স্থূল অস্তিত্বের গণ্ডীর বাহিরে পরস্পর পরস্পরকে অতীন্দ্রিয় মহাসত্তা ব'লে অনুভব কত্তে পারবে। ভারতের অতীত কালের অনেক অনুশীলনই এই অবস্থাটার দ্রুত সম্পাদনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। অতীতের অনেক কিছু আমরা ভুলে গেছি কিন্তু মানুষ যে শুধু মানুষই নয়, সে যে দেবতা, এই বোধটুকু পল্লী-সঙ্গীতের অশিক্ষিত-পটু কবিদের অন্তরেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় জাজ্বল্যমান। সেই বোধকে পূর্ণতঃ জাগ্রত কত্তে হ'লে আত্মশক্তিতে, গুরুশক্তিতে, ব্রহ্মশক্তিতে পরিপূর্ণ আস্থা এবং শ্রদ্ধার প্রয়োজন। গুরুকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সাধন-জীবন এক প্রকার অচল কিন্তু গুরুবাদের অপব্যবহারকে বাদ দিতেই হবে।

দীক্ষিতের দলবৃদ্ধির পক্ষে ও বিপক্ষে

কিছু লোক দীক্ষার্থ আগ্রহী ছিলেন বলাতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দল আমি বাড়াব না। দল বাড়ালেই বল বাড়ে না। অনেক সময়ে দলবৃদ্ধিতে বলহানি ঘটে। চরিত্র-বলই সব চেয়ে বড় বল। দল বাড়ালে শৃঙ্খলা ও চরিত্রের উন্নত মান রক্ষা ক'রে চলা বড়ই কঠিন। ময়মনসিংহে দীক্ষার্থী ছিল কিন্তু একটী প্রাণীকেও দীক্ষা দেই নাই। দীক্ষিতের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্য আছে। গুরুর প্রতিও দীক্ষিতের কর্ত্তব্য আছে। এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না রেখে হঠাৎ দীক্ষা নেওয়া অনেক

সময়ে মারাত্মক ব্যাপার হয়। তবে, কখনো কখনো জগতের হাওয়া এমন ভাবে বইতে থাকে, যখন সমদীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির অস্তিত্ব-রক্ষারই প্রয়োজনে আবশ্যক। কোনো কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সমদীক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য আগ্রহী হ'য়ে থাকেন। আমি আজ দীক্ষা দানে কুণ্ঠিত, দশ, বিশ, পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে আমিই হয়ত বল্‌তে বাধ্য হ'ব, লক্ষ লক্ষ সমদীক্ষিতের সৃষ্টি তোমরা কর, সকলের কর্ম্মশক্তি ও শ্রমশক্তিকে এককেন্দ্রক কর, সকলকে সমবেত উপাসনার বেদীমূলে এনে ঐক্যবদ্ধ ও সম্প্রীতিসম্পন্ন কর, প্রত্যেককে আমার অন্তরের বাণীর সঙ্গে এমন ভাবে সুপরিচিত কর যেন তার মুখের কথা শুনে লোকে আমারই বাণী শুনতে পায়। দিকে দিকে ভাবপ্রসার কর। মহাভাবগুলিকে সরস জমিতে কেবল প্রোথিত ক'রে যেতে থাক, আগামী তিনশত বৎসরের পরের পৃথিবীতে তার প্রকৃত ফসল উৎপাদনের সুমহৎ উদ্দেশ্যে। কিন্তু লোকেরা দীক্ষিতই হ'ল, জনকল্যাণ-মানসে প্রত্যেকে এক একটী সুশৃঙ্খল সৈনিকে পরিণত হ'ল না,—এমনটি ঘটলে সবই ফাঁকি, সবই মিথ্যা হ'য়ে গেল।

তোমরা নমস্য

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা যে দেশের সেবা কচ্ছ, একাজ যে কত

মহৎ, তা' আমি ভাষায় বর্ণনা কৰ্ত্তে পার্ব্ব না। তোমাদের আমি চিনি না, জানি না, তোমাদের সাথে আমার পরিচয় নেই, তবু দূর থেকে আমার পূজার পুষ্পাঞ্জলি তাদেরই চরণের উদ্দেশ্যে, যারা মান চায় নি, যশ চায় নি, কর্তৃত্ব চায় নি, নেতৃত্ব চায় নি, কেবল নিষ্কাম নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষণা যাদের সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরয়িত্রী শক্তি। নীরবে, নিভৃতে তোমরা জীবন বলি দেবে, শত সহস্র জনের প্রশংসা-ভাষণ তোমাদের উদ্দেশ্যে কলরব ক'রে উঠবে না, তবু তোমরা নমস্য। নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে তোমরা ফাঁসীর দড়ি গলায় পর্ব্বে, 'জয় মা দেশ-জননী' ব'লে ঝুলে পড়বে, হৃদয় একবিন্দু কাঁপবে না, ললাট-চর্ম্ম একটুকুও কুঞ্চিত হবে না, তোমাদের মৃতদেহ হয়ত জল্লাদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্য একটা লোকও থাকবে না, তবু তোমরা নমস্য। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তোমাদের নাম লেখা থাকবে না, বরং হয়ত তোমাদের দেশবাসীরাই তোমাদের নামগুলি ইরেজার দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলি দিয়ে সেই শূন্য স্থানে তাদের নিজেদের অপদার্থ নামগুলি লিখে দেবে এবং মিথ্যা ইতিহাসকে চিরস্থায়ী সত্যে পরিণত কর্ব্বার জন্য বিফল চেষ্টা কর্ব্বে, তবু তোমরা নমস্য। সকলের মা-বোনেরা ইজ্জতের দিকে তাকিয়ে তোমরা নিজেদের মা-বোনের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছ, সকলের ক্ষুধিত জঠরের কথা ভেবে ভেবে তোমরা নিজেদের ক্ষুধিত জঠরের কথা একেবারেই

বিস্মৃত হয়েছ কিন্তু তোমাদের আত্মদান ও ত্যাগের ফলে একদা যারা ক্ষমতায় সমাসীন হবে, তারা হয়ত সকলের মা-বোনের ইজ্জৎ পদদলিত কৰ্ত্তে কুণ্ঠিত হবে না, হয়ত অর্দ্ধনগ্ন অর্দ্ধাহারী বিপন্ন মানুষের কটিতলে লগ্ন ছিন্ন গামছাখানা কেড়ে নিতে ইতস্তত কর্ব্বে না,—তবু তোমরা নমস্য।"

এমন সময়ে কিছু চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিল। প্রশ্নকর্তা চারিদিক তাকাইয়া হঠাৎ একটা প্রণাম করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

স্থানীয় একটী ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাপার কি? লোকটী পুলিশের গুপ্তচর নয় ত'?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিপ্লবীও হ'তে পারে। যদি গুপ্তচরই হ'য়ে থাকে, কালই সকালে আমার হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি পড়বে।

যুবক বলিল,—তা' হলে ত' বিপদের কথা।

ইংরাজ-আগমনের সুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ছেলেটীকে আমার গুপ্তচর ব'লে মনে হয় নি। আর গুপ্তচরই যদি হ'য়ে থাকে, তবে আবার দেখা হ'লে বলে দিব,—দেখ ইংরাজ এদেশে না এলে শিখরা ইউ-পি, বিহার জয় ক'রে নিতেন, মারাঠীরা অন্ধ্র, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ জয় ক'রে নিতেন বর্ম্মীরা চট্টগ্রাম ও

আসাম জয় ক'রে নিয়ে বৌদ্ধ রাজ্য স্থাপন কত্তেন এবং তারপরে হিন্দুধর্ম্মে, শিখধর্ম্মে আর বৌদ্ধধর্ম্মে সহস্র-বৎসর-ব্যাপী লড়াই চল্‌ত। শিখের ধর্ম্মানুরাগ ছিল কিন্তু দেশপ্রেম কোথায়? মারাঠাদের ধর্ম্মানুরাগ ছিল কিন্তু দেশপ্রেম কোথায়? বর্ম্মীদের ভারতের প্রতি প্রেম থাকার কোনো স্বাভাবিক কারণ নেই, বুদ্ধদেবের জন্ম এই ভারতবর্ষে, এই একটুখানি কথা ছাড়া। ইংরেজ এসে ভারতবর্ষে একচ্ছত্র হয়েছে, ফলে আমরা তাৎপর্য্য বুঝতে পেরেছি যে, এতদিন "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" কেন বলেছি, সতীদেহ বাহান্ন পীঠে কেন বিভক্ত হ'ল। ঐক্যের সূত্র রচনা হ'য়ে রয়েছিল দুই তিন হাজার বছর আগে, সেই সূত্র পরিদৃশ্যমান হ'ল ইংরাজ কর্ত্তৃক সমগ্র ভারত দখলে আনায়। ইংরাজ যদি আফগানিস্থানও দখল ক'রে নিয়ে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দখল ক'রে নিতে পাত্তেন, তাহ'লে তাঁদের কাজ পূর্ণ হত। কিন্তু তা' হয় নি এবং হবেও না। ইংরাজ এসেছিল ব'লে আমরা নালন্দা, হারাপ্পা, মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন সভ্যতার মাটী খুঁড়ছি, নইলে সব ভগ্নস্তূপ দিয়ে গরুর ঘরের দেওয়াল গাঁথতাম। ইংরাজ এসেছিল ব'লে রাজা অশোকের কীর্ত্তিগুলি আমাদের শ্রবণগোচর হ'ল। ইংরাজ এসেছিল ব'লে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, তিলক, গান্ধী প্রভৃতির স্বদেশ-মন্ত্র সমগ্র

ভারত শুনল। ইংরাজ এসেছিল ব'লেই বিবেকানন্দ সমগ্র জগতে ভারতকে প্রতিষ্ঠা দিলেন।

সকলে শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাসির কথা নয়। এগুলি সত্য কথা। আমাদের দেশের লোকেরাই রাজর্ষি অশোকের কোনও খবর জানতেন না। ইংরেজরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে এমনকি আফগানিস্থানে পর্য্যন্ত অশোকের শিলালিপি বের ক'রে তার পাঠোদ্ধার ক'রে আমাদের শুনালেন রাজা অশোক কে ছিলেন, কেমন ছিলেন। মুঘল-পাঠান আমলে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পুরাকীর্ত্তি বিনষ্ট হয়েছে, ইংরেজ-আমলে নষ্টাবশিষ্টের উদ্ধার-কার্য্য হয়েছে। এটা যে ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের কত বড় দান আর ইংরেজের কাছে ভারতবাসীর কত বড় ঋণ, একথা অস্বীকার করা অন্যায়।

ঢাকা

১০ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪২

(২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

সৎ জীবনের সদাচার

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বীর্য্য ধ'রে রাখবার জিনিষ, ছুঁড়ে ফেলে দেবার জিনিষ নয়।

যত তাকে ধ'রে রাখতে পারবে, তত সে তোমাকে শক্তি দেবে, সাহস দেবে, তেজস্বিতা দেবে, আত্মবিশ্বাস দেবে। কিন্তু তার বহির্মুখ-গতির একটা স্বভাব আছে, যার প্রকৃত লক্ষ্য একটী বিপরীতলিঙ্গী আধারের জরায়ু। সেখানে সময় মত সুযোগ মত স্বচ্ছন্দ তৃপ্তি সহ পৌঁছে গিয়ে সে এককে বহু কর্ব্বে। নিতান্ত অনাবৃত ভাবে বীর্য্যের জান্তব লক্ষ্য ও পরিণতির দিকে তাকালেও তার সার্থকতা বাস্তব-প্রস্তাবে সেখানে। একদা মানুষ সময়-অসময় বুঝত না, নিয়ম-অনিয়ম বুঝত না, সঙ্গত-অসঙ্গত বুঝত না, ভালমন্দ পরিণামের কথা ভাবত না। সেই যুগ ত' আর নেই। এখন আমরা দ্বিপদ পশু নই, এখন আমরা দেবত্বের সম্ভাবনা-বিশিষ্ট দ্বিপদ দ্বিভুজ মানুষ। বীর্য্য-ধারণকে আমাদের ব্রত-রূপে গ্রহণ করা উচিত। যার প্রয়োজন সে সুস্থ মনে সুস্থ দেহে নিরুদ্বেগ চিত্তে নির্ভয়ে নিজ সময় মতন নিজ সুযোগ মতন জগতে যোগ্য আধারে প্রজাবৃদ্ধি কর্ব্বে,—প্রয়োজন না থাকে ত' সম্যক্ রূপে আত্মসংযম ক'রে চল্‌বে। সৎ-জীবনের এইটী হচ্ছে মূলীভূত সদাচার।

সংশোধন, সুনাম ও দুর্নাম

একজন প্রশ্ন করিলেন,—পুরুষ বা নারী যদি একবার পাপপঙ্কে ডুবে যায়, তবে কি আর জগতে সুনাম অর্জ্জন কর্ত্তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ভাল প্রশ্ন করেছ। কেউ যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ পাপপঙ্কে ডোবে, তবে সে চেষ্টা কর্ম্মে তা থেকে উদ্ধারও পেতে পারে। দুর্নাম ঘুচিয়ে সুনাম অর্জ্জনই তার লক্ষ্য হতে পারে না। সুনাম অনেক সময়ে চাল বা চালাকী দিয়েও অর্জ্জন করা যায়, দুর্নাম অনেক সময়ে কৌশলের সাহায্যে ঢেকে ফেলা যায়। কিন্তু সংশোধন আলাদা বস্তু। সংশোধন যদি আসে চরিত্রের, তবে ত' মানুষটা একেবারে বদলে গেল। চিন্তায়, বাক্যে কর্ম্মে সে তখন একটা আলাদা মানুষ হ'য়ে যায়। তখন সে কি আর সুনাম-দুর্নামের তোয়াক্কা রাখে?

পতিতোদ্ধারই সমাজ-সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একবার সংসারে দুর্নাম রটে গেলে সহজে আবার সুনাম অর্জ্জন সম্ভব হয় না ব'লেই ত' চেষ্টা কর্ত্তে হবে যেন মিথ্যা দুর্নাম কিছুতেই না রটনা হ'তে পারে। দুর্নাম রটনার সঙ্গে যদি থাকে বাস্তব ঘটনার যোগাযোগ ও সমর্থন, তবে ত' আরও বিপদ। কিন্তু গর্ত্তে একবার পা পড়েছে ব'লে জীবনের জয়যাত্রা স্থগিত রাখতে হবে, এটা কাপুরুষের লক্ষণ। শতবার পদস্খলন হ'তে পারে কিন্তু এগিয়ে যাবার চেষ্টাটা ছাড়া হবে না, এই জিদ থাকা প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর কর্ত্তব্য। নারীর জীবনে পাতিত্য এলে

সমাজ তাকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়, তাকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দেয় না। বিতাড়িতা হবার পরে নারী হয় একান্তই নিরাশ্রয়া, ফলে তখন তার আত্মসংশোধন আরো কঠিন হ'য়ে পড়ে। পুরুষের জীবনে পাতিত্য এলে সমাজের লোক দুচার দিন তাকে দুচারটা ধমক-ধামক দেয়, কাজ কিছু না হ'লে আস্তে আস্তে চুপ মেরে যায় বা সয়ে নেয়। ইচ্ছা করলে পুরুষ নিশ্চয়ই আত্মসংশোধন ক'রে নিতে পারে কিন্তু সমাজ-শাসন তার পক্ষে শিথিল ব'লে সে পায় প্রকৃত প্রস্তাবে প্রশ্রয়। এই প্রশ্রয় আবার তার আত্মসংশোধনের পথে হয় বাধা-স্বরূপ। সুতরাং একবার পতিত হ'লে ওঠা যে শক্ত, একথা দুজনের পক্ষেই খাটে। আমাদের প্রয়োজন এমন এক সামাজিক মানসিকতা, যাতে পতিতের পাতিত্য আর না বাড়ে, যাতে পতিতের উদ্ধারের পথ থাকে যাতে খোলা মনে সঙ্গত ঔদাস্যে দোষীর দোষ ক্ষমা ক'রে নেওয়া চলে, যাতে পাপপথে বিচরণের আকুলতা পুরুষ বা নারীর ভিতরে হ্রাস পায়। নির্ব্বিচারে যৌন-সংসর্গের দ্বারা মানুষ নিজেকে পশুর পর্য্যায়ে নিয়ে ফেলে। তার স্বাধীন ইচ্ছায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণের উচ্ছৃঙ্খলতায় ধ্বংসে হ'য়ে না যেতে যাতে পারে, তারই ত' উদ্দেশ্যে সমাজ নামক বস্তুটীর সৃষ্টি হয়েছিল। পতিতোদ্ধারই সমাজ-সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। মানুষ নিজের অসম্বৃত আচরণকে বারংবার বিচার ক'রে দেখেছে,

দেখেছে তা' ব্যক্তিগত জীবনে, লক্ষ্য করেছে তা সামূহিক সামাজিক জীবনে এবং যখন কৃত-নিশ্চয় হয়েছে যে, কোনো কোনো আচরণ ক্ষতিকর বা গর্হিত, তখন তা' থেকে নিজেকে এবং নিজ যূথ, নিজ গোষ্ঠী বা নিজ সমাজের সকল লোককে তার অপপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখার করেছে চেষ্টা। পশু ছিলাম, মানুষ হলাম, এর পরে যাত্রাপথ দেবত্বের দিকে। সবাই যখন দেবতা হব এবং সকলের ভিতরে সবাই যখন দেবতাকে দেখতে পার, তখন আস্বাদনে আস্‌বে যে, পরম সত্য ব্রহ্ম কি এবং তখন জান্‌তে পারব যে, আমিও ব্রহ্ম, তুমিও ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নেই, ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু, ব্রহ্মই একমাত্র অস্তিত্ব।

নামের মহিমা

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—কোনও চিকিৎসাতেই রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, এমন অবস্থায়ও কি ভগবানের নামজপে রোগ সারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের নামজপে, ভগবদ্ধ্যানে, ভগবদ্-বিষয়ক সৎকথা শ্রবণে, ভগবন্নামকীর্ত্তনে রোগের মূল কারণ-স্বরূপ স্নায়ুর দুর্ব্বলতা উপশান্ত হয়। যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, তারাও যদি নামের শরণাপন্ন হয়, তবে নামের গুণে তাদের রোগ হ্রাস

পাওয়ার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। রোগীর দেহ-মধ্যে কোটি কোটি অণুপরমাণু নিয়ত ভগবন্নাম শোন্‌বার প্রত্যাশায় তোমার দেহটার মধ্যে অতি কষ্টে দিন-যাপন কচ্ছে। তারা পিপাসিত, ভগবানের নাম তাদের পিপাসার জল। তারা ক্ষুধার্ত্ত, ভগবানের নাম তাদের ক্ষুধার অন্ন। তাদের তৃষ্ণা, তাদের ক্ষুধা মিটাবার ব্যবস্থা কল্লে কেন দেহ নীরোগ হবে না বল ত! কেউ কেউ নাম করে আর সঙ্গে সঙ্গে হিসাব কত্তে ব'সে যায় যে, কতটা নাম হ'ল। তারপরেই খুঁজতে থাকে, কোথায় নামের ফলটুকু। মাটিতে বীজ পুতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় যদি মাটি খুঁড়ে দেখ্‌তে হয় যে, শিকড় গজাল কিনা, অঙ্কুর এল কিনা, তাহ'লে সেই বীজ কি কখনো বৃক্ষে পরিণত হয়? নাম কত্তে হবে বিনা সর্ত্তে, ফলাফল লাভের প্রত্যাশা ছেড়ে। ভাব্‌তে হবে, নামের জন্যই নাম কচ্ছি, কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। নাম-সাধনে যে যত নিষ্কাম, তার নামের ফল তত সদ্যঃ এবং তত অধিক। লোকমানের জন্য নয়, যশোবৃদ্ধির জন্য নয়, ধনাগমের জন্য নয়, এমন কি রোগারোগ্যের জন্যও নয়, নাম কর্ব্ব শুধু নামের রসটুকু আস্বাদনের জন্য, মনে যখন এই ভাবটী হবে স্থায়ী, তখন নামের গুণে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার সব সংঘটিত হ'তে থাকে। যারা সত্যি সত্যি নাম ক'রেছে তারা এসব দেখেছে। যারা তা করে নি, তারা একমাত্র অবিশ্বাস করা ছাড়া আর কি কত্তে পারে বল।

নামে অবিশ্বাসীর সম্পর্কে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামের শক্তিতে যারা অবিশ্বাস করে, তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হ'য়ো না, তাদের অবজ্ঞা ক'রো না। সময় এলেই তারা নামে বিশ্বাসী হবে। তোমার বিশ্বাসটুকু যাতে তাদের সঙ্গে মিশে নষ্ট না হয়, তোমার কর্ত্তব্য শুধু ততটুকু সতর্কতার। নিজে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, অন্যকে দ্বেষ করার কোনো আবশ্যকতা নেই।

নামে বিশ্বাস, নাম-সাধন ও সাধুসঙ্গ

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন;—আমার ভগবানের নামে বিশ্বাস আছে কিন্তু নাম কত্তে রুচি আসে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামে বিশ্বাস আছে অথচ নামে রুচি নেই, এটা একটা আশ্চর্য্য কথা। রসগোল্লা মিষ্টি, এই কথাটী বিশ্বাস কর, তবু তোমার খেতে ইচ্ছা হয় না, এটা স্বাভাবিক নয়। খাদ্য বস্তুকে উপাদেয় জেনেও যখন খেতে ইচ্ছা হয় না, জান্‌তে হবে, তখন তোমার অজ্ঞাতসারে কোনও অসুখ করেছে। তখন ডাক্তার-বৈদ্যের কাছে সংপরামর্শ নিতে হয়। নামে বিশ্বাস আছে, তবু নাম-সাধনের অনুশীলনে অনিচ্ছা, এটাও মানসিক রুগ্নতারই একটা লক্ষণ। এই সময়ে নাম-রসিক, নাম-প্রেমিক, নামে আত্মহারা, নামে মাতোয়ারা

সাধু-সজ্জনের সঙ্গতি নিতে হয়, তাঁদের পরমভক্তিপ্রদ সৎসঙ্গ থেকে অরুচি-রোগের উপশম ঘটে।

ঈশ্বর ও পরমেশ্বর

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বর আর পরমেশ্বর একই বস্তু। কিন্তু আমরা যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, যম, কুবের প্রভৃতিকে ঈশ্বর আখ্যা দেই, তখন এঁদেরই পরমারাধ্য পরমকারণকে নাম দেই পরমেশ্বর। নইলে ঈশ্বর যা' পরমেশ্বরও তা'। যাঁরা ইন্দ্রাদি খণ্ড দেবতাদিগকে মানেন না, তাঁরা ঈশ্বর আর পরমেশ্বর বলতে একজনকেই বুঝেন, দুজনকে নয়।

ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমেশ্বর সম্পর্কে ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই দুইটী শব্দেরই ব্যবহার আছে। দুইটীর এক মানে, এক তাৎপর্য্য। যার চেয়ে আর বড় কেউ নেই, যাঁর উপরে আর কোনো স্রষ্টা, পোষ্টা, সংহর্ত্তা বা কর্ত্তা কেউ নেই, তাঁকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে। তাঁকেই কখনো মুখের লজ্জিতে পরব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম বলা হয়। পুরাণকাররা বিষ্ণুর উপরেও একজন মহাবিষ্ণুর কল্পনা করেছেন, যোগীরা শিবের উপরেও একজন মহাশিবের কথা বলেন। তার কারণ এই যে, দার্শনিক বিচারে বিষ্ণুতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব এক প্রকারের খণ্ডতত্ত্ব।

তাই তাঁদের চেয়ে বড় একজনের কল্পনা করার প্রয়োজন এল বা মানুষের কল্পনাপ্রিয়তা এই পথে আর একটী ধাপ অগ্রসর হ'য়ে সগুণ সাকার ব্রহ্মকে আর একটু বেশী মহিমান্বিত করার চেষ্টা পেল। কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মই, তিনি সগুণ হ'লেও ব্রহ্ম, নির্গুণ হ'লেও ব্রহ্ম, সাকার হলেও ব্রহ্ম, নিরাকার হ'লেও ব্রহ্ম। উপলব্ধির সাগরে তাঁর কোনো ঠাঁই পাওয়া যায় না ব'লেই বড়র বড়, তারও বড় ইত্যাদি কল্পনা ক'রে ক'রে কোনো কোনো সাধককে বিষ্ণু থেকে মহাবিষ্ণুতে, লক্ষ্মী থেকে মহালক্ষ্মীতে, শিব থেকে মহাশিবে, কালী থেকে মহাকালীতে সাঁতার কেটে পাড়ি দিতে হয়েছে। কিন্তু সাকার সগুণকে কল্পনার বলে স্বাভাবিক থেকে "মহা"—তে উত্তরণ দেওয়া সম্ভব হ'লেও নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে কল্পনার তুলিতে আঁকা চলে না। তাই ব্রহ্ম কথাটী পরব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম-রূপে বারংবার উচ্চারিত হ'লেও এই নামের বৈষম্য নিরুক্তির, তত্ত্ববোধের বা মর্ম্মার্থের কোনো পরিবর্ত্তন আনতে পারে নি। মুসলমান তাঁর আল্লাকে সগুণ জেনেও সাকার কত্তে পারেন নি। এই জন্যই আল্লা আর খোদাতে মহিমাগত অর্থপার্থক্য থাক্‌লেও সত্তাগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় নি। পার্শী তাঁর অহুরমজ্‌দাকে বা ইহুদী তাঁর জিহোভাকে নির্গুণ জ্ঞান করেন না কিন্তু সাকার রূপে তাঁর ভজনা নেই ব'লেই অন্য যে-কোনও নামে তাঁকে ডাকতে গেলে ভিন্ন আর একটি তত্ত্ববস্তুকে

বোঝেন না। একেশ্বরবাদী আর্য্যজাতি ভারতে প্রবেশের পরে এত অধিক সংখ্যক সাকার দেবতাকে নিজেদের ধর্ম্মসাধনার মধ্যে অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছেন যে, আজ এই কথা ভাবতে মহাপণ্ডিতেরও মনে ধাঁধা লেগে যায় যে, এঁরা এতকাল এদের মরমের সুশীতল কক্ষে কি ক'রে "একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি" এই একেশ্বরবাদমূলক সত্যটীকে জীয়িয়ে রাখতে সমর্থ হ'লেন।

বিশ্বদেববাদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেদের ঋষিরা যখন অগ্নি, যম, ইন্দ্র, অর্য্যমা, বিষ্ণু প্রভৃতি নানা নামে দেবতার স্তোত্র গান কচ্ছেন, তখন একটী অন্তঃসলিলা অনুভূতি তাঁদের অন্তরের ভিতরে বীণাঝঙ্কারের মত সুস্পষ্ট অথচ সুস্নিগ্ধ স্বরে প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতা প্রতীয়মানতঃ বিভিন্ন ভাবে অর্চ্চিত হ'লেও পূজা হচ্ছে মাত্র একটী দেবতার, যেই দেবতা সব দেবতার ভিতরে আছেন এবং সব দেবতা মিলিত হয়ে হন যেই একটী মাত্র অদ্বিতীয় দেবতা, যাঁর নাম-নিরুক্তি ব্রহ্ম ব'লে এবং যিনি সব দেবদেহের সমন্বয়ের মূর্ত্তি। এই মতবাদকে পরবর্ত্তী কালের দার্শনিকেরা নাম দিয়েছেন বিশ্বদেববাদ ব'লে। বেদান্তবাদের সঙ্গে এই বিশ্বদেববাদের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে একটা

আশ্চর্য্য রকমের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে, যেটা দার্শনিক বিচারেও চমৎকার, কবিত্বের হিসাবেও চমৎকার। বেদের ঋষিরা অধিকাংশেই ছিলেন প্রথমত কবি এবং কাব্যরসপ্রেরণা তাঁদের দিত শুষ্ক, নীরস, কঠোর-কঠিন দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যেও নূতন প্রাণের সঞ্জীবনা। তাই তাঁরা ভারতীয় আদিম সভ্যতার উত্তরাধিকারী খণ্ড উপাসকদের দেবতা-সমূহকে নিজেদের ধর্ম্মচর্য্যার ভিতরে গ্রহণ ক'রে নেবার হাজার বছর আগেই জেনেছিলেন যে, একই দেবতা সর্ব্বদেবতায় বিরাজ করেন, সর্ব্বদেবতার সমাহারে একটী মাত্রই দেবতা হন, এই অদ্বিতীয় দেবতা খণ্ডেও আছেন, অখণ্ডেও আছেন, বৈচিত্র্য-হীনতায়ও আছেন, সাকার-সগুণেও আছেন, নিরাকার-নির্গুণেও আছেন।

ওঙ্কার-তত্ত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই বিশ্বদেববাদ উপলব্ধিতে আসার অনেক পূর্ব্বে এমনকি বেদমন্ত্র-সমূহ তাঁদের কাছে এসে আবির্ভূত হওয়ার অনেক পূর্ব্বে তাঁরা এর চাইতেও চিত্ত-চমৎকার এক তত্ত্বের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। সেইটী হচ্ছে ওঙ্কার-তত্ত্ব। সাধারণ ঈশ্বরাস্তিত্ববোধ দিয়ে যে হিন্দু সভ্যতার পত্তন হয় নি, ঈশ্বরাস্তিত্ববোধের উন্নততম অবস্থায় যে এই সভ্যতার পত্তন হয়েছিল, তার প্রমাণ তার ওঙ্কার, যাকে

তাঁরা জেনেছিলেন সর্ব্বতন্ত্রের সার ও স্বীকৃতি ব'লে, যাকে তাঁরা বুঝেছিলেন সর্ব্বমন্ত্রের সার ও সমাহার ব'লে, যার ভিতরে আছে সর্ব্বমন্ত্রের সৃষ্টি, বিকাশ, প্রাণ ও উপসংহার, যার ভাষাগত অর্থ হাঁ, yes, মঞ্জুর,—এটিই হ'ল বেদমন্ত্র-সমূহ প্রকটিত হওয়ার আদি কারণ। বেদশাস্ত্র যদি হিন্দুধর্ম্ম-মূল হ'য়ে থাকে, তবে ওঙ্কার হচ্ছে সর্ব্ববেদমূল। অর্থাৎ ওঙ্কার হচ্ছে বেদশাস্ত্রের সৃষ্টি, বিকাশ ও প্রসারের আদি ও অকৃত্রিম কারণ। এই একটী মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রে বিরাজ করে এবং সর্ব্বমন্ত্রই এই একটী মন্ত্রে এসে পর্য্যবসিত হয়। এই কথাটুকুর সঙ্গে বৈদিক বিশ্বদেববাদকে একটু মিলিয়ে দেখ ত'। আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে উভয়ের মধ্যে ধারার সাদৃশ্য দেখে। এমন দুইটী আশ্চর্য্য বস্তু করমুষ্টিতে ধ'রে রেখে যারা নীবারকণা সংগ্রহের প্রয়োজনে দেশ থেকে দেশান্তরে যায়, তারা উপনিবেশ স্থাপনের নূতন দেশটিতে নরহত্যা ক'রে ধর্ম্ম প্রচার করে না, তদ্দেশবাসীর প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে নিজের উপলব্ধির রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দেয়। এটাও এক প্রকারের শোণিতপাত কিন্তু এই শোণিত হৃদয়ের, মুণ্ডের নয়, এই শোণিত নিজ হৃদয়ের, অপরের বক্ষোনিঃসৃত নয়।

বিবাহের জন্য যোগ্যতা সঞ্চয়

অপর একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি

বলিলেন,—দু বছর বা চার বছরের মধ্যেই তুমি বিবাহ কর্ব্বে। এখন তোমার সত্যই সাবধান হওয়া উচিত। বিবাহিত জীবন যাতে পরিপূর্ণ রূপে সুখের হ'তে পারে, তার জন্য দৈহিক এবং মানসিক দুই দিক দিয়েই তোমার যোগ্যতা বর্দ্ধন আবশ্যক। তুমি যেমন তোমার ভাবী স্ত্রীর কাছে কতকগুলি বিশেষ সদ্‌গুণ বা বিশেষ যোগ্যতার প্রত্যাশা কর, তোমার ভাবী স্ত্রীও তোমার সম্পর্কে তদ্রূপ কতকগুলি সদ্‌গুণ ও যোগ্যতার প্রত্যাশা কচ্ছে। আজ তোমাদের মধ্যে একজনও অপর জনকে চেন না বা জান না কিন্তু প্রত্যাশার সময়ে কল্পনায় তুমি তোমার বধূর কথা এবং সেই বধূ তার বরের কথা ভেবে ভেবে অজানা সেই চির-জীবন-সঙ্গীর সঙ্গে নানারূপ ক্রিয়া ও ভাবের আদান-প্রদানের কথা রচনা কর্‌ছ বা রচনা কর্‌ছে। এরূপ করাই স্বাভাবিক এবং না-করা অস্বাভাবিক। ভাবা স্বাভাবিক এই জন্য যে, বর বা বধূ এই দুই জনের মধ্যে একজনও জড় পদার্থ নয়, সুখ-দুঃখ-বোধে-সমন্বিত চৈতন্যশক্তির এক একটী আশ্রয়। তাদের বোধশক্তি যেমন আছে, আশা-আকাঙ্ক্ষাও তেমন আছে, নিজ নিজ পরিবেশ অনুযায়ী বল্‌গাহীন নানা কল্পনার ক্ষমতাও তেমন আছে, চারদিকের নানা দম্পতীর জীবন-রহস্য সম্পর্কে যে যতটুকু স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জান্‌তে পেরেছে, তার আলোকে নিজ নিজ জীবনের ভাবী সুখ-দুঃখের আলেখ্য বা আলপনা

আঁকার শখও স্বাভাবিক ভাবেই আছে। কিন্তু বিবাহের পরে যদি একজন দেখতে পায় যে, অপরকে দিয়ে তার কোনো কল্পনা বাস্তবায়িত হবার নয়, কোনো আশা-পূরণ সম্ভব নয়, তখন আশাভঙ্গজনিত দুঃখ তাকে কি ভাবে যে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত কর্ব্বে, এটা সত্যই একটা ভাবনার কথা। তোমার দিক দিয়ে তুমি প্রস্তুত হ'তে থাক, যাতে তোমার স্নেহ, ব্যবহার, সঙ্গ ও সংসংস্কার-সমূহ তোমার ভাবী সঙ্গিনীকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ এবং সার্থকতা দিতে পার, তার জন্যে তোমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হবে বীর্য্যধারণ, শরীরের সার-ধাতুকে সর্ব্বপ্রযত্নে শরীর-মধ্যে পরিরক্ষণ। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, হবে, উপযুক্ত ব্যায়ামাভ্যাসের দ্বারা দেহকে বহুক্লেশসহ এবং কঠোর শ্রমে সমর্থ ক'রে তোলার চেষ্টা। তৃতীয় কর্ত্তব্য হবে, সর্ব্বপ্রকার যোষিৎসঙ্গ থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব এবং সঙ্গত, ততটা দূরে রাখা। তুমি যদি বিবাহের পূর্ব্বেই তোমার প্রেম অন্য নারীতে বিলিয়ে দিতে থাক, তাহ'লে নিশ্চিত জান্‌বে, তুমি তোমার স্ত্রীকে কদাচ সত্যিকার ভালবাসা দিতে পার্ব্বে না। লম্পট প্রেমের অভিনয়ই কত্তে পারে, মুখস্থ করা প্রেমের বুলি কপচাতে পারে, ধার করা সাহিত্যিক বচনামৃত সংগ্রহ ক'রে সুদীর্ঘ প্রণয়পত্র লিখে বিস্ময় সৃষ্টি কত্তে পারে কিন্তু প্রেম দিতে পারে না। তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে যা' যা' চাও, তোমার স্ত্রীকে তা' তা' পূর্ণরূপে দেবার যোগ্যতা

তোমাকে সঞ্চয় কত্তে হবে। আত্মদমনের অক্ষমতাহেতু তুমি নিজেকে অসংযমের দ্বারা অকালে ফতুর ক'রে দেবে অথচ মনে মনে প্রত্যাশা রাখবে যে, দাম্পত্য-জীবন সুখের হবে, এটা অন্যায় দুরাশা হবে। তেরো থেকে বাইশ বছর বয়স পর্য্যন্ত পূর্ণ সংযম, সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে যে যুবক তেইশ বৎসর বয়সে বিবাহ কর্ব্বে, তার পক্ষে সংসারী জীবন দুঃখকর হওয়ার সম্ভবনা খুব কম।

উপদেশ শ্রবণ ও উপদেশ পালন

যুবকটী উপদেশগুলি খুব মনোযোগরে সহিত শ্রবণ করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে তোমার একদা বধূ হবে, তাকে যদি এখন কাছে পেতাম, তাহ'লে তাকেও আমি এই ভাবেই কতকগুলি উপদেশ দিয়ে দিতাম। সেও হয়ত মন দিয়েই আমার বক্তব্যগুলি শুন্‌ত। কিন্তু শুনলেই হ'ল না, উপদেশ পালনও করা চাই। সৎসঙ্গ করলেই হ'ল না, সৎলোকের হিতোপদেশকে নিজ জীবনের কর্ম্মে ও অনুশীলনে বাস্তবতা দেওয়া চাই, অভ্যাসে আনা চাই। ভাল ভাল বই কিনে আলমারীতে তুলে রাখলেই হ'ল না, এগুলি পড়া চাই আর উপদেশ-মূলক বাক্যগুলির যেটুকু যখন যে ভাবে নিজ

জীবনে প্রতিফলিত করা যায়, তারও চেষ্টা অবিরাম ক'রে যেতে হবে।

বিঘ্নবিপদেও নাম কর

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— মনে যখন ভয় আসবে, তখন অভয়স্বরূপ ভগবানের নাম নিয়ত স্মরণ কর। দেহে যখন ক্লান্তি আসবে, তখনো ভগবানের নামকেই পরম আশ্রয় কর। জীবনে মরণে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় নামাশ্রয়ের অভ্যাস ক'রে যাও। বাধা এলে দ'মে যেও না। বরং বাধা অতিক্রম করার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কিছুটা সময় নিতে পার। তারপরে নাম কত্তে কত্তে সহস্র বাধার উত্তুঙ্গ প্রাচীর নির্ভয়ে উল্লঙ্ঘন ক'রে যাও। পথকণ্টকে ভয় ক'রো না। সাবধানে ও সন্তর্পণে পা ফেলে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু গতি রুদ্ধ হতে দিও না। সুদূর তীর্থের যাত্রীরা ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন দেহে পথপ্রান্তে বৃক্ষমূলে তরুচ্ছায়ায় খানিকটা সময় বিশ্রাম করে, কিন্তু ঘরে ফিরে যায় না। ক্লান্তি দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "জয় ভগবান্" ব'লে আবার যাত্রা শুরু করে। মনের ভিতরে বিশ্বাসের অভাব এসে গেলে সব চেয়ে বড় বিপদটী ঘ'টে গেল জান্‌বে। বিশ্বাসকে অটুট রাখবার জন্য নিয়ত নামের সঙ্গ কর। নামের মধ্যেই নামী বিরাজমান। নামের সঙ্গ ক'রে কেউ কখনো অলাভবান্ হয় নি।

বিদেশে পুত্র পাঠানোর বিপত্তি

এক ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রকে বিদ্যার্জ্জনের জন্য বিদেশে পাঠাইতে চাহেন। কিন্তু পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নানা দুশ্চিন্তা করিতেছেন। তদুপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অল্পবয়সী পুত্রকে বিদেশে শিক্ষার্জ্জনের জন্য পাঠানো নিশ্চয়ই পিতামাতার কাছে খুবই একটা করুণ ব্যাপার। দুশ্চিন্তারও। প্রতিষ্ঠানটী যদি ভালো না হয়, প্রতিষ্ঠানের ভিতরে অপরাপর ছাত্রদের যদি শিক্ষা ও রুচি ভদ্রতাসঙ্গত না হয়, শিক্ষকেরা যদি আদর্শ-চরিত্র পুরুষ না হন, যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত, সেই অঞ্চলের স্বাভাবিক পরিস্থিতি যদি শান্তিপূর্ণ না হ'য়ে দুর্য্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন থাকে, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক বা দেশগত উগ্রতায় যদি সে অঞ্চলের আকাশ-বাতাস মথিত থাকে, তাহ'লে তেমন স্থানে ছেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারবেন না এমন কি ধর্ম্মরাজ যম-ঠাকুর পর্য্যন্ত। ছাত্রীদের সম্পর্কে ত' এই কথা আরও বেশী প্রযোজ্য। ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যায় সমাকুল দেশের ভিতরে মানুষের মনে নিরন্তর থাকে ধূমায়িত অসন্তোষ। সেই অসন্তোষ কোন্ সময়ে কোন্ ছলছুতা ধ'রে কোন্ রন্ধ্রপথে যে পেট্রল ঢেলে শহরময় দাবানল সৃষ্টি ক'রে দেবে, একথা দেবতারাও বল্‌তে পার্ব্বেন কিনা সন্দেহস্থল।

প্রবাসে প্রেরিত পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বিপদ আছে ব'লেই নন্দলাল রেলগাড়ীতে চাপবে না, এমন হ'তে পারে না। বিদ্যার্জ্জনের জন্য ছাত্রকে, দিগ্বিজয়ের জন্য সৈনিককে, ধনার্জ্জনের জন্য ব্যবসায়ীকে, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ধর্ম্মব্যাখ্যাতাকে, দুর্গম বন-পাহাড়-প্রান্তর অতিক্রম ক'রে মরুভূমি-মালভূমি, নদ-নদী-সাগর লঙ্ঘন ক'রে উদ্দিষ্ট স্থানে যেতেই হয়। এসব ক্ষেত্রে সাহস ক'রে বিপদের ঝুঁকি নিতেই হয়। কিন্তু ছেলে কিম্বা মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে তা'দিগকে ভাগ্যের হাতে সঁপে না দিয়ে পিতামাতাকে চেষ্টা কত্তে হবে সুদূরে থেকেও নিজ নিজ হৃদয়ের সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে রাখার। "খোকা, আমি তোমার জন্য কাঁদ্‌ছি" লিখে নয় "খোকা, তোমাকে মানুষের মতন মানুষ হ'য়ে দেশে ফিরে আস্‌তে হবে,"—লিখতে হবে। তাকে নিরন্তর জানাতে হবে যে, তার দেশের গৌরব, তাকে নিজ দেশের জন্য জয়মাল্য অর্জ্জন ক'রে আস্‌তে হবে। তাকে এমন হ'য়ে দেশে ফিরতে হবে যেন সহস্র সহস্র নবযুবক তার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দিব্য প্রেরণার অনুভূতি পায়। সংসারের সাময়িক সম্বন্ধকে বেশী ক'রে ফলাও না ক'রে,

জগতের প্রতি, দেশের প্রতি, দেশবাসী লক্ষ কোটী দীন-দরিদ্রের প্রতি, অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অনাথ, নিরাশ্রয় দেশবাসীর প্রতি তার যে কত কর্ত্তব্য, কত দায়িত্ব, এই সব কথা তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আদর্শবাদের মোহন বংশীধ্বনি শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে পার্থিব নীচতার ঊর্দ্ধে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এটা বাবা-মায়েরই কর্ত্তব্য।

পূজার পুষ্পাঞ্জলি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রিয়জনকে সাক্ষাৎ সম্মুখে পেলে অনেক সময়ে আমরা প্রাণের ব্যাকুল প্রেম প্রকাশের জন্য তাঁর গলায় মালা দেই, তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। তাঁর প্রতি অন্তরের ভাবটী যদি হয় আনুগত্যের ও আজ্ঞাবহতার, তাহ'লে কুণ্ঠাহীন মনে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি। ভক্ত বা উপাসকের পক্ষে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দান ব্যাপারটা ঠিক তাই। প্রিয়জন সাক্ষাতে নেই, তবু বায়ুপ্রবাহে আবির উড়িয়ে দিয়ে অনেক সময়ে ভক্তেরা বলেন,—যাও মলয়-পবন, আমার পরম-প্রিয়ের কাছে আমার এই ভক্তিঅর্ঘ্য বহন ক'রে নিয়ে যাও। নদীর কূলে অল্প জলে নেমে ক্ষুদ্র একটী কলার ভেলা সাজিয়ে নিয়ে তাতে পুষ্প, চন্দন, প্রদীপ, ধূপ প্রভৃতি লাগিয়ে দিয়ে প্রবল জল-স্রোতে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে ভক্তেরা

বলেন,—যাও মা গঙ্গা, যাও মা পদ্মা, যাও মা শীতললক্ষা, আমার এই প্রাণের অর্ঘ্য আমার পরমপ্রিয়ের কাছে পৌঁছে দাও। ব্যাপারটা বেশ কৌতুককর ও কবিত্বময়। পূজার পুষ্পাঞ্জলি ঠিক এমনি ব্যাপার। যে যে মতেই উপাসনা করুক, তাঁদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যদি বাধা না দিয়ে থাকেন, তবে সে অবশ্যই ভগবানের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারে।

উপাসনার পুষ্পাঞ্জলির ক্রম এবং মনোভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আমাদের উপাসনা জিনিষটা ঠিক পূজা নয়। পূজায় দেবতাকে কল্পনা বা রচনা করা হয়, তাঁকে নানা অলঙ্কারে সাজানো হয়, তাঁকে হস্তপদবিশিষ্ট মানুষের মতন সর্ব্বভাবে চিন্তা কত্তে হয় এবং তাঁকে ভোগনৈবেদ্য নিবেদন ক'রে বিশ্রাম দিতে হয়, বৈকালী দিতে হয়, শঙ্খঘণ্টা প্রভৃতির ধ্বনি ক'রে বাদ্য-নৃত্য-সহযোগে আরতি কত্তে হয়। অর্থাৎ ভক্তির অনুশীলনের জন্য দেবপূজকেরা অনেক বহিরঙ্গ বিষয়ের অবতারণা করেন, যা' আমাদের পক্ষে আবশ্যক নয়। আমাদের উপাসনায় আমরা অঞ্জলি দেই। সমবেত উপাসনাতে অঞ্জলি দেই সকলে মিলে একসঙ্গে অখণ্ডস্তোত্র পাঠ কত্তে কত্তে জগন্মঙ্গল সঙ্কল্প করারও পরে, নীরবে নামজপ করারও পরে, জপ-সমর্পণ-মন্ত্র ত্বমেব

ধাতা করারও পরে, এমনকি নির্দ্দিষ্ট কয়েক বার হরিওঁ করারও পরে। ব্যক্তিগত একক উপাসনায় অঞ্জলি দিলে তা' আমরা ব্রহ্মগায়ত্রীর পরেই দেই। অখণ্ড-স্তোত্রের তিনটী কলি পাঠ ক'রে ক'রে মোট তিনবার অঞ্জলি অর্পণ করি বিগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর চরণের নীচে। সমবেত উপাসনার অঞ্জলির ক্রম একটু আলাদা। ব্যক্তিগত উপাসনায় ব্রহ্মগায়ত্রী পাঠের পরেই তিনবার অঞ্জলি দেই। সমবেত উপাসনার অঞ্জলি দেই হরিওঁ কীর্ত্তনটী করার ঠিক পরে। ক্রমাগত এই নিয়ম সকলেরই রক্ষা ক'রে চলা উচিত। অঞ্জলিদানকালে তোমার মনোভাব এই হবে যে, তুমি তোমার সমস্ত অহংকে বিসর্জ্জন দিচ্ছ, তুমি আর তোমার থাকৃছ না। তুমি ভগবানেরই হ'য়ে যাচ্ছ। হস্তস্থিত পুষ্প-বিল্বপত্র-তুলসী-চন্দন যেন তোমার সমগ্র অস্তিত্বের প্রতীক। এগুলি তুমি ওঙ্কারবিগ্রহের লক্ষ্যে প্রদান কচ্ছ এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, তোমার জীবন পরমেশ্বরের হাতের যন্ত্র হোক্, তোমার অস্তিত্ব পরমেশ্বরের অভিপ্রায় পূরণের জন্য প্রযুক্ত হোক্। অঞ্জলি-দান একটী পবিত্র অধ্যাত্ম-কর্ম্ম। অনেকে ব'লে থাকেন, প্রাচীন আর্য্যেরা অঞ্জলি দান আদি জানতেন না, দ্রাবিড়দের কাছ থেকে তাঁরা শিখেছেন। দ্রাবিড়রাই পূজা নামক প্রথাকে আবিষ্কার করেন, আর্য্যেরা কত্তেন যাগ-যজ্ঞ-হোম। এসব উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য কি আছে, আমি জানি না। কিন্তু অঞ্জলির মতন এমন সুন্দর একটি আত্ম-নিবেদন-মূলক অনুষ্ঠান যদি অনার্য্য, অদ্রাবিড়,

অনুন্নত কোনও মানবগোষ্ঠীর কাছ থেকেও এসে থাকে, তবু এটা তার নিজস্ব কবিত্ব দ্বারাই মানুষের মনের সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে।

পুষ্পের শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার

একজন বলিলেন,—সম্প্রতি ঢাকাতে কোথা থেকে একজন বক্তা এসে বলে গেছেন যে, পুষ্পাঞ্জলি আদি প্রথা অনার্য্য যুগের বর্ব্বরতা।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—রক্তপান, রক্তপাত, রক্তের নেশা নিশ্চয়ই বর্ব্বরতা কিন্তু সাঁওতাল বা নাগারা ফুল ভালবাসে ব'লেই ফুল দিয়ে অঞ্জলি দান বর্ব্বরতা হতে যাবে কেন? এমন দেশ ত' থাক্‌তে পারে, যেখানে ঘৃত-সেবন বর্ব্বরতা ব'লে ব্যাখ্যাত হ'তে পারে। ঘৃত আর দুগ্ধ জগতের শ্রেষ্ঠ খাদ্য ব'লে আর ঘৃত হবিঃসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে গাভীকে আর্য্যেরা গোমাতায় পরিণত করেছেন। পশুকে মা ব'লে ভাবতে যাওয়া ত' তাহ'লে বর্ব্বরতা। পরমদয়িতের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলিকে যারা বর্ব্বরতা জ্ঞান করে, তারা কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়-সুখের সঙ্গদায়িনীকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন করাকে বর্ব্বরতা জ্ঞান করে না। ফুলের মতন সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে আর কটা আছে? কিন্তু কেউ তাকে ব্যবহার করে প্রণয়িনীর প্রীণনের জন্য, কেউ ব্যবহার করে

ঘর সাজাবার জন্য, কেউ ব্যবহার করে পরমেশ্বরে প্রেমবর্দ্ধনের উপকরণ বা সহায়ক হিসাবে। আমার মতে শেষোক্ত ব্যবহারই ফুলের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার।

মুসলমানদের ভজন-প্রণালীতে পুষ্প নাই কেন

প্রশ্ন হইল,—কৈ, মুসলমানদের মধ্যেও ত' কত ঈশ্বরভক্ত আছেন কিন্তু তাদের বাড়ীতে ফুলের বাগান কেন দেখি না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইসলাম ধর্ম্মের উৎপত্তি যেই দেশে, সেই দেশে মানুষ আগে ফুলের বাগান কর্ব্বে, না খেজুরের মত কষ্টসহ সুমিষ্ট ফলপ্রদ কাঁটা গাছের বাগান কর্ব্বে বল। তারপরে মক্কা অঞ্চলে পৌত্তলিকতা যেই স্তরে ছিল, তাতে হজরত মহম্মদ রোজা-নমাজের মাঝে ফুল আর রবাবের আমদানী ক'রে ভজনের পথ কণ্টকাবৃত কর্ত্তে পারেন কিনা ভেবে দেখো। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় ব'লে জানতে হবে এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে প্রতিবার কলমা উচ্চারণের সঙ্গে স্মরণ কর্ত্তে হবে, অথচ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের কোনো ছবি আঁকা চল্‌বে না, ছবি রাখা চল্‌বে না, ছবি দেখান চল্‌বে না, সেই ধর্ম্মে যদি পূজা আর অঞ্জলির মত পুষ্পবহুল প্রথার প্রশ্রয় আসে, তাহ'লে ভাবী কালে তার পরিণাম কি

হ'তে পারে আর পারে না, নিশ্চয়ই এই বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মনে মনে কিছু ভেবেছিলেন।

আল্লা ও মহম্মদ

প্রশ্ন হইল,—কলমা পড়বার সময়ে আল্লাই ত' মুখ্য, মহম্মদ গৌণ হ'লেও একান্ত ভাবেই স্মরণীয়। এই ভাবে দুজনকে একত্র ভাবতে গিয়ে মহম্মদকে আল্লা আর আল্লাকে মহম্মদ ব'লে ভাবার অভ্যাস এসে যেতে পারে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ আর গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ ব'লে ভাবার রীতি আমাদের দেশে আছে। ফলে কৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গ তাঁদের ভক্তদের কাছে এক হ'য়ে গেলেন। কিন্তু এই রীতিটি মুসলমানদের মধ্যে নাই। তপস্বিনী রাবেয়াকে একজন প্রশ্ন করেছিল যে, হজরৎ মহম্মদকে আপনার মনে থাকে ত'? তিনি ভাবাবেগে উচ্ছল হ'য়ে ব'লে উঠলেন,—আল্লার প্রেমে আমার মন মাতোয়ারা হ'য়ে গেলে, কি দুর্ভাগ্য আমার যে, আমি মহম্মদকে পর্য্যন্ত ভুলে যাই। এই কাহিনীর মধ্যেই একটী চমৎকার তথ্য আছে যে, মুসলমানরা হজরৎ মহম্মদের আদেশ পালনের জন্য প্রাণ দিতে সমর্থ হ'লেও তাঁকে আল্লার সঙ্গে অভিন্ন বা এক ব'লে কখনো বর্ণনা কর্ব্বেন না। তাঁদের হিসাবে তাঁরা ঠিক পথেই

চলেছেন। ও নিয়ে আমাদের সমালোচনার কোনো প্রয়োজন নেই।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইহুদীদের পক্ষেও ঈশ্বরকে মানুষ ব'লে বা মানুষকে ঈশ্বর ব'লে কল্পনা করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবাল্য নিরাকার পরমেশ্বর সম্পর্কে শিক্ষা, উপদেশ ও পরিবেশ পেয়ে পেয়ে তাঁদের পক্ষে নিরাকার পরমেশ্বরকে ভজনা করার এক জন্মজাত অভ্যাস এসে গেছে ব'লেই তাঁদের পক্ষে নিরাকার উপাসনা অত সহজ। তোমরা আবাল্য ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষের মত কল্পনা ক'রে ক'রে এমন পর্য্যায়ে এসে পড়েছ যে, তোমাদের পক্ষে নিরাকার উপাসনার মতন কঠিন কাজ আর কিছু নাই। খুব সম্ভবতঃ এই জন্যই বুদ্ধদেব ঈশ্বর-সাধন সম্পর্কে কোন উপদেশ না দিয়ে কেবল শীল, সদাচার, সংযম, প্রত্যাহার, মৈত্রীভাবনা প্রভৃতির উপদেশ দিয়ে মানুষকে সৎ-পথাশ্রিত করার চেষ্টা ক'রে থাক্‌বেন। পৃথিবীর সব দেশের সব রকমের আবহাওয়া যেমন এই ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে আছে, তেমন আবার পৃথিবীর সব দেশের সব রকমের চিন্তা-ধারা এসে অনাদি যুগ থেকে এই দেশটাতে মিশেছে। এদেশে সব পন্থাই প্রশস্য।

ঢাকা
১১ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪২
(২৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

নিষ্কলঙ্ক নিষ্কাম সাধক

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রতিটি সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তোমার জীবনে আসুক নবীন উন্মাদনা, আসুক নব নব উপলব্ধির অত্যাশ্চর্য্য শোভাযাত্রা। সমগ্র বিশ্বকে আপন করিয়া লইবার জন্য জাগুক অদম্য আগ্রহ ও চেতনা। তোমার একার চরিতার্থতার জন্যই তোমার জীবন নহে, বিশ্বের সকল চূড়ান্ত সার্থকতার ভিতরে তোমার মানবতনু ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্যটী সার্থক হউক। প্রতিটি নূতন দিন, তোমার জীবনেতিহাসের একটি নূতন পৃষ্ঠা। স্বার্থপরতায় আর সঙ্কীর্ণতায় যেন এই পৃষ্ঠাটি কলঙ্কিত না হয়। নিষ্কলঙ্ক নিষ্কাম সাধক জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

সাত্ত্বিক দান

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি কোন স্থান হইতে দান-স্বরূপে অর্থ পাইবার জন্য লালায়িত নহি। আমি চাহি না যে তোমরাও কেহ আমার

কাজের জন্য দান সংগ্রহে চেষ্টা কর। জগতের অধিকাংশ লোকই অতীব জঘন্য অসাত্ত্বিক জীবন যাপন করিতেছে। তাই তাহাদের সৎকার্য্যে দানের ইচ্ছা অতীব সীমিত। আর, কোনও প্রকার বিপদে আপদে পড়িলেই তাহারা সঙ্কটত্রাণের উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকে, সেই দান দেবতাকেই হউক বা সাধু-সন্ত-মহাত্মাকেই হউক। স্বেচ্ছায় যে দান এবং সদুপায়ের অর্জ্জিত অর্থের দ্বারা যে দান, তাহাই প্রকৃত দান। এমন নিষ্কলঙ্ক দান ত' বাবা আপনা আপনিই আসিবে। তাহা সংগ্রহের জন্য তোমাদিগকে আবার চেষ্টা করিতে হইবে কেন? অবশ্য, বলিতে পার যে, সাত্ত্বিক দাতাদের অনেক সময়ে দিবার ইচ্ছা থাকে কিন্তু খেয়াল থাকে না। তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে বাধা কি? এই বিষয়ে আমাকে নিরুত্তর থাকিতে হইবে। এই মৌনতার অর্থ সম্মতি নহে, অসম্মতিও নহে। কেহ কিছু আমার কাছে পাইল না অথচ আমার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করিয়া দান করিল, এই দানে বিভ্রাট আছে। আমি দান গ্রহণ করিয়া যদি কাহারও আশার পূরণ না করিতে পারি, তবে ত' ঋণী হইয়া গেলাম। এই সব চিন্তা আমাকে বড়ই বিব্রত করে বলিয়া আমি দান পাইবার আশা না করিয়াই কাজ করিয়া যাইতেছি। দাতার দানের প্রতি উদাসীন থাকিয়াই আমাকে কাজ করিতে হইবে। কাজ

দেখিয়া দান এদেশে খুব কম লোকই করে। অনুরোধে আর উপরোধে পড়িয়াই ত' অধিকাংশ লোকে যাহা কিছু সৎকার্য্যের জন্য দিবার, দেয়। এসব দানকে সাত্ত্বিক বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। সন্তানকে দেখিলে স্নেহবশে মায়ের যেমন স্তন হইতে অবিরল ধারে দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে, আমাকে দেখিলে ঠিক তেমনি যাহার হৃদয় কাঁদিয়া ওঠে এবং নিজের অজ্ঞাতসারে যাহার হস্ত ধন-ভাণ্ডারে গিয়া পড়ে এবং মুঠি ভরিয়া যাহা পায়, তাহা না দেওয়া পর্য্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে, আমি একমাত্র এমন দানকেই সাত্ত্বিক দান বলিয়া অভিহিত করিব।"

গুরুতে তীব্র অবিশ্বাস আসিলে

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজের গুরুকে যদি সাধারণ স্তরের মানুষের চেয়ে উর্দ্ধতর স্তরের বলিয়া কেহ মনে করে, তবে তাহার মনে এই দৃঢ়মূল বিশ্বাসটুকু থাকা প্রয়োজন যে, গুরু কখনো শিষ্যের অমঙ্গল করিতে পারেন না। গুরু যখন সাধারণ স্তরের আসক্তিলিপ্ত মানুষ, তখন তাঁহার পক্ষে স্বার্থহানি ঘটিলে শিষ্যের প্রতি বিরূপ হইয়া তাঁহার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু একদিকে মনে করিবে যে, তোমার গুরু একজন প্রকৃত উন্নত মানব এবং মানুষের হিতসাধনের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব, আর অন্য দিকে মনে মনে সন্দেহ করিতে থাকিবে যে তোমার নানাবিধ রোগ, তোমার সাংসারিক অশান্তি, তোমার ব্যবসায়িক ক্ষতি সবই গুরুদেব, রোষবশে করাইলেন, ইহা মারাত্মক। যেই গুরুদেবকে তুমি তোমার হিতকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার না, সেই গুরুদেবের শিষ্যরূপী লেজুড় হইয়া তার পিছে পিছে বৎসরের পর বৎসর ঘুরিতেছ কেন? লোকপ্রবাদ আছে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রুষ্ট হইলেও রক্ষা আছে কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে রক্ষা নাই,—এই ভয়ে? ভয় পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর সম্পর্কে পুরাণে বা লোকমুখে বা কাব্যসমূহে যে বিবরণ দেখা যায়, তাহাতে অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষের মতই দুর্ব্বোধ্য ও দোষত্রুটিযুক্ত আচরণে রত বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু যিনি সত্যিকারের গুরু, তাঁহার আচরণ ইহার উর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়াই গুরুকে এত মান্য করা হইয়াছে। যাঁহার কল্যাণময়ত্বে বিশ্বাস করিতে পার না, তাঁহার পদতলে দিবারাত্র মাথা কুটিয়া মরার চেয়ে তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া পড়া ভাল। ভারতে গুরুর অভাব কোথায়? কেন বৃথা ভদ্রলোককে গুরু করিয়া মিছা মিছা অভিমানে দগ্ধ হইতেছ যে, তোমার পুত্রের চাকুরী তিনিই খতম করিলেন, তোমার পত্নীর উন্মাদরোগ তাঁহারই দ্বারা সৃষ্ট, তোমার

পায়ের খঞ্জতা ও চোখের দৃষ্টিহীনতা তাঁহারই অভিশাপের ফল? গুরুরও যিনি গুরু, তাঁরও যিনি গুরু, তাঁরও আবার যিনি গুরু, সেই পরমেশ্বরকে খুঁজিয়া বাহির কর এবং একমাত্র তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া উদ্বেগমুক্ত হও। ভদ্রলোককে দোষ দিবে, অপরাধী জ্ঞান করিবে, নিন্দা করিবে, বিদ্বেষ করিবে, অপমান-অসম্মান সবই করিবে, অথচ ঐ চরণেই লাগিয়া থাকিবে, এমন স্বতো বিরোধ ক্ষমার যোগ্য নহে।"

জনসেবা ও স্বার্থসিদ্ধি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জনসেবাও করিব, স্বকীয় সাংসারিক যাবতীয় কর্ত্তব্যও পালন করিয়া যাইব, দুইটীর মধ্যে একটুখানি বিরোধ আছে। জনসেবা নিঃস্বার্থ ভাবে করিতে হইলে নিজের কিছু কিছু স্বার্থহানি ঘটিবেই। নিজের সাংসারিক স্বার্থ পূরাপূরি বজায় রাখিতে হইলে জনসেবার কতকাংশে কিছুটা শিথিলতা করিতে হইবেই। যাহাতে এই আপাত-বিরোধের একটা সুচিন্তিত মীমাংসা ঘটিতে পারে, তাহার জন্যই কোনও কোনও ধীমান্ পুরুষকে দেখিয়াছি যে, সপ্তাহের মধ্যে একটী দিন তিনি আহার নিদ্রা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারের ব্যক্তি-স্বার্থের চর্চ্চা একেবারেই করেন না, এবং সপ্তাহের বাকী ছয়টী দিন

নিজের সাংসারিক কর্ত্তব্য-সমূহ সম্পাদনের জন্য একনিষ্ঠ প্রযত্নে গভীর অভিনিবেশ সহকারে কাজ করেন। আমাদের মতন সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে এইটি একটি চমৎকার দিগ্‌দর্শন। স্বার্থের সহিত জনসেবাকে এবং জনসেবার সহিত স্বার্থকে জড়াইয়া ফেলিব না, ইহা অতীব যুক্তিযুক্ত পন্থা। জনসেবার নাম করিয়া সুকৌশলে স্বার্থসিদ্ধি করিব,—ইহা নিতান্ত দোষাবহ কিন্তু স্বার্থসিদ্ধি উপলক্ষ্যেই যতটুকু পারিলাম জনসেবাও করিলাম,—ইহা প্রশংসনীয়।"

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবীণ ও নবীন

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে-কোনও স্থানে যাঁহারা সৎকর্ম্মের প্রথম সূচনা করেন, কাজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রচুর কর্ম্মীর সমাগম ঘটে, তখন সেই আদি কালের প্রবীণ কর্ম্মীরা কোনঠাসা হইয়া পড়েন। নূতনেরা ভাবে,—ওঁরা কিছুই জানিত না, বুঝিত না, আমরা শিক্ষিত ও জ্ঞানীর দল আসিয়াই না শুভকর্ম্মকে এমন দারুণ ভাবে বিশ্বতোমুখ করিয়াছি। তরুণদের পক্ষে এইরূপ ভ্রান্ত এক মনোভাব স্বাভাবিক, কারণ তাহারা নূতন ও অনভিজ্ঞ। কিন্তু তাহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, প্রবীণ কর্ম্মীদিগকে যোগ্য সম্মান দিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদিগকে এবং নিজেদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁহাদিগকে

যুক্ত করিয়া চলিতে থাকা। যে কর্ম্ম সর্ব্ব-জন-শুভকর, সেই কর্ম্মে সর্ব্বজনকেই আসিতে দিতে হইবে এবং যাহার কাছ হইতে যতটুকু সহযোগ মিলিতে পারে, তাহা নিয়া নিতে হইবে। ইহাতে কার্পণ্য বা অবহেলা কর্ম্মনাশকর।"

গুরুভাইদের মধ্যে অনৈক্য

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পদে পদে যদি তোমরা গুরুভাইরা নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের চর্চ্চা কর, তাহা হইলে গুরুভাই গুরুবোন ব্যতীত অন্য লোকের সঙ্গে মিলিয়া তোমরা যখন জনকল্যাণের কাজে হাত দিবে, তখন ত' মানুষের সঙ্গে তোমাদের অনৈক্য দিন দিন কেবল বাড়িতেই থাকিবে। বিশ্বের সকল মতের সকল পথের লোকের সঙ্গে ঐক্য যাহাতে বজায় রাখিয়া জগতের মঙ্গলকর্ম্ম-সমূহ করিতে পার, তাহার জন্যই ত' তোমাদের গুরুভাইবোন্‌দের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে প্রগাঢ় ঐক্য স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। কেহ কোন একটা প্রস্তাব দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা নিয়া তুমুল তর্ক তোলার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই, বরং তাহাতে কাজ পণ্ডই হয়। কাজ নিয়া কোনও প্রস্তাব আসিলে তাহা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হইলে, একবাক্যে তাহা সকলের মানিয়া নেওয়া উচিত এবং কাজে লাগিয়া

পড়া উচিত। প্রস্তাবে ত্রুটি থাকিলে ভদ্রভাবে আলোচনা দ্বারা তাহা ত্রুটিমুক্ত করিয়া গ্রহণ করা চলিতে পারে। প্রস্তাব অবাস্তব এবং সংশোধনের সম্ভাবনাহীন ত্রুটীর আধার হইলে একবাক্যে পরিত্যাগ করা যাইতে পার। ভদ্রতাজ্ঞান, শিষ্ট, ব্যবহার, পরস্পরের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে কোনও ব্যাপারই সাধ্যের বাহিরে চলিয়া যাইবে না। অনেক কিছু জনকল্যাণ করিবার আগে তোমরা নিজেদের গুরুভাই-ভগিনীদের প্রতি ভদ্র, শিষ্ট, সম্ভ্রমপূর্ণ হইতে শিক্ষা কর। তাহা হইলেই বাহিরের লোকদের তোমরা সহ্য করিতে পারিবে।"

সাধনশীল শিষ্যই গুরুর বিজয়-কেতন

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার গুরু তোমার ভিতরে বসিয়া তোমার সঙ্গে নিয়ত কথা কহিতেছেন। কহিতেছেন অমৃত-বাণী, কহিতেছেন তোমার, আমার, জগদ্বাসী সকলের কুশলের বাণী। সেই বাণী শুনিতে হইলে তোমাকেও অমৃত-মধুর হইতে হইবে। অর্থাৎ তোমাকে গুরুদত্ত অমৃতময় নাম জপিতে হইবে। জপ করিবে অবিরাম অবিশ্রাম, নিদ্রায় জাগরণে, কর্ম্মে বিশ্রামে,

অনুক্ষণ। গুরুর বাণী শুনিতে হইলে ইহা করিতে হয়। মুখে মুখে কেবল বড় বড় কথা বলিয়া কোনও লাভ নাই। গুরুদত্ত নামটী নিষ্ঠার সহিত জপিয়া যাইতে হয়। সুধার্ম্মিক গুরুদেবেরা কত কত জনকে শিক্ষাদান করিয়া যাইতেছেন কিন্তু তাঁহাদের অন্তরের প্রকৃত অভীপ্সা পূরণ করিতেছে কয় জনে? তোমার মনে যখন জাগিয়াছে যে, দীক্ষার সম্মান রাখিতেই হইবে, সাধন করিতেই হইবে, গুরূপদেশে অবহেলা কিছুতেই করা হইবে না, তখন জানিতেছি, তোমার গুরুদেবের সহস্র শিষ্য যদি তাঁহার আদেশ, নির্দ্দেশ ও উপদেশের অমর্য্যাদা করিয়া থাকে, তবু তিনি তোমাকে পাইয়াই ধন্য হইয়াছেন। তোমাকে দেখিলেই তোমার গুরুর জয়ধ্বনি সকলের মুখ হইতে নির্গত হইবে। বিজ্ঞাপন দিয়া গুরুকে প্রচার করিতে হয় না। প্রকৃত সাধনশীল, নিষ্ঠাবান, ক্রিয়াবান, শিষ্যই গুরুর বিজয়কেতন।"

গেরুয়া ধারণ

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বেশ-পরিবর্ত্তনে মনের ভাবেও পরিবর্ত্তন আসে, একথা সত্য। সৈনিকের ইউনিফর্ম্ম পরিলে মনে রাজসিক ভাবের সঞ্চার হয়। নিজের পুরুষোচিত ভাবের অবসানের জন্য কতক কতক সাধককে দেখা যায়, স্ত্রীলোকের ন্যায় লম্বা চুল

রাখিতে, সিঁথিতে সিন্দুর দিতে, হাতে শাঁখা ও বালা পরিতে, কাণে মাকড়ী বা দুল দিতে, নাকে নোলক লাগাইতে। গৈরিক বসনও তেমনই মনে সাত্ত্বিক ভাবের উন্মেষ ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু গৈরিকের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি ত্যাগী, আমি যতি, আমি ব্রতী, আমি সন্ন্যাসী' এই ভাবের অভিমানও আসে, যাহা অপরকে নিজের চেয়ে হেয় বলিয়া ভাবিতে প্ররোচনা দেয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বিপজ্জনক ব্যাপার হইতেছে এই যে, গৈরিকের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তি আসিয়া তোমার চরিত্রের মধ্যে বাসা বাঁধিবে, যাহা বর্ত্তমান যুগের আর্থিক সঙ্কটের সমাধানের সাহায্য না করিয়া গুরুতর এক বিঘ্নের সৃষ্টি করিবে। তুমি সদুদ্দেশ্যে গেরুয়া পরিয়াছ দেখিয়াও অপরে অসদুদ্দেশ্যে এই গেরুয়ার অপব্যবহার করিবে। সুতরাং গেরুয়া নিতে ভাবিয়া চিন্তিয়া নিবে।"

কদাচ ঐক্যভ্রষ্ট হইও না

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুষ্ট লোকের অসৎবুদ্ধি যতই কুটিল-পথে চলুক না কেন, তোমরা কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ঐক্যভ্রষ্ট হইও না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে অবিচল ঐক্যের পরিচয় দিতে দিতে তোমরা অতীব বৃহৎ, অতীব মহৎ, লোকবিস্ময়কর বিরাট অনুষ্ঠানগুলিকেও ঐক্য-বলেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সমাধা

করিতে পারিবে। ঠুনকো কাচের চুড়ীর মতন একটুকুতেই যে তোমাদের ঐক্য শতধা বিচ্ছিন্ন হয়, ইহার মত অপরাধ ও অসাফল্য আর কিছু হইতে পারে না। সবাই প্রতিজ্ঞা কর যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জেদকে কদাচ মুখ্য হইতে দিব না, সকলে মিলিত হইয়া কাজ সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব, কোনও সহযোগীকে অসম্মান করিব না, কাহারও আত্মসম্মানে আঘাত করিব না এবং কাজকে দ্রুত বাস্তবায়িত করিবার পথে যাহা-কিছু বাধা, তাহাকে অবিলম্বে অপসারিত করিব। ঐক্যহীন জাতি ভক্ষ্যহীন গাভীর ন্যায় বন্ধ্যা, ঐক্যহীন সমাজ শাখাপ্রশাখাহীন বৃক্ষের ন্যায় নিষ্ফল, ঐক্যহীন সঙ্ঘ নিঃশেষিত তুবড়ী-বাজীর ন্যায় একটী ভস্মের স্তূপ মাত্র।"

বিশ্বাসের বলে বিঘ্নজয় কর

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারের দুরন্ত অভাব, গৃহে দারুণ অশান্তি, স্বাস্থ্যে গুরুতর বিপর্য্যয়, জীবিকার ক্ষেত্রে সহস্র অবিচার এবং বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার লইয়া অসম প্রতিযোগিতা তোমাকে অতিষ্ঠ করিয়াছে। মনে হইতেছে, তোমার জীবনের পূর্ণ কুম্ভ শূন্য হইয়া গেল, তোমার জীবনের রসাল তরু বজ্রদহনে জ্বলিয়া গেল, তোমার প্রাণময়ী প্রীতির পসরা হলাহলে ভরিয়া গেল। কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াও, এত অসম্ভাবিত

দুর্য্যোগের সহস্র ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়াও তুমি লক্ষকোটি ক্ষিপ্ত তরঙ্গের আঘাতকে তুচ্ছ করিয়া বিপদ-সাগরের নিরাপদ তীরে উত্তীর্ণ হইবেই হইবে। সর্ব্বস্ব তোমার যাউক কিন্তু বিশ্বাস যেন না টলে। যাহা করিবে, বিশ্বাসের বলেই করিতে পারিবে। বিশ্বাস হারাইলে ত' সবই হারাইলে। বিশ্বাসহীনের জগতে কোনও সম্বল নাই। কামান-বন্দুকের প্রয়োজন নাই, বিশ্বাসই তোমার হাতিয়ার হউক। ধন-রত্নের আবশ্যকতা নাই, বিশ্বাসই তোমার সম্বল হউক। অন্য হিতৈষী বান্ধবেরা তোমার যাহাই করুক আর না করুক, বিশ্বাসই তোমার সহায় হউক, বান্ধব হউক, নির্ভরের হিমাচল হউক।"

পুপুন্‌কী আশ্রমে কি কত্তে চাই

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—পুপুন্‌কীতে যে আশ্রম আপনি করেছেন, তাতে কি কত্তে চান?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—পুপুন্‌কীতে আমি নিজে কিছুই কত্তে চাই না। কিন্তু সেখানে ও অন্যান্য স্থানে নানা সময়ে যে সকল আশ্রম করেছি আর ছেড়েছি, প্রত্যেকটী স্থানই নিজ পরিস্থিতি দিয়ে আমাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ভারত বড়ই দরিদ্র দেশ, অসহায় মানুষেরা পরাধীনতায় দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে কেবল যতটা পেরেছে পরানুকরণ করেছে, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে নি। ফলে সমগ্র জাতির

ভিতরে এসেছে আলস্যতন্দ্রিত এক ভীষণ জড়তা, যার মূলদেশ উৎখাত কত্তে হ'লে চাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা। কিন্তু কে তা' দেবে? প্রাচীন ঋষিরা? তাঁরা আজ নেই। প্রাচীন কেবল স্মৃতিতেই বিরাজিত তার মহিমা নিয়ে, বাস্তবে তার রূপায়ণ কঠিন ব্যাপার। গুরুকুলে গুরুদেব শিষ্যদের অন্ন নিজে দিতেন, শিষ্যরা নিজেদের অন্ন নিজেরা গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে অর্জ্জন ক'রে নিত, এক শিষ্য অপর অনুন্নত শিষ্যকে বিদ্যাদান ক'রে গুরুর শ্রমলাঘব কত্ত। হয়ত রাজারা বা ভূস্বামীরা বা শ্রেষ্ঠীরা গুরুকুলকে নানা ভাবে সাহায্য কত্তেন কিন্তু তার বিবরণ কোথাও পেয়েছি ব'লে স্মরণ পড়ে না। বিপুল-সংখ্যক ধেনুরাশি ছিল গুরুদেবের একমাত্র ধন, তাই দিয়েই দুগ্ধ-ঘৃতাদির সংস্থান হত। মৃত্তিকার বুকে হলচালনা ক'রে সংস্থান হ'ত অন্নের। সংসার ভুলে, হাট-বাজারের কোলাহল থেকে দূরে থেকে, নিভৃত নীরবতার শান্ত পরিবেশের মধ্যে স্নিগ্ধ মনে শিষ্যরা বিদ্যার্জ্জন কত্ত। সেই দৃশ্যটা আধুনিক যুগের উপযোগী ভাবে পুনরাবর্ত্তন প্রার্থনা কচ্ছে, এই কথাটা প্রত্যেক স্থানের পরিস্থিতি আমাকে বারংবার বুঝিয়ে দিয়েছে। তাই আমি নিজে আলাদা ক'রে কোনও পরিকল্পনা করিনি। ঘটনাবলি আমাকে যে দিকে যেতে ইঙ্গিত করেছে, বিপদ বুঝেও, অসুবিধা জেনেও, আমি সেই পথে নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছি। যদি সম্ভব হ'ত, তবে

নিজে অর্জ্জন ক'রে সেই ছাত্রদের আমি অন্ন দিতাম, যারা জীবনকে উৎসর্গ কর্ব্বে জগতের কাজে। কাজ ক'রে যাচ্ছি নিষ্কাম নির্ভর নিয়ে, দেখি, শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল গিয়ে কোথায় দাঁড়ায়। ভিক্ষা ক'রে অর্থ সংগ্রহ কত্তে আমার রুচি নেই, কারণ পরাধীন জাতির স্বাধীনতা ভিক্ষার দ্বারা আসে না, আসে না কারো অনুগ্রহের দ্বারা। আর যদি তা' ভিক্ষা বা অনুগ্রহের ফলে আসে, তাহ'লে তার জন্য কল্পনাতীত ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়। আমার কর্ম্মপন্থা বা আন্দোলন রাজনৈতিক নয়, কিন্তু আমার কর্ম্মপন্থা বা আন্দোলন দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকেও প্রভাবিত কত্তে বাধ্য। কারণ, আমি কোনও সাময়িক প্রতীকারের পক্ষপাতী নই, আমি চাই আমূল প্রতীকার, অধঃপতনের সমূল উৎপাটন।

গুরুও ঈশ্বরের এক বিভূতি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতে যা' কিছু দেখতে পাচ্ছ, সবই পরমেশ্বরের বিভূতি এবং তাঁরই রূপ, তাঁরই গুণ, তাঁরই অংশ, তাঁরই বিভূতি। এই ঢংয়ের চিন্তাটি আমাদের ভারতীয় ধ্যান-ধারণার একটা বিশেষত্ব। এই কারণেই কেউ সিংহ-রূপে বা সিংহবাহিনী-রূপে, কেহ মূষিক-রূপে বা মূষিক-বাহনরূপে, কেউ পেচকরূপে বা পেচক-বাহিনীরূপে, কেউ হংস-রূপে

বা হংস-বাহিনীরূপে, কেউ ময়ূর-রূপে বা ময়ূর-বাহন-রূপে ঈশ্বরীয় ভাব অর্পণ করলে আমরা তাতে দোষ দেখতে পাই না। এই কারণেই মানুষ-বিশেষের উপরে ঈশ্বরীয় ভাব আরোপ করা আমাদের একটা অভ্যাসে রপ্ত হ'য়ে গেছে। যত মানুষকে চোখে দেখছ, তার মধ্যে তোমার গুরুর স্থান নিশ্চয়ই সকলের উপরে। অতএব গুরুকে পরমেশ্বরের সঙ্গে অভেদ ব'লে ভাবতে আর বাধা বা সঙ্কোচ কোথায়? এই অভ্যাসটার ভাল কি আর মন্দ কি, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি বলতে চাই যে, এটা তোমাদের একটা চিরাভ্যস্ত রীতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বেশত' গুরুকে যদি ঈশ্বর ব'লেই জ্ঞান কর, তা' হ'লে এই গুরু সকল মানুষের ভিতরে আছেন, সকল প্রাণীর ভিতরে আছেন, সকল বস্তুর ভিতরে আছেন, এই কথাটা কেন ভাববে না? যে কৃষ্ণকে ঈশ্বর ভাবে, সে কৃষ্ণময় জগৎ দেখে, যে গুরুকে ঈশ্বর ভাবে, সেও গুরুময় জগৎ দেখবে। তবে ত' কোনও স্থানে ঈশ্বর-ভাব অর্পণের শুভফলটী প্রত্যক্ষ হবে। গুরুর ভিতরে ঈশ্বরত্ব আছে, একথাও যেমন সত্য, তোমার ভিতরেও ঈশ্বরত্ব আছে একথাও তেমন সত্য। নিজেকে কেন সর্ব্ববিশ্বে ব্যাপিত ব'লে দেখবে না, জান্‌বে না, অনুভব কর্ব্বে না? এই ভাব এলেই গুরু আর শিষ্য এক হ'য়ে যায়।

প্রচারণা, আত্মশুদ্ধি, আত্মশ্রদ্ধা

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমবয়স্ক বা অনুবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সদ্‌ভাব প্রচার একটা মহাব্রত জানবে। জগতে যত বড় বড় কাজ পর্য্যন্ত অসংখ্য লোককে নিয়ে ঘটেছে, প্রত্যেকের পশ্চাতে একটী চমৎকার ইতিহাস আছে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে অনুরূপ ভাব-প্রচারের প্রয়াসের। কখনো কখনো এ প্রয়াস কোনও পদ্ধতিবদ্ধ সংঘবদ্ধ সুপরিকল্পনার ফল, কখনো কখনো ঘটনার চাপে এ প্রয়াস আপনা আপনি শত সহস্র প্রচারকের ভিতরে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রচারকরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হোক আর নাই হোক, একই ভাবের প্রচারণা চারিদিক থেকে ধারাবাহিক ভাবে ঘটতে থাকলে একদা তাদের সম্মিলিত ফল এসে একটা অপ্রত্যাশিত বিরাট ঘটনা সৃষ্টি করেই করে। অতএব দেশ বা জগতের কোনও আত্যন্তিক হিতসাধন যদি তোমার লক্ষ্যভূত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে যাকে কাছে পাও, তারই কাণে নবজীবনের, নবজাগরণের বার্ত্তা অতি দ্রুত পৌছাবার জন্য চেষ্টা তোমাকে কর্ত্তেই হবে। আর, যারা দূরে আছে, তাদের কাছে এই বার্ত্তা পৌছুবার জন্য পরোক্ষ প্রয়াস পেতে হবে। যাঁরা তোমার চেয়ে জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যায়, বিত্তে বা বয়সে বড়, তাঁদের কাছে কথা পৌছান একটু কঠিন, কারণ একাজটী কর্ত্তে হ'লে শ্রোতার

শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেয়েও বেশী প্রয়োজন বিনয়ের আর যুক্তিনিষ্ঠাতার চেয়েও বেশী প্রয়োজন ব্যক্তিগত বিশ্বাস আকর্ষণের সামর্থ্য, স্নেহ আদায়ের শক্তি। কিন্তু সমবয়স্কদের কাছে প্রচারক নিজ যুক্তিনিষ্ঠতা দিয়ে এবং অনুবয়স্কদের কাছে নিজ শ্রদ্ধেয়তা দিয়ে সহজে উদ্দেশ্য সফল কত্তে পারে। যে কোনো অবস্থায়ই হউক, চরিত্রবলে তোমাকে বলীয়ান হ'তেই হবে। চরিত্রহীনের, মিথ্যাভাষীর, চালবাজের, ধাপ্পাবাজের, অতিরিক্ত-প্রলাপীর এবং অপভাষীর মুখের কথা কেউ বিশ্বাস করে না, ব্যক্তিত্বহীন চপলচরিত্র মানুষের হাজার বক্তৃতায়ও কারো প্রাণে ভাবের জোয়ার আসে না। অতএব, কোনও মহাভাব প্রচারই যদি তোমার উদ্দেশ্য হ'য়ে থাকে, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা কর নিজের কাছে নিজের মূল্যবৃদ্ধি ক'রে নিতে। তুমি যদি নিজের কাছে খাঁটি থাক্‌তে পার, তুমি যদি আত্মপ্রবঞ্চক না হও, তুমি যদি গোপনে পাপানুষ্ঠান ক'রে বাহিরে পবিত্রতার প্রচারক না হও, তুমি যদি ভিতরে ভিতরে স্বার্থের দাস থেকে বাহিরে পরার্থপরতার অভিনয় না কর, তুমি যদি নিজেকে কামচর্চ্চা ও কলুষিত অভ্যাসের কিঙ্কর ক'রে রেখে বাহিরে সাধুগিরি না ফুটাও, তাহ'লে নিজেকে তুমি নিজে যে শ্রদ্ধাটুকু দিতে পারবে, তারই প্রভাবে তুমি জগতের অন্য সকল মানুষকে তোমার বার্ত্তায় আস্থাশীল কত্তে পারবে।

সুতরাং প্রচারণাই বড় কথা নয়, আত্মশুদ্ধি ও আত্মশ্রদ্ধাও থাকা চাই তার সঙ্গে।

কবিতা রচনা সম্পর্কে

অপর একজনে কবিতা লেখার বিষয়ে কিছু উপদেশ চাহিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি কবি নই। নিতান্তই আমি গদ্যময় মানুষ। তবু বল পাখীর গান কে না ভালবাসে? বাঁশীর রবে কে না মুগ্ধ হয়? আকাশের ইন্দ্র-ধনুর সপ্তবর্ণ-বিরঞ্জিত সুন্দর দৃশ্যটুকু দেখে কার না মনে আনন্দ জাগে? নদীর জলে স্রোত আর তরঙ্গ দেখে কে না উল্লসিত হয়? গান কে না গায় আর কার না গাইতে ইচ্ছা করে? এই হিসাবে মানুষ-মাত্রেই কবি। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে সুপ্ত এক কবি তন্দ্রাবিজড়িত নয়নে কখনো কখনো জগতের প্রতি তাকিয়ে শিশুর হাসি দেখে মনে মনে নৃত্য করে, অনাথের ক্রন্দন শুনে রুদ্ধশ্বাসে কাঁদে, বসন্তের প্রাণ-শিহরণ দৃশ্য দেখে বিহ্বল হ'য়ে হাততালি দেয়, শীতের প্রখর তুষার-পাতে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে—এটা প্রত্যেকের পক্ষেই স্বাভাবিক। সুতরাং তুমি কখনো কখনো কবিতা লিখ্‌তে বসবে, এটাতে আশ্চর্য্য হবার বিষয় কি আছে? বাল্যকালে লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখ্‌তুম, তার জন্য কত জনের কত মারও খেতুম, শুধু একবার পিতৃদেবের কবিতার

উপরে নিজের হাত চালাতে গিয়ে মার খাব ব'লে ভীত হ'য়েও শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশাতীত স্নেহ ও ভালবাসা পেলাম পুরস্কার। তোমাদেরও কবিতা লিখে পুরস্কার তিরস্কার দুইই মিলতে পারে। পুরস্কার নেবার জন্য যেমন ঝোলা বাঁধবে, তিরস্কার নেবার জন্য তেমন পিঠে কুলো বাঁধতে হবে। যা-কিছু একটা লিখেই কবি গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ো না। যাতে ভাল কথাই লিখ্‌তে পার, তার জন্য যে সাধনা দরকার তাও ক'রো। যা-কিছু লিখ্‌বে ছাপাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হ'য়ো না। খাতায় লিখে দুচার বছর তাকে ঘুমুতে দাও, পরে সময়মত প্রয়োজনীয় সংশোধন ক'রে তাকে প্রকাশের চেষ্টা কর। একটা কথা মনে রেখ যে, দেশটা কবির হলেও বা জাতিটা কবিতাপ্রিয় হ'লেও কবিতা কিন্তু খুব কম লোকে পড়ে। আর, এক কবি অন্য কবির লেখা পড়বে, এই আশা ত' একেবারেই দুরাশা। কবিখ্যাতি লাভ কত্তে হ'লে হয়ত তোমাকে সমস্ত জীবন একাকিত্ব ভোগের স্বেচ্ছাকৃত দণ্ড মাথা পেতে নিতে হবে। দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে, দেশের প্রতিভাবান্ লেখকেরা সবাই গল্প-রচনা আর উপন্যাস-লেখার মধ্যেই নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছেন? গল্প আর উপন্যাস সাধারণ অসাধারণ সকল লোকেই বেশী পড়ে। ভাল লেখা হ'লে ত' কথাই নেই, মাঝারি গোছের প্রতিভা নিয়ে যাঁরা কথা-সাহিত্য রচনা কচ্ছেন, মা-লক্ষ্মী তাঁদের ঘরে এসে বাসা

বাঁধেন। সাহিত্য-জগতে তাঁদেরই আদর, তাঁদেরই খ্যাতি। অথচ দেশকে সাহিত্যের অশেষ সম্পদে সমৃদ্ধ কত্তে হ'লে, ভাষা-জননীর গৌরবকে স্থায়িত্ব দিতে হ'লে প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক বিষয়ের রচনা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবার্ত্তাকে নিজের দেশের ভাষায় অনুবাদ যে প্রয়োজন, এ কথাটা মনে থাক্‌লেও এতে কারো মনোযোগ নেই। তার প্রধান কারণ, এর পাঠক নেই, এতে উপার্জ্জনের সম্ভাবনা নেই। কবিতা লিখে পেট ভরেছে, এমন দৃষ্টান্ত এদেশে খুব কম পাবে। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও কাব্যের কত সমাদর কিন্তু বই বেচে তিনি অনেক পয়সা পাচ্ছেন ব'লে আমার মনে হয় না। অনেক পয়সা ঐ ভাবে পেলে তিনি শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহে নানা বিতর্কিত উপায় অবলম্বন কত্তে বাধ্য হতেন না। টাকা যদি চাও, কবি হ'য়ো না। কারণ, কবিতার বই পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে খুব কম লোকে। হিন্দী ভাষায় তুলসীদাসের রাম-চরিত-মানস ছাড়া অন্য কাব্যের বাজারই নেই। বাংলা ভাষায় কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাড়া অন্য কাব্যের আদর নেই। সাধক-কবি মনোমোহন দত্ত কত সুন্দর সুন্দর গান লিখেছেন যা' সাধক, ভাবুক, গায়কদের কণ্ঠে কণ্ঠে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে পরিচিত, কিন্তু বাংলা ভাষার কোনো ইতিহাস-রচয়িতা এমন কবির নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নিজ নিজ গ্রন্থে করেন নি। কান্তকবি রজনীকান্ত নিতান্ত দারিদ্র্যের

মধ্যে জীবন-যাপন ক'রে হাসপাতালে প্রাণ দিলেন, তাঁর অনবদ্য সঙ্গীত-সমূহ তাঁর জীবনোপায় ক'রে দিতে পারে নি। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস ঢাকায় অনাহারে প্রাণ দিয়েছিলেন, চিত্তরঞ্জন দাস মশায়ের মানি-অর্ডার তাঁর বাড়ীতে মাত্র তখন পৌছুল, যখন এই মাত্র তাঁর মৃতদেহ কৃষ্ণপুরের শ্মশানে দাহ করার জন্য শ্মশানবন্ধুরা ঘাড়ে ক'রে বের ক'রে নিয়ে গেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অশেষ আছে। সুতরাং ধনার্জ্জনের জন্য কবিতা লিখো না। প্রাণের আনন্দে লিখতে চাও, লিখো। কবিতা রচনার সময়ে রূঢ়চেতা লোকের মনেও একটা সরলতা আসে, যা' নিশ্চয়ই চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের সহায়ক। সুতরাং কাব্যচর্চ্চা নিশ্চয়ই ভাল কাজ।

সম্মোহন

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি যার সঙ্গ করেছ, সে যে তোমাকে মোহগ্রস্ত ক'রে রেখেছে, এই কথাটা তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ব'লেই তোমার ভিতরে দুঃসহ এই যাতনা। কিছুদিন দূরে থাক। কিছুদিন ভিন্ন পরিবেশে গিয়ে বাস কর। কিছুদিন ভিন্নতর আলোচনা ও অনুশীলনের দ্বারা তোমার নিজের মনকে শুদ্ধতর করার চেষ্টা কর। হয়ত একমাত্র তারই ফলে সম্মোহনের ঘোর কেটে যাবে। সম্মোহন বলি তাকে, যা

কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেয়, সম্মুখের পদচিহ্ন লুপ্ত ক'রে দেয়, অগ্রগমন প্রতিরুদ্ধ করে এবং ভুল পথকে সৎপথ ব'লে বুঝিয়ে দেয়। সম্মোহন অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস করায়, বিশ্বাসযোগ্যকে অবিশ্বাস করায়, নির্ভরযোগ্যকে ত্যাগ করায়, অনির্ভরযোগ্যকে আশ্রয় করায়, সুখ, শান্তি, আনন্দ সবকিছুকে গুলিয়ে দিয়ে এক নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণতার সৃষ্টি করে। প্রত্যেকেরই জীবনে কখনো না কখনো সম্মোহন আসে, ভ্রম-প্রমাদ-দুর্ব্বলতা তার মনকে আশ্রয় করে। সে তখন তা' টের পায় না, কিন্তু না জেনে না বুঝে বিপজ্জনক পথে পা বাড়ায়। এ অবস্থায় পড়লে মনকে নূতন ক'রে জীয়িয়ে তোলার জন্য স্থানান্তরে যেতে হয়। তীর্থ-ভ্রমণের যে এত মহিমা, তার একটা মস্ত কারণ এই যে, নানা দেশের নানা দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে, নানা ঘটনাস্রোতে প'ড়ে প'ড়ে, নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী শুন্‌তে শুন্‌তে আস্তে আস্তে মোহমুক্তি ঘটে। পৃথিবীর সব মানুষেরই সমস্যা প্রায় একই ধরণের এবং তার প্রতীকারের পন্থাও প্রায় এক। এই জন্যই তীর্থাদি ভ্রমণে সমস্যার সমাধান হঠাৎ ঘ'টে যায়। প্রমোদ-ভ্রমণে এই সমাধান নাও মিলতে পারে। কারণ, তীর্থযাত্রীরা প্রায় সকলেই নিজ নিজ সংস্কার-অনুযায়ী মনকে কিছুটা শুধ্‌রে নেবার জন্যই ঘর ছেড়ে তল্পীতল্পা নিয়ে বের হয়। আগ্রহে তারতম্য থাক্‌লেও উদ্দেশ্য সব তীর্থযাত্রীরই

প্রায় একই রূপ। তীর্থযাত্রী মাত্রেরই আংশিক আত্মশুদ্ধি লক্ষ্য-পথে থাকে, প্রমোদ-ভ্রমণকারীদের তা' নাও থাকতে পারে।

মানুষের মনোভূমিই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র

একজন প্রশ্ন করিল,—সাধু-সজ্জনেরা কেবল বেছে বেছে বড়-লোকদের বাড়ীই ওঠেন কেন? যেমন আপনি একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে উঠেছেন। গরীবদের বাড়ী কেন ওঠেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ ঠিক সন্ধ্যার সময়ে গিয়ে উঠ্‌ব একজন গরীব মুসলমানের বাড়ীতে, যিনি সম্ভবত একটা প্রাইমারি স্কুলে মাষ্টারি করেন, দুচার বিঘা ধানজমি হয়ত আছে কি নাই জানিনা, বাস করেন এক পল্লীগ্রামে, রেলষ্টেশান থেকে বেশ দূরে। পূবাইল ষ্টেশনে নেমে হেটেই যেতে হবে, না নৌকায় যাব, তাও জানা নেই কিন্তু আজই যাব।

প্রশ্ন হইল,—কেন, সেখানে কেন যাবেন? আপনি ত' হিন্দু-সন্ন্যাসী।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাব, ভদ্রলোক গরীব ব'লে। যাব, ভদ্রলোক বিপন্ন ব'লে আমার দ্বারা তাঁর কিছু সেবা

হ'তে পারে ব'লে। যাব নিজের রেলভাড়ায়, ফিরব নিজের রেলভাড়ায়, যেমন এখানে এসেছি নিজের রেলভাড়ায় এবং স্থানত্যাগ কচ্ছি নিজের রেলভাড়ায়। ইনি বড় লোক ব'লে এর বাড়ী আসিনি। ইনি আমাকে ভালবাসেন ব'লে এখানে এসেছি। আর এঁর মত লোকের বাড়ীতে না উঠ্‌লে তোমাদের মতন শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে আস্‌তে না। বড় লোকের বাড়ীই যদি পছন্দ কত্তাম, তাহ'লে ঢাকায় কি এঁর চেয়ে হাজার গুণে ধনবান্ ব্যক্তির কিছু আকাল আছে? না কি তাঁরা আমাকে চান না? কিন্তু এঁর মতন বিদ্বান্ জ্ঞানী ও সৌজন্যপরায়ণ লোকের ঘরে উঠ্‌তে আমার আনন্দ হয়। তোমরা সব শিক্ষিত বিবেকবান্ যুবক, তোমাদের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই একটা দোষ খুঁজে বেড়ানোর অভ্যাসটা কি ছাড়্‌তে পার না? আমি ত' আমার জীবনের অধিকাংশ কাজ রেলের প্ল্যাটফর্ম্মে ব'সে বা ক্ষেতের আইলে হাটতে হাটতে করেছি। কিন্তু আমাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র মানুষের মনোভূমিতে। কে ধনী আর কে দরিদ্র, সে বিচারের আমাদের অবসর নেই।

বেলা দুইটার সময়ে ঢাকা ফুলবেড়িয়া ষ্টেশানে শ্রীশ্রীবাবামণি ট্রেণ ধরিলেন। সাড়ে তিনটায় পূবাইল পৌঁছিলেন, সন্ধ্যা ছয়টায় পৌঁছিলেন বেরুয়া।

বেরুয়া (ঢাকা)
১২ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৪২
(২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

যৌগিক আসন-মুদ্রার জগদ্ব্যাপী প্রচলন-সম্ভাবনা

গত রাত্রেই বেরুয়ার তরুণ কিশোরেরা কেহ কেহ কিছু কিছু আসন-মুদ্রার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। অদ্য সকালে তাঁহাদের পুনরায় অনুশীলন হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা ত' সবাই মুসলমান। নমাজ পড়া তোমাদের পক্ষে ত' বাধ্যকর। তোমরা শুন্‌লে অবাক্ হবে যে, তোমাদের নমাজের ভিতরে যে সকল বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গী আছে, সেইগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে যৌগিক আসন-মুদ্রারই একটা সংস্করণ। আসন-মুদ্রা অভ্যাসে শরীরে আসে স্থৈর্য্য ও শৌর্য্য, মনে আসে ধীরতা, স্থিরতা ও অচঞ্চলতা। নমাজেরও তাই ফল। প্রত্যেকেরই যৌগিক আসন-মুদ্রা অভ্যাস করা হিতকর। যৌগিক আসন-মুদ্রায় জাতিভেদ নেই, ধর্ম্মভেদ নেই, দেশভেদ নেই। আমরা এখন মুষ্টিমেয় কয়েক জনে ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে নিজ নিজ দায়িত্বে এর প্রচারের চেষ্টা কচ্ছি। খুব শীঘ্রই দেখা যাবে যে, সমগ্র জগৎ জুড়ে আসন-মুদ্রার প্রচলন সুরু হ'য়ে গিয়েছে। সে দিন খুব দূরে নয়।

মানুষ হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উন্নতির পথে চল্‌তে গেলে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে মনুষ্যত্বের। আমরা কে কতটা মানুষ হচ্ছি, এটাই হবে বড় বিবেচ্য। কে কতখানি হিন্দু আর কে কতখানি মুসলমান, তার উপরে উন্নতি নির্ভর করে কিনা, ভেবে দেখা দরকার। আমরা যদি মানুষ না হ'য়ে পশুই থাকি, তবে মুসলমান থেকেও আমরা সমাজের গ্লানি, হিন্দু থেকেও আমরা দেশের কলঙ্ক। প্রত্যেকে লক্ষ্য দাও যে, মানুষ কি ক'রে হ'তে পারি। প্রকৃত মানুষ হওয়াই আমাদের লক্ষ্য হউক। কাকে বলে প্রকৃত মানুষ, তার বিবরণ ও সংজ্ঞা সব শাস্ত্রেই বলা হয়েছে। তুমি অন্যের শাস্ত্র পড়নি ব'লে আফশোষ করার প্রয়োজন নেই। তোমার নিজের শাস্ত্রেই তুমি প্রকৃত মানুষের নিদর্শনগুলি খুঁজে পাবে। প্রাণপণে চেষ্টা কর, মানুষ কি, সেটা বুঝতে। তারপরে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে লেগে যাও মানুষ হবার অধ্যবসায়ে।

সাম্প্রদায়িকতার অবসান হোক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের শৈশবে আমরা সাম্প্রদায়িকতা জিনিষটাকে লক্ষ্য কত্তে পারি নি। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, হিন্দুতে আর মুসলমানে

ভেদ আর দূরত্ব কেবল বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু আমরা বিশ্বাস করি যে, শেষ পর্য্যন্ত এই হলাহলের ভিতর দিয়েও অমৃতই উঠবে। যারা কখনো পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষ কত্ত না, আজ তারা তা' কচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে তা' হয়ত মারাত্মক আকার ধারণ কর্ব্বে, অন্যেরা সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত ভারতবর্ষের ঐক্যকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে, কিন্তু তথাপি একথা আমরা বিশ্বাস করি যে, সাম্প্রদায়িকতায় কল্যাণ নাই, জাতির উন্নতি-বিধানকে পরম লক্ষ্য ব'লে স্বীকার কত্তে হ'লে অসাম্প্রদায়িকতার জয়ধ্বনি যে দিতে হবে, একথা ধ্রুব সত্য। অবস্থার তাড়নে প'ড়ে প্রকাশ্য ভাবে অসাম্প্রদায়িকতার জয়ধ্বনি করার পরে গোপনে তলে তলে সকলের অজ্ঞাতে আবার যে সাম্প্রদায়িকতার বিভীষিকা সৃষ্টির চেষ্টা হ'তে পারে, এই সম্ভাবনার কথা আমি বুঝতে পারি। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার ধূয়া তুলে জগতে বারংবার অনেক বীভৎস ব্যাপার ঘ'টে গেছে। কিন্তু বৃহত্তর আদর্শের নবারুণোদয়ে তার প্রতীকার ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। জগৎ চিরকাল এক ধাঁচে চলতে পারে না। তার গতির স্বাভাবিক বিবর্ত্তনেই অনেক নূতন সত্যের আস্বাদন হবে, নূতন তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন ঘট্‌বে। সেই শুভদিনটীর দিকে তাকিয়েই আমি সর্ব্বত্র ব'লে থাকি,—সাম্প্রদায়িকতার অবসান হোক।

ঈশ্বর মাত্র একজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অসাম্প্রদায়িকতা বলতে কি এই বুঝতে হবে যে, খ্রীষ্টান গীর্জ্জায় যাবে না, মুসলমান নমাজ পড়্‌বে না, হিন্দু সন্ধ্যা-পূজা ছেড়ে দেবে? হিন্দুর ঈশ্বর, মুসলমানের ঈশ্বর, খ্রীষ্টানের ঈশ্বর কি তিন জন আলাদা? তাঁকে আরাধনার পদ্ধতি গুরুবর্গের উপদেশানুক্রমে আলাদা হ'তে পারে ব'লেই কি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা তিন জন? স্রষ্টা যখন এক, তখন যত দেরীতেই হোক্, একদা কোনও না কোনও উপায়ে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে অপর ধর্ম্মাবলম্বীর বৈরভাব দূর হবেই হবে।

শিলমান্দী (ঢাকা)

১৩ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৪২

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫

রাত্রি জাগরণ বর্জ্জনীয়

গতকাল সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবাবামণি শিলমান্দী পৌঁছিয়াছেন। গ্রামের ভক্তেরা কীর্ত্তন, উপাসনা ইত্যাদি করিয়া এগারটা পর্য্যন্ত খুবই আনন্দ করিয়াছেন। একজন দুঃখ করিলেন যে, সারারাত্রি কেন কীর্ত্তনানন্দ করা হইল না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিয়মিত জীবন-যাপন করা যাদের পক্ষে সম্ভব, তাদের অধিক রাত্রি-জাগরণ ক'রে

কোনো কাজই করা উচিত নয়। কারণ, রাত্রি-কালটা প্রধানতঃ অধিকাংশ জীবের জন্যই বিশ্রামের কাল। যাতে রাত্রি-জাগরণ না ক'রেই সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য করা যায়, সেই দিকেই প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত। রাত্রি-জাগরণের অনেক দোষ আছে। যথা, চিত্তবিক্ষেপ, অকারণ ক্লান্তি, স্বাভাবিক নিয়মের বিপর্য্যয়। কিন্তু সৈনিককে যুদ্ধক্ষেত্রে, শুশ্রূষাকারীকে হাসপাতালে, বন্যা-ঝঞ্ঝা-দুর্ভিক্ষের ত্রাণকারীকে, রেলের গার্ড, ড্রাইভার, টিকিট-চেকারকে, ষ্টীমারের খালাসী, সুখানি, সারেং প্রভৃতিকে, চৌর-বিতাড়নের প্রহরীকে, এবং পুলিশকে কাজের প্রয়োজনে রাত্রি-জাগরণ কত্তে হয়। কিন্তু সেই ক্লান্তি বা অবসাদ দূর করার জন্য তাকে দিবানিদ্রারও আবার অভ্যাস কত্তে হয়। ধর্ম্মকার্য্যে রাত্রিজাগরণ যতটা পারা যায়, অবশ্যই বর্জ্জনীয়।

বাঙ্গালীর জাতিভেদের বিরোধিতা

জাতিভেদের কথা উঠিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বঙ্গদেশে জাতিভেদ-প্রথা নিতান্ত শিথিল। এই জন্যই এই প্রথার আক্রমণাত্মক কুফল সম্পর্কে এদেশে আন্দোলন খুব কম। অন্যত্র জাতিভেদ-প্রথার রূপ অত্যন্ত কুৎসিত এবং বীভৎস। বড় জাতের লোকের কূয়া থেকে ছোট জাতের

লোক জল তুলতে অধিকারী হবে না, কেউ জোর ক'রে বা অজ্ঞানতা-বশতঃ তুললে তার পিঠের চামড়াও যেতে পারে, ঘাড়ের মাথাটাও যেতে পারে। বড় জাতের লোকের পুকুরে ছোট জাতের লোক স্নান কল্লে, তাকে বেদম প্রহার ত' সহ্য কত্তেই হবে, এমনকি সে যদি স্ত্রীলোকও হয়, তবু তাকে উলঙ্গিনী ক'রে সারা গ্রামে প্রদর্শনী ক'রে বেড়ান পর্য্যন্ত হ'তে পারে। বড় জাতের লোক যে রাস্তা দিয়ে হাটবে, ছোট জাতের লোকদের সেই রাস্তায় কদাচ পদার্পণ কত্তে দেওয়া হবে না, কেউ দুঃসাহস ক'রে পদার্পণ করলে সঙ্গে সঙ্গে তার জাতের সমস্ত লোকের বাড়ীঘর দলবদ্ধ হ'য়ে অগ্নিদগ্ধ করা হবে। বঙ্গদেশের বাইরে ভারতের নানা স্থানে ছোট জাত নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের লোকদের উপরে এসব অত্যাচার হ'য়ে থাকে। বঙ্গদেশে এসব বল্‌তে গেলে নেই। তবু বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কারকেরা জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে নানা সময়ে যে তীব্র আন্দোলন করেছেন, তারও তুলনা নেই। এ আন্দোলনের আসল কথাটা হ'ল মানুষে মানুষে সমতার প্রতিষ্ঠা। কেউ নীচ বংশে জন্মেছে ব'লেই তাকে হেয় জ্ঞান করা পাপ, কেউ উচ্চ বংশে জন্মেছে ব'লেই তাকে বেশী সমাদর এক প্রকারের খোশামুদী। একাজ করা হবে না, সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখ্‌তে হবে, জীবনে উন্নতি করার জন্য সকলকে সমান অধিকার দিতে হবে, সকলকে সমান

সুযোগ দিতে হবে। বাঙ্গালীর জাতিভেদ-বিরোধী-আন্দোলনের মূলতত্ত্ব হচ্ছে এই।

সকলের জন্য সকলের চেষ্টা চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখা ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিরও বিধান। কিন্তু প্রথানুসারে কেউ বড়, কেউ ছোট হ'য়ে আছে দীর্ঘকাল ধ'রে। যারা ধন-সম্পদের বা বিদ্যা-গৌরবের অভাবে ছোট হ'য়ে আছে, তাদের জোর ক'রে হঠাৎ সকলের সমান ক'রে তোলা সহজ কথা নয়। এর জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত অর্থনৈতিক প্রয়াস এবং সুপরিচ্ছন্ন বিদ্যাদানের আয়োজন। একাজ একাকি-সাধ্য নয়, এ কাজে জনসমাজের প্রত্যেকের এবং বিশেষ ভাবে রাষ্ট্রের উদ্যম প্রয়োজন। আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং বিদ্যার সুপ্রতুলতা, সেই দুইটী সাহায্য ছাড়া মানুষকে শুধু উপদেশ দিয়ে বড় ক'রে তোলার চেষ্টা সফল হবার সম্ভবনা রাখে না। সাম্যের প্রয়োজন অনেক কাল ধ'রে মানুষ অনুভব ক'রে এসেছে কিন্তু পথ পায় নি। কেননা, যে যা চেষ্টা করেছে, সবই করেছে একা নিজের জন্য, সকলের জন্য সকলের চেষ্টা ত' কখনো হয় নি। সকলের জন্য সকলকে চেষ্টান্বিত কত্তে হবে।

কাম রক্তবীজ

একজন তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু সংবাদ পরিবেশন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধারণতঃ একটি মাত্র গুরুতর দোষের জন্য সমস্ত প্রকারের মহৎ চিন্তা, উন্নত ভাবনা, কিছুই তোমার ভিতরে স্থায়ী আসন পাততে পারছে না। কিন্তু তাকে তুমি যে চিনতে পেরেছ, এটা তোমার এক পরম সৌভাগ্য। অনেকবার তুমি মনে করেছ যে, একে বুঝি-বধ করেছ, কিন্তু রক্তবীজের মাথা কেটে ফেল্লেও যেমন এক বিন্দু রক্ত থেকে তার আবার সৃষ্টি হয়, রাবণের মাথা কেটে ফেল্লেও যেমন কাটা মুণ্ড সঙ্গে সঙ্গে এসে স্কন্ধে জোড়া লাগে, ঠিক তেমনি তোমার এই পরম শত্রু ম'রেও মরে না, বারংবার বেঁচে ওঠে। মরাটার আবার বিশেষত্ব এই যে, ম'রে তারপর বেঁচে উঠেই সে আগের চেয়ে বেশী উৎপাত শুরু করে। মরতে হয়েছিল ব'লে তার লজ্জাও নেই, অনুতাপও নেই। এই শত্রুর নাম কাম। তুমি তাকে চিনতে পেরেছ, এটা তোমার মহৎ ভাগ্য। তুমি যখন কামকে চিনেছ, সে কখনো স্নেহের ছদ্মবেশে, দয়ার ছদ্মবেশে, সহানুভূতির ছদ্মবেশে, কাব্যচর্চ্চার ছদ্মবেশে, নৃত্য-গীতাদি অনুশীলনের ছদ্মবেশে এসে যে বারংবার তোমাকে ঘায়েল কচ্ছে, এ' যখন বুঝতে পেরেছ, তখন আর তোমার ভয় নেই। তাকে রুখতে হবে প্রাণপণ চেষ্টায় এবং এক চেষ্টায়

নয়, তোমার স্ত্রীকেও যোদ্ধ্রীর বেশ পরিধান কত্তে হবে। নরনারীর কামচর্চ্চা ত' একাকী হয় না, সেই কামকে জয় করাও একার আয়ত্ত নয়। তোমোদের দুজনকেই সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। দুজন যেই মুহূর্ত্তে সমপ্রাণ ও সমমনা হয়েছ, জানবে, তোমাদের সহিষ্ণুতা সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে।

কাম-দমনের লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলে কামকে পরাজিত কর্ব্বার জন্য যে চেষ্টা কর্ব্বে, তার কি লক্ষ্যটা হবে, তা মনে রেখো। তোমরা কামজয়ী দম্পতী, লোক-সমাজে এই পরিচয় দিয়ে সম্মান কুড়ানো? না, নিশ্চয়ই না। কেননা, তাতে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অতি দ্রুত নষ্ট হ'য়ে যাবে। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব দিকের কুশল কামজয়ে কিন্তু কামজয়ের সামাজিক সুফল কল্পনাতীত। তুমি যে কামকে দমন করেছ, সেই কাম কি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেল? না, তা নয়। যাকে জয় করেছ, সে তোমার বাহুতে বল-রূপে, বুকে সাহস-রূপে, কর্ম্মে নিদারুণ নিষ্ঠা এবং ধৈর্য্য-রূপে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে। এর সুফল তোমার দেশের তোমার জাতির, তোমার সমাজের প্রতিটি প্রাণীর উপরে অভাবনীয় ভাবে প্রতিফলিত হবে। কিছু লোকের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সংযম এভাবেই সমগ্র দেশকে

উন্নতির পথে ধাবিত করে। দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যে কামদমনের সামর্থ্য জাগলে তার প্রভাব সমগ্র জগতের উপরে পড়বে। তোমার কামদমনের লক্ষ্য হবে সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক উন্নতি, জীবচেতনার মাঝে দিব্য চেতনাকে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠাদান।

সাধন ও গুরুতে নির্ভর

জিজ্ঞাসু আরও কিছু নিবেদন করিলেন। উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাতে তোমার বিশ্বাস আছে, এটা আমার পক্ষে আনন্দের কথা, তোমার পক্ষে এটা লাভজনক। আমাতে বিশ্বাস থাক্‌লে তুমি সহজে আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত সত্য অভিপ্রায়কে বুঝতে পার্ব্বে। তা' বুঝলেই তুমি আমাতে নির্ভর কত্তে পার, নতুবা পার না। আমাতে যে নির্ভর কত্তে পারে না, তাকে আমি উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু জীবনীয় অমৃত দান কত্তে পারি না, কারণ, আদান এবং প্রদানের মাঝখানে একটা নিস্তরঙ্গ অচঞ্চল সমতার প্রয়োজন আছে। একটা বোতল থেকে আর একটা বোতলে মধু ঢালতে হ'লে দুটার মুখ একস্থানে বা কাছাকাছি আসা চাই, নইলে একটায় মধু অন্যটায় না প'ড়ে অজায়গায় প'ড়ে যাবে। দৈবাৎ আমি গুরু আর দৈবাৎ তুমি শিষ্য, এইজন্যই আমি তোমার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তির উপরে

জবরদস্তি চালাতে চাই না। কিন্তু আমার দেওয়া অমৃতের স্বাদ আমাতে বিশ্বাস ও নির্ভর ছাড়া পাওয়া বড় শক্ত কথা।

আমি তোমার সঙ্গে আছি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি তোমার সঙ্গে আছি। একটী নিমেষের জন্যও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি না, তোমার ধ্যান-নিবিষ্ট প্রশান্ত মনের স্নিগ্ধ শীতল সুন্দর অবস্থাতেও আমি তোমার সঙ্গে আছি, তোমার কামকলঙ্কিত উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দাম মুহূর্ত্তগুলিতেও আমি ক্ষণকালের জন্য তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে কোথাও যাই না। এটা অনুভূতির ব্যাপার। এটা উপলব্ধির বিষয়। জিনিষটা তর্কাতীত। কথাটা জল্পনা, কল্পনা বা আন্দাজী বাজে রটনা নয়। জোর ক'রে একথা বিশ্বাস কর্ত্তে আমি তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছি না, দিতে পারি না। কারণ, আমি এমন গুরু, যিনি শিষ্যের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু সাধন যদি ক'রে যাও, তা' হ'লে এক সময় নিজে নিজেই নিজের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়া দিয়ে একথার সত্যতা স্বীকার কর্ব্বে। রসনা বলবে, আমি ওখানে ছিলাম, আছি, থাক্‌ব। চক্ষু বল্‌বে, আমি ওখানে ছিলাম, আছি, থাক্‌ব। কর্ণ বল্‌বে, আমি ওখানে ছিলাম, আছি, থাকব। তোমার নাসিকা বল্‌বে, আমি ওখানে ছিলাম, আছি, থাক্‌ব। তোমার সর্ব্ব অঙ্গের প্রতিটি রোমকূপ, প্রতি চর্ম্মকণা বল্‌বে, আমি

ওখানে ছিলাম, আছি এবং থাক্‌ব। তখন তুমি আপনা আপনি ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভ কর্ব্বে এবং স্থায়ী আত্মজয়ের গৌরবের হবে আস্পদ।

প্রকৃত ভালবাসা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তখন তুমি দেখ্‌বে যে, তোমার ভোগসঙ্গিনী ললনা তোমার শত্রু নয়, দিন্‌কা মোহিনী রাতকা বাঘিনী নয়, তোমার নরকপথের সিংহদুয়ার নয়, সে তোমার মুক্তিদাত্রী মহাকালিকা, সে তোমাকে ভোগের পল্বল থেকে তুলে সংযমের দিব্যাঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবার জগদ্ধাত্রী, সে তোমার অন্তরের যাবতীয় দারিদ্র্য হরণের মহালক্ষ্মী, সে তোমার মূক মৌন বাক্যহীন অন্তরের যাবতীয় আকূতিকে বিশ্বকল্যাণে রূপান্তরিত ক'রে দেবার কলভাষিণী সরস্বতী। যে আমাকে সঙ্গে পেয়েছে, তার আবার কামজয়ের জন্য দুশ্চিন্তা কেন? তখন তুমি হবে ভালবাসার খনি, যেখানে কেবল ভালবাসাই মিলে না, অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার যেখানে আতঙ্ক নেই, যে ভালবাসায় সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন ক'রে ধরা যায় কিন্তু কলুষের হয় না সৃষ্টি, যে ভালবাসা দেয় নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জনের ক্ষমতা এবং সমগ্র বিশ্বের করে কুশল-সাধন কিন্তু কোথাও কোনও মায়ার বন্ধন সৃষ্টি করে না, কোথাও কোনো আলেয়ার আলো রচনা করে না, যে

ভালবাসায় কেবল আত্মোন্নতি, দেশোন্নতি, বিশ্বোন্নতি কিন্তু কোথাও নাই কদাচ কোনও পদস্খলন।

আমাকে চিনিতে চাহ

জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমাকে চিনিতে চাহ? নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে। আমাকে বুঝিতে পারার শক্তি চাহ? নিশ্চয়ই সেই শক্তি তোমার হইবে। শ্রীভগবানের যেই নামটী আমি তোমাকে দিয়াছি, তাহার মধ্যে সমস্ত মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তাহার সেবা কর, নামকেই গুরু জানিয়া নামের একান্ত অনুগত হও, কেবল আমাকেই চিনিবে, তাহা নহে, তোমাকেও চিনিবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রপঞ্চ ও বিভূতি সব কিছুকে চিনিবে, যাঁহাকে চিনিলে সব চেনা হইয়া যায়, যাঁহাকে জানিলে সবকিছু জানা হইয়া যায়, তাঁহাকেও চিনিবে, তাঁহাকেও জানিবে। অবিরাম নাম কর, অবিশ্রাম নাম কর, নাম করিতে করিতে নামের মধ্যে ডুবিয়া যাও, নাম করিতে করিতে নিজের মধ্যে সর্ব্বান্তরে নামকে আস্বাদন কর, নামকে শরীরের প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি রোমকূপে, প্রতি অণুপরমাণুতে প্রত্যক্ষ কর, আস্বাদন কর, নামেতে নিজেকে এবং নিজেতে নামকে ওতপ্রোত কর, অভেদ-অন্বয় কর,—আমাকে তখন নিশ্চয় চিনিবে, চিনিতে ভুল হইবে না। এখন আমি মরদেহধারী

সামান্য নগণ্য একটী তুচ্ছ মানুষ মাত্র, তখন আমি শঙ্খ-চক্র-ত্রিশূল-ডম্বরুধারী বিষ্ণু-মহেশ্বর অপেক্ষাও পরমমহীয়ান্ পরম-পুরুষে পরিণত হইয়া যাইতে পারি। তুমি নিজে যখন যেই অবস্থায় আছ, আমাকে চিনিতে শুধু সেই চক্ষুটাই ত' তুমি পাইবে। নাম-সেবার গুণে নিজেকে যত উন্নত অবস্থায় পাইবে, আমাকে তত সূক্ষ্ম রূপে, তত নির্ভুল অভ্রান্ত ভাবে, তত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ রূপে দেখিতে পাইবে, বুঝিতে পাইবে, জানিতে পাইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি কে? আমি আর তুমি একই তত্ত্ব, একই বস্তু, একই অস্তিত্ব, একই আনন্দ।"

ত্যাগশক্তি, ঐক্যশক্তি, নিষ্ঠা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শুধু বুদ্ধিশক্তি দিয়া কেহ অবনত জাতির উদ্ধার-সাধন করিতে পারিবে না। প্রয়োজন ত্যাগশক্তির। প্রশ্ন যেখানে সকলের অভ্যুদয়, সেখানে একজন বা দুই জনের ত্যাগে কতটুকু কাজ হইবে? একজন বা দুই জনেরও ত্যাগ চরম আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত হিসাবে বিপুল প্রেরণার উৎস হইতে পারে কিন্তু ত্যাগকে, ত্যাগ-সামর্থ্যকে, ত্যাগ-রুচিকে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে সমগ্র দেশ জুড়িয়া প্রতিটি মানুষের অন্তরে। সকলের না সম্ভব হয় ত' অধিকাংশের ত্যাগবুদ্ধিকে একটা ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে হইবে। পরমুখাপেক্ষা পরিহার

করিয়া প্রতিটি চেষ্টা ও প্রকরণ স্বাবলম্বনসম্মত পথে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে। নিজেদের মধ্যে সমাজগত, প্রথাগত ধর্ম্মগত যত রকমের বিচিত্র পার্থক্যই থাকিয়া থাকুক না কেন, তৎসকল সত্ত্বেও সবাই একত্র মিলিয়া অকপট প্রাণে যে কাজ করিতে পারে, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে, সেই সাধনায় সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইবে। যাহারা তোমাদের সহিত সম্মত হইতে পারিল না, তাহাদিগকে শত্রু না ভাবিয়া তোমাদেরই কাজের কোনও একটা অপূর্ণ অংশের সম্পূরক রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা, সেই মনোভঙ্গিমা নিয়া অপরাপরকে বিচার করিতে হইবে। কেবল বুদ্ধি তোমাদের বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করিবে না। বাঁচিয়া থাকিতে শ্রমশক্তি চাহি, ত্যাগ-শক্তি চাহি, ঐক্যশক্তি চাহি এবং অসংখ্য জনের যুগপৎ একটা আদর্শের প্রতি আনুগত্য-বশত একান্ত নিষ্ঠাশীল কর্ম্মযোগে আমৃত্যু লাগিয়া থাকিবার আগ্রহ চাহি।"

প্রচ্ছন্ন কাম

অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মনের অগোচর পাপ নাই। বাহিরের লোক তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না। অতএব জানিল, তুমি সত্যই

বড় মিশুক ছেলে, যাকে পাও, তাকেই আদর করিয়া বুকে ধর কিন্তু তুমি তোমার নিজের মনে জানিতে পারিতেছ যে, তোমার ঐ তথাকথিত নির্দ্দোষ আলিঙ্গন নির্দ্দোষ নহে, অপরকে আলিঙ্গন করিবার কালে তোমার মনে দারুণ পশুভাবের উদ্ভব হয় অথবা অনেক সময়ে তুমি পশুভাবের বিকার হইতেই এই তথাকথিত নির্দ্দোষ আলিঙ্গনটুকু দিয়া থাক। নিজে যখন নিজের মনে জানিতেছ, তখন সাবধান হইতে পারিবে না কেন? জিদ কর যে, যাহা অন্যায় বুঝিতেছ, তাহা আর করিবে না। আমি এখান হইতে উপদেশ দিয়া তোমার ভাল থাকিবার উৎসাহটুকু মাত্র বাড়াইতে পারি, আত্মোদ্ধার তোমাকে নিজের চেষ্টাতেই করিতে হইবে। আমি অনেক ধার্ম্মিক-নামধেয় ভদ্রলোকদের নানা অনুষ্ঠানে দর্শক বা নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহার কোথাও কোথাও কোলাকুলির ছড়াছড়ি দেখিয়া ইহার ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হইয়াছি। কোথাও কোথাও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের পরে স্ত্রীপুরুষেও কোলাকুলি চলে বলিয়া শুনিয়াছি। ইহা আমার কাছে বাড়াবাড়ি বা অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইয়াছে। কিন্তু আর্ত্ত হইয়া এই সকল ব্যাপারের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিরা যখন আমার কাছে সৎপরামর্শ বা সাহায্যের জন্য আসিয়াছে, তখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাহিরে শুচিতাপূর্ণ প্রীতির নিদর্শন রূপে ব্যবহৃত হইলেও এই সকল কোলা-কুলি আর আলিঙ্গন কাহারও কাহারও

জীবনে সংগুপ্ত কলুষের পল্বল জমাইতে সমর্থ হইয়াছে। তোমার অবস্থাটাও তাই। উল্লিখিত অবস্থার আর্ত্ত ব্যক্তিরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভুজবলে নিজ নিজ কণ্টক উৎপাটিত করিয়াছেন, তুমিও নিজেই নিজের বিপদুদ্ধার করিবে। প্রচ্ছন্ন কাম নিয়া পাশ্চাত্যেরা হাজার দশেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, আমাদের দেশে ঐ জাতীয় সাহিত্যের তত ছড়াছড়ি নাই কিন্তু প্রচ্ছন্ন কাম সর্ব্বদেশেই মানবের হিত-হন্তারক। সুতরাং বলপূর্ব্বক নিজেকে এই সকল তথাকথিত কামগন্ধহীন আচরণ হইতে নিবৃত্ত রাখ।"

এক স্ত্রীর মৃত্যুতে

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এক স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিলে পুরুষ যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করার আগ্রহ অনুভব করে, তখন তার মনের প্রকৃত স্বভাবটুকুর পরিচয় সকলের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সে বলিতে শুরু করে,—এই দেখ সব নাবালক ছেলেমেয়ে, তাদের দেখে কে? বিবাহটা হইয়া যাইবার দুই এক মাসের মধ্যেই নাবালক শিশুদের প্রতি পিতার মন বিরূপ এবং উদাসীন হইয়া যায়। নূতন বিমাতার মন কিরূপ হয় বা থাকে, তাহা বলিবার প্রয়োজন অতি অল্প, কারণ, পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ বিমাতার সংসারের ইতিহাস একেবারে ছাঁচে

ফেলা এবং একরূপ। আমার মতে নারীরা যেমন পতিবিয়োগে আর বিবাহ করে না, পুরুষদেরও তেমন পত্নীবিয়োগের পরে বিবাহ না করাই সঙ্গত। যদি কেহ পুনরায় বিবাহ করিবার প্রয়োজন বোধ করে, তবে সে যেন একটি বাল-বিধবাকেই খুঁজিয়া লয়। এই অবস্থাই সুস্থ সমাজের লক্ষণ। নারী ও পুরুষের জন্য একই অবস্থায় নৈতিক মানের দুইটী অলাদা আদর্শ থাকা মারাত্মক অবিচার।"

স্বাধীন মন

অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংশয়, সন্দেহ, প্রশ্ন ও তর্ক স্বাধীন মনের স্বভাব। পরাধীন মনে এসব আপদের বালাই নাই। কিন্তু স্বাধীন মন সত্যই বাঞ্ছনীয় বস্তু, কেননা প্রকৃত সত্যে পৌঁছিবার পক্ষে সেই মনটী অত্যন্ত সহায়ক। বিনা বাক্যব্যয়ে আমার কথাই তোমরা মানিয়া নিবে, এমন আজগুবি দাবী আমি তোমাদের উপরে করিতে যাইব কেন? আমার প্রত্যেকটা কথা বিচার করিয়া গ্রহণ কর কিন্তু গ্রহণ করিয়া আর অলস হইয়া বসিয়া থাকিও না। আমার প্রত্যেকটা আচার আচরণ বিচার করিয়া তারপরে আমাকে পূজ্য বা শ্রদ্ধেয়, গ্রহণযোগ্য বা প্রত্যাখ্যানাস্পদ বলিয়া জান। আমি জল কাৎ বলিয়াছি বলিয়াই জল কাৎ হইয়া যাইবে, এই জেদ আমার নাই।

আমাকে অগ্রহণীয় বলিয়া মনে করিয়া পৃথিবীর সব লোক যদি চলিয়া যায় আমার কাছ হইতে সহস্র যোজন দূরে, তথাপি আমি সাত জন্ম জুড়িয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বসিয়া নিশ্চিন্তে প্রতীক্ষা করিব সেই একটী মাত্র মানুষের জন্য, যে আমার কথা একদা নিজ সর্ব্বস্ব দিয়া শুনিবে এবং কথাকে কাজে পরিণত করিবে। আমার কথা মানিয়া চলিবার জন্য বুদ্ধিকৌশলে ডাণ্ডাবাজি করিয়া আমি দলে দলে অনুগত-শ্রেণী তৈরী করিতে চাহি না। আমাকে মানিবে না বলিয়া বারো বৎসর ব্যাপিয়া জেদ চালাইয়াও যে স্বভাবের বশেই আমাকে একদা সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া চলিতে প্রস্তুত হইবে, আমার কাজ যোগ্যতার সহিত ত' করিতে সমর্থ হইবে মাত্র সে-ই। প্রচার ও প্রপ্যাগাণ্ডা দ্বারা বুদ্ধিজগতের একদল ক্রীতদাস সৃষ্টি করিয়া আমি একজন দাস-রাজ হইতে চাহি না। সুতরাং সংশয় বা সন্দেহ থাকিলে তাহা ভঞ্জনের দাবী করিবার তুমি অধিকারী। প্রশ্ন বা তর্ক থাকিলে তাহাও করিতে পার। হয় যুক্তির দ্বারা, নয় কর্ম্মের দ্বারা আমি যথাকালে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর নিশ্চয়ই দিব। এজন্য প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য্যটুকু তোমার প্রয়োজন হইবে। রেলের টিকিটও চাহিবামাত্র পাওয়া যায় না, বুকিং ক্লার্ককে কোচিং ট্যারিফ দেখিবার জন্য সময় দিতে হয়। সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য তর্ক প্রশংসনীয়। বিদ্যার বহর দেখাইবার জন্য বা অপরের

বুদ্ধিহীনতা প্রমাণের জন্য তর্ক আসুরিক শাস্ত্র। মনকে স্বাধীন, সতেজ রাখিবার জন্য যে তর্ক, তাহা চরিত্রের দৃঢ়তা-বর্দ্ধক।

ব্যবসায়ের স্থান-নির্ব্বাচন

অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবিকার্জ্জনের জন্যই ব্যবসায়। আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, আত্মসম্মান বর্দ্ধিত করিয়া, অন্য দশ জনের হিতসাধন করিয়া, নিজের অস্তিত্বকে সমাজের দশ জন নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির পক্ষেও হিতকর করিয়া সেই ব্যবসায় করিতে হইবে। সুতরাং বিশেষ বিবেচ্য হইল, (১) আত্মমর্য্যাদার সংরক্ষণ, (২) আত্মসম্মানের বর্দ্ধন, (৩) দশ জনের হিতসাধন এবং (৪) সমাজের দশজন নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির পক্ষেও নিজের অস্তিত্বকে প্রয়োজনীয়, লাভজনক এবং মঙ্গলপ্রদ করিয়া তুলিবার চেষ্টা এবং সুযোগ। অর্থাৎ তুমি যে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত হইল মানুষের মত বাঁচিয়া থাকা, এবং দেশ, জাতি, সমাজ ও জগতের কুশল-সাধক কর্ম্মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখার আগ্রহ, যোগ্যতা ও সুযোগ থাকা। এতগুলি বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যবসায়ের জন্য স্থান-নির্ব্বাচন করিও। কড়া মেজাজের লোক আত্মসম্মান বজায় রাখিতে গিয়া অনেক সময়ে শোচনীয়

এবং কতক সময়ে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সুতরাং নিজের মেজাজটী ঠাণ্ডা রাখিয়া চলিবার অভ্যাসটী তোমাকে করিতে হইবে। ধারে বিক্রী করিলে এবং বিশেষ করিয়া ধারে বিক্রীর অনুগ্রহটী অপাত্রে বিতরিত হইলে অকারণে মনঃক্ষোভ ও ক্ষতি-সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই কাজটী হইতে বিরত থাকিবে। যেখানকার মানুষের ভিতরে সঙ্ঘবদ্ধ সদনুশীলনের চর্চ্চা আছে, সেখানে সেই সকল সদনুষ্ঠানের সহিত নিজেকে সাত্ত্বিক ভাবে যুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিতে পারিলে, উহা সকল দিক দিয়া প্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা আছে। যেখানে সদালোচনা নাই, সেখানে অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া সদালোচনা, সংকীর্ত্তন, সংস্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা সপ্তাহে সপ্তাহে চারিদিকের লোকমনকে সৎপথপ্রধাবিত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যই শুভপ্রদ হইবে। দোকানদারী করিতে ঐ দেশে যাইতেছ বলিয়া দোকানদারই থাকিও না, সদ্‌ভাব, সৎপ্রসঙ্গ, সদনুশীলন, সৎপ্রয়াস ও সদনুষ্ঠানের সুপ্রসারের জন্য নিজেকে একজন বিনীতমনা প্রচারকের পর্য্যায়ে নিয়া ফেলিতে পার কিনা, তাহার চেষ্টা দেখ। ভারতে ইংরেজ, ফরাসী, প্রভৃতিরা বাণিজ্য করিতে আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে কি খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই? মালয়েশিয়ার সর্ব্বত্র প্রতিটি প্রাণী ছিল হিন্দু বা বৌদ্ধ, কিন্তু আরবের ও মালাবারের এবং কিছু কিছু পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান

ব্যবসায়ীরা পণ্য বেচিতে আর কিনিতে আসিয়া সেখানে কি মুসলমান ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যান নাই? অবশ্য সুযোগ পাইলেই ইঁহারা বলপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবসায় করিতে গেলেও যে সেই মানুষ অপরের মধ্যে নিজের বিচারে যাহা শ্রেষ্ঠ ভাব, তাহা প্রচার করিতে পারে এবং করিয়া থাকে, ইহা তাহার দৃষ্টান্ত। অপরের মত ও পথের উপরে আততায়ীর মতন আপতিত হওয়াকে আমি সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করি না কিন্তু তোমাদের গৃহীত মতে ও পথে যদি সত্য, শিব ও সুন্দরের কিছু থাকে, তবে তাহা প্রচারের অধিকার ও প্রয়োজন তোমাদের আছে। অধিকারটা কতকটা আবদারের কথা কিন্তু প্রয়োজনটা তোমার আত্মগঠনের আনুকূল্য বিধানেরই জন্য। নিজের অন্তরের সদ্ভাব-কুসুমগুলি যেখানে গিয়া অর্চ্চনার বিগ্রহ পাইবে, এমন স্থানই জীবিকার্জ্জনের জন্য নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। তবে, চাকুরেদের সম্পর্কে একথা খাটে না।"

চাকুরী-স্থানে কি কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি ঐ পত্রেই লিখিলেন,—

"চাকুরী উপলক্ষ্যে যাহারা নানা স্থানে যাইতে বাধ্য হয়, তাহাদের ত' আর স্থান-নির্ব্বাচন সম্পর্কে নিজেদের কোনও স্বাধীনতা থাকে না। মনিব বা মালিক-পক্ষ যেখানে যাইতে

বলিবেন, সেখানেই ত' যাইতে হইবে। কিন্তু এজন্য নিজেকে অসহায় মনে করা ভুল। তিন সপ্তাহের জন্যই যদি একটী দূরদেশে গিয়া থাক, ঐ তিন সপ্তাহেই তোমাকে চেষ্টা করিতে হইবে, স্বধর্ম্মী বা ভিন্ন ধর্ম্মীদের নিয়া একটা অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়া সদালোচনার, সৎ অনুশীলনের একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া আসা যায় কিনা। অল্প সৎ প্রয়াসও অনেক সময়ে বিরাট পরিণতির সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্র একটা প্রারম্ভ অনেক সময়ে মহতী ঘটনাবলির স্রোতময় তরঙ্গ-রাজির সৃষ্টি করে, স্বল্প সৎকাজও সৎকাজ এবং স্বল্প হইতেই বৃহতের আত্মবিকাশ ঘটে এবং তাহা খুব শ্লাঘারই ব্যাপার। বৃহৎ চেষ্টা যদি হঠাৎ শূন্যে মিলাইয়া যায়, তাহা হইলে লোকে উপহাস করিবার সুযোগ বেশী পায়।"

স্বাধ্যায়ের শক্তি ও তরুণদল

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ইংরেজের দ্বারা ভালভাবে ভারতের রাজদণ্ড ধারণের অব্যবহিত পরেই যে ব্যাপারটী আকস্মিক ভাবে বঙ্গদেশে ব্যাপক বিস্তার ঘটায়, তাহা হইতেছে নানাবিধ ক্লাব, সভা-সমিতি, এসোসিয়েশান প্রভৃতি। এইগুলির মাধ্যমে কিছু কিছু প্রবীণ মন এবং অধিকাংশতঃ যুবক মনগুলি যুগোপযোগী কাজ শুরু করে। তর্ক, বিতর্ক, আলোচনা এবং সর্ব্ববিষয়ে

অবাধ মতপ্রকাশ এই সকল প্রতিষ্ঠানের ছিল সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। এই সকল সভা-সমিতির সভ্যেরা কথাই বলিতেন, কাজ হয়ত করিতেন না। অনেক কথা কহিতে গেলে কাজ করিবার ফুরসৎও ত' হয় না। তোমরাও বর্ত্তমানে ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছ। দশটী যুবককে আনিয়া একত্রিত করিলে, একটি সৎ-প্রস্তাব রাখিলে, সকলে সম্মত হইল কিন্তু তারপরে কল্পনার পরে কল্পনা, পরিকল্পনার পরে পরিকল্পনা, জল্পনার পরে জল্পনা চলিল। সোডাওয়াটারের বোতলের ছিপি ভাঙ্গার অবিরাম শব্দই চলিতে লাগিল। শব্দই তখন ব্রহ্ম হইয়া গেল এবং শব্দ ছাড়া অন্য কোনও কাজ করিবার আর রহিল না। দুই দিন পরে ক্লাবটী ভাঙ্গিয়া গেল বা শূন্যে উড়ান দিল। অনেক বড় বড় কাজ জীবন ভরিয়াই ত' করিতে পারিবে, এখন বাছারা সপ্তাহে একদিন মিলিয়া মাত্র একটি ঘণ্টা সময় সদ্‌গ্রন্থ পাঠ অর্থাৎ স্বাধ্যায়-কার্য্য করিয়া যাও। অনেক অনেক কাজের ফিরিস্তি দেওয়ার মানে কোনও কাজটাই করিয়া উঠিতে না পারা। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণের দ্বারা জ্ঞানীদের চিন্তাকে নিজেদের অন্তরে স্থাপিত কর। সচ্চিন্তার শক্তিতে ভবিষ্যতে অনেক বড় কাজ করিতে পারিবে। বড় বড় কথার মধ্য দিয়া তরুণদিগকে একত্র করিতে না চাহিয়া ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে একত্র করিবার চেষ্টা কর। সদ্‌গ্রন্থের আদান-প্রদান, পঠন-পাঠন,

শ্রবণ-মনন ও তদ্বিষয় নিয়া পারস্পরিক আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে ছোট করিয়া কয়েক জনের সমাবেশকে সার্থকতায় মণ্ডিত করিবার চেষ্টা কর। যে সকল ছেলেরা বখিয়া গিয়াছে, যাহারা চরিত্রভ্রষ্ট ও সন্নীতিচ্যুত হইয়াছে, তাহাদিগকে হঠাৎ করিয়া আনিয়া সংশোধনের গুরু-দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিতে প্রয়াসী হইও না। যে সকল কুসুমে এখনো কীট বসে নাই, তাহাদিগকে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য প্রয়াসী হও সর্ব্বাগ্রে। দুষ্ট, দুশ্চরিত্র, অধম ও পাতকীরা সহজে সৎ-কর্ম্মের আহ্বানে সাড়া দেয় না। তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়াও, তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ না রাখিয়াও, তাহাদের প্রতি উদাসীন এবং অপক্ষপাত থাকিয়া নিজেদের করণীয় কাজ পবিত্র-চরিত্র সৎস্বভাবের কিশোরদের মধ্যে আরম্ভ করিয়া দাও। তাহরা সংখ্যায় কম হইতে পারে কিন্তু লোহার চেয়ে সোণা ওজনেও বেশী ভারী, দামেও বেশী কুলীন, ইহা কে না জানে?"

স্ত্রীশূদ্রাদিতে প্রণবাধিকার এবং চরিত্র-গঠন

"জ্ঞান ও বিদ্যাকে মাত্র একটা শ্রেণীর লোকের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিলে সমাজের উপরে তাহার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহারই দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান হিন্দু-

সমাজ। প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রীকে একমাত্র জাতি-ব্রাহ্মণের মধ্যেই সংরক্ষিত করিয়া রাখার জন্য অন্য কুফলের সহিত এই কুফলটীও ঘটিয়াছে যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-সন্তানই আজ ওঙ্কার-মন্ত্রের সাধন করেন না। করেন ভিন্নতর মন্ত্রের। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই আজ ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থও জানেন না, সাধন করা ত' দূরের কথা। দশ হাজার ব্রাহ্মণের মধ্যে নয় হাজার/নিরানব্বইটী ব্যক্তিই যদি হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং, ঐং, হুং এবং অন্যান্য মন্ত্র জপিয়া জীবনের পরমসিদ্ধি বা আত্মার অনন্ত মুক্তি লাভে প্রত্যাশী হইয়া থাকেন, তবে ওঙ্কার বেচারা আর গায়ত্রী বেচারীর সেবা কে করিবে? হাওড়া-দিল্লী মেইলের অধিকাংশ কামরাই যদি থাকে প্রথম শ্রেণীর এবং তাহা যদি সংরক্ষিত থাকে ইংরাজদের জন্য, আর ইংরাজরা একজনেও যদি ঐ কামরাগুলিতে না চাপিয়া নিজ নিজ পছন্দমত মোটর-কারে চড়িয়া দিল্লী রওনা হন, তাহা হইলেও নেটিভেরা অসম্মানের ভয়েই আর ঐ সকল কামরায় চাপিবে না। ফলে, এতগুলি কামরা সবই হাওড়া হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যাত্রীহীন অবস্থায় পৌঁছিবে। কল্পনা কর দৃশ্যটা। ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা অব্রাহ্মণ-সন্তানকে প্রণব ও গায়ত্রী জপিতে দিবেন না, প্রণব বা গায়ত্রীমন্ত্র শুনিতে দিবেন না, জোর করিয়া শুনিলে বা উচ্চারণ করিলে কাণে তরল সীসক ঢালিয়া দিবেন বা রসনা ছেদন করিয়া নিবেন, ফলে প্রণব ও

গায়ত্রীর সাধনা আস্তে আস্তে জগৎ হইতে লোপ পাইয়া যাইতে থাকিবে, তথাপি বেদপ্রিয় প্রণবপ্রিয় গায়ত্রী-মন্ত্রের একমাত্র স্বত্বাধিকারীদের মনে কোনও উদ্বেগ আসিবে না, ইহা কি এক হৃৎকম্পবিধায়ক অমঙ্গলের সূচক নহে? এই জন্যই আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের হুঙ্কারকে গ্রাহ্য করি নাই। নির্ভয়ে স্ত্রী-শূদ্রে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ-নির্ব্বিশেষে যে-কোনও প্রার্থীকে প্রণবের সাধনা, ব্রহ্মগায়ত্রীতে অধিকার বিতরণ করিয়া যাইতেছি। পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে সময় নষ্ট করিবার মত আমার অবসর নাই। তাঁহারা বিরুদ্ধ প্রচার করুন না, তাহাতে ত' আমি আপত্তি করিতেছি না। আমি আমার কাজ নিঃশব্দে ও নির্ভীক প্রাণে অবিচলিত বিক্রমে ধীরপদক্ষেপে গ্রাম-নগর অরণ্য-প্রান্তর পর্ব্বত-কান্তার ভ্রমিতে ভ্রমিতে করিয়া যাইতে থাকিব,—গায়ের জোরে নহে, মনের জোরে। আমি অনধিকার চর্চ্চা করিতেছি না। যে-কাহাকেও প্রণব বা ব্রহ্মগায়ত্রী-মন্ত্র দান করিবার অধিকার আমি পরমেশ্বরের অপার কৃপায় অর্জ্জন করিয়াছি। নতুবা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের, পরমশ্রদ্ধেয় ভাগবত-ব্যাখ্যাতা-গণের, সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-সংরক্ষকদের বারংবার ব্যূহবদ্ধ আক্রমণের পরে আমি কদাচ সরল মেরুদণ্ডে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারিতাম না। অথচ বিরুদ্ধাচারী, বিরুদ্ধকারী নানা প্রকার আপত্তিজনক ও অসুন্দর ব্যাপার

ঘটাইয়া জনচিত্তে অকারণ বিদ্বেষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টিকারী এই সকল মহাজনের প্রতি আমার দৃষ্টি কদাচ তির্য্যক্ নহে,—আমি তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমার প্রতি বিরুদ্ধভাব-পোষণকারী গুরু, পুরোহিত ও পণ্ডিতেরা যে অন্য ভাবে সমাজের সহস্র হিতসাধন করিয়াছেন, ইহা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। আর, আমি স্বকীয় আধ্যাত্মিক পথের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য লোকের কাণে প্রকাশ্যে বা একান্তে কদাচ বাক্য ব্যয় করি না। আমার আত্মবিশ্বাস আমাকে এ বিষয়ে স্থিতধী করিয়াছে। আমি প্রচার না করিলেও হাজারে হাজারে মানুষ—স্ত্রী ও শূদ্রেরা—আমার নিকটে প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রীর দীক্ষা গ্রহণ করিতে ছুটিয়া আসিবে। যুগধর্ম্মের দাবী পূরণের জন্য ইহা ঘটিবে। এজন্য আমাকে কোনও চেষ্টাই করিতে হইবে না। ইহা আমি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানি বলিয়াই সভাস্থলে সহস্র সহস্র শ্রোতার কর্ণে আমি প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রীতে অধিকারের প্রসঙ্গে একটী বর্ণও কদাচ উচ্চারণ করি না, আমি বলি শুধু একটী বিষয়ে। তাহা হইতেছে চরিত্র-গঠন। সুগঠিত চরিত্রের মানুষ যেই পথে ধাবিত হইবে, সেই পথেই যুগান্তর আনয়ন করিবে, এখন তাহা সামাজিকই হউক, অর্থনৈতিকই হউক, রাজনৈতিকই হউক কিম্বা আধ্যাত্মিকই হউক। পথ যাহার যাহাই হউক, গোড়ায় গলদ ঘটিয়া যাইবে, যদি চরিত্র গঠিত না থাকে।"

রাষ্ট্রভাষা-রূপে সংস্কৃত

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

'ইংরেজ এক সময়ে ভারতবর্ষে তৎকাল-প্রচলিত রাষ্ট্রভাষা ফারসীকে হটাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য একটী ভাষাকে প্রবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে সংস্কৃতের দাবী উঠিয়াছিল। আমি মনে করি যে, সেই সময়েই সংস্কৃতকে সর্ব্বভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার শ্রেষ্ঠ সুযোগটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃতের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা বিশ্বভুবনের সকল দেশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন সহজ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সহজ এবং বিজ্ঞানমুখিনী শিক্ষা ব্যতীত ভারতের উন্নতি হইবে না। জাপানীরা পৃথিবীর নিকটে প্রমাণ রাখিয়াছেন যে, চেষ্টা করিলে অতি অল্প কয়েক বৎসরে নিজ ভাষার এমন অসাধারণ উন্নতি-সাধন করা যায়, যার ফলে ইংরাজী না শিখিয়াও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিদের সমকক্ষতার পর্য্যায়ে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করা সম্ভব। সুতরাং সংস্কৃত তৎকালে রাষ্ট্রভাষা-রূপে গৃহীত হইলে আমরাও এতদিনে নিশ্চয়ই ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা লিখিতে পারিতাম, পড়িতে পারিতাম, শিখিতে ও শিখাইতে পারিতাম। সুতরাং রামমোহনাদি যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ সংস্কৃতের

বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভুলই করিয়াছিলেন, বলিতে হইবে। কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজ ইংরিজি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা-রূপে বিধিবদ্ধ করিবারও আট নয় বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী মনীষীরা প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায় ইংরিজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির পত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন এবং তাহার সুযোগ সুবিধা উপলব্ধিতে আনিয়াছেন। সুতরাং ইংরিজির প্রতি তাঁহাদের পক্ষপাত স্বাভাবিক। কিন্তু সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে গোপনে মানুষের মনে যে যে দুশ্চিন্তাটী কাজ করিতেছিল, তাহা এই যে, সংস্কৃত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়া গেলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ঘরে ঘরে নূতন বিধি-বিধান-দাতা রক্তচক্ষু সমাজ-শাসকের সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাঁহারা দেশব্যাপী কুসংস্কার ও গোঁড়ামির পত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতিগুলির নাভিশ্বাস সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু এই বিষয়ে দুশ্চিন্তা না করিলেও চলিত। কারণ, বিদ্যা সর্ব্বজনের মধ্যে সুপ্রসারিত হইবার সুযোগ পাইলেই কুসংস্কারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, জ্ঞানকে গুটিকতক লোকের কুক্ষিগত করিয়া রাখার ফলেই কুসংস্কার ও কুপ্রথার অত্যাচার বাড়িতে থাকে। সংস্কৃত তখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইলে ভারতের মঙ্গলই হইত কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতশ্রেণীর বদ্ধ গোঁড়ামির ফলে সমগ্র হিন্দু জাতির মনে যে পুঞ্জিত অসন্তোষ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জমিয়া ছিল, তাহাই প্রকারান্তরে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে বিকশিত

হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলিল। তৎকালে যাঁহারা সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেন, সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক চেতনা ছিল বলিয়া মনে করা হয় না। রাজনৈতিক চেতনা থাকিলে তাঁহারা শত, দ্বিশত বা ত্রিশত বৎসরের পরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দলবদ্ধ হইয়া বলিতেন,—'আমরা কুসংস্কার বিদূরণে সহায়তা করিব, এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই আমরা সমগ্র ভারতের ভিতরে ঐক্যবোধ জাগ্রত করিব, সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-ব্রহ্মপুত্র-সিঞ্চিত ভারতের প্রতিটি প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তগুলিকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া নিবার চেষ্টা করিব।' সংস্কৃতের চর্চ্চা প্রধানতঃ ব্যক্তি-সমূহের ব্যক্তিগত ত্যাগ ও অনুশীলনের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া মুঘল-পাঠান-যুগ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাঁহারা একমাত্র (ক) কাহাকে জাতিচ্যুত করিতে হইবে, (খ) কাহার পাতিত্য-বিধান করিতে হইবে, (গ) কাহার শ্রাদ্ধকার্য্য পণ্ড করিতে হইবে,—ইত্যাদি তুচ্ছ কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যে দলবদ্ধ প্রায়ই হইতেন না। সুতরাং 'সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা কর'—এই আবদার আষাঢ়ে গল্পে পরিণত হইল এবং সাধের স্বপ্ন বিনা বাদপ্রতিবাদেই আকাশে মিলাইয়া গেল। রাজা রামমোহনের ইংরাজীর স্বপক্ষে দাবীর পশ্চাতে সূক্ষ্মভাবে ছিল সম্ভবতঃ দুইটী চেতনা, একটী রাজনৈতিক, অপরটী সমাজ-সংস্কারের। নিজে সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত হইলেও বুঝিতে তাঁহার বাকী ছিল না যে,

ইংল্যাণ্ডীয় ভাষা তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ইংল্যাণ্ডীয় সদ্‌গুণেরও আমদানী করিবে। তাহার একটি হইতেছে চিন্তা করিবার এবং কথা কহিবার স্বাধীনতা।"

সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও কাজ করিতে হইবে

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অনেকেই অভিযোগ করে বা সাফাই গাহে যে, কর্ম্মী তাহাদের কম, এই জন্যই তাহারা সুনির্দ্দিষ্ট একটী কাজকে অভিলষিত ভাবে সফলতা দিতে পারিল না। আমি এই সকল কৈফিয়ৎ ও যুক্তিকে ঘাতসহ বলিয়া মনে করি না। তোমাদের কর্ম্মী কম ছিল, ইহা সত্য কিন্তু তোমাদের হাতে সময় ত' কম ছিল না। ছয় মাস আগ হইতেই তোমরা করণীয় কর্ম্মের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, তিন মাস আগ হইতে তোমাদের প্রতিজনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ করিয়া পত্রের পর পত্র দেওয়া হইয়া আসিতেছে। বলিতে কি, আমার অধিকাংশ পয়সাই একমাত্র ডাক-খরচে শেষ হইয়া যায়। তবু তোমারা তোমাদের সংখ্যাল্পতার দোহাই দিবে? দেখ, আমি আমার নিজ দল-বৃদ্ধি করিবার জন্য কদাচ কোনও কৃত্রিম কৌশলের আশ্রয়

নেই না। এমতাবস্থায় তোমাদের সংখ্যা অল্প থাকিবে, এইটাই ত' স্বাভাবিক। অল্প কর্ম্মীরা অনেক কর্ম্মীদের সমবায়ের চেয়েও বেশী কাজ করিল, অল্প কর্ম্মীদের সেবাও সমাজের গভীরতম প্রদেশে পৌছিল, এইটাই ত' আমি দেখিতে চাহি। সংখ্যাল্পতার কথা ভাবিয়া অত ঘাবড়াইয়া যাইতেছ কেন?"

নবনীনগর (ত্রিপুরা)
১৫ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪২
(২রা অক্টোবর, ১৯৩৫)

শিষ্যের দ্রোহ

শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র সাহা বলিলেন,—বাবা, আমরা আপনার শিষ্য হয়েছি কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করি না। আপনার শিষ্য ব'লে পরিচয় দিয়ে লোকের কাছে সম্মান আহরণ করি কিন্তু চারদিকে যে কোনো সাধু-সন্তের নাম শুনলে তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরি আর তাঁকে আমাদের গুরুর সম্পর্কে নিন্দা শুনাই। আমরা কেউ স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে আপনার কাছে শিষ্য হ'তে আসি, কেউ বা ভক্তির বান ডাকিয়ে অশ্রুজলে চরণ সিক্ত ক'রে অনিচ্ছুক আপনাকে দীক্ষাদান কত্তে বাধ্য করি; তারপরে আর আপনার দেওয়া সাধন করি না, সাধনের রাস্তা খুঁজি অমুক মঠে, অমুক মন্দিরে, অমুক মহারাজের কাছে বা অমুক শাস্ত্রের অমুক পুঁথিতে। এটার কি কোনো প্রতীকার হয় না বাবা?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোরা এই রকম কর্‌বি ব'লেই ত' আমি তোদের গুরু হয়েছি। তোদের উপরে জমিদারী কর্ব্ব, তোরা সবাই আমার খাস্ তালুকের প্রজা হ'য়ে থাক্‌বি আর বছর বছর টাকার বস্তা পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে আমাকে খুশী কর্ব্বি, তার জন্যই কি আমি তোদের গুরু হয়েছি? শিষ্য করেছি নিষ্কাম মনে, নিষ্কাম প্রাণে, স্বার্থহীন বুদ্ধিতে। আমার প্রতি একনিষ্ঠ থাকা তোদের ভাল, না মন্দ, সেটা তোরা নিজেরা বুঝে নে। মন্দ হ'লে অবাধে তোরা আমাকে ছেড়ে দূরে চ'লে যাবি, এতে আমার দিক থেকে আপত্তির কিছু নাই। আপত্তিটা মাত্র তখন, যখন দেখ্‌বে, তোরা আমার বিরোধও কর্ব্বি, আবার আমার সঙ্গে লেগেও থাক্‌বি। আমার সঙ্গে যারা বিরোধ কর্ব্বি, তারা যদি আবার আমার কুটীরেই বাস করিস, আমার প্রসাদই খাস, তাহ'লে তোদের অন্ন অর্জ্জন কত্তেই ত' আমার জান কাবার হ'য়ে যাবে। মানুষের সেবা কর্ব্ব কখন? শিষ্যের দ্রোহকে আমি ভয় পাই না। বরং দ্রোহের সঙ্গত কারণ আছে, তবু দ্রোহ করে না, এমন বিবেকহীন জড়পিণ্ডকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করি।

গুরুতে দ্রোহ আসে কেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই মনে তোর এই প্রশ্নটা জাগছে যে, গুরুতে দ্রোহ আসে কেন? কোনো কোনো

সময়ে বা ক্ষেত্রে গুরুরই ব্যক্তিগত ত্রুটির দরুণ শিষ্যের মনে এই অবাঞ্ছিত জিনিষটীর অঙ্কুরোদ্গম হয়। কিন্তু দ্রোহ বা বিদ্বেষ জাগবার প্রধান কারণ শিষ্যের আত্মপ্রস্তুতির অভাব, অন্যতর কারণ হচ্ছে গুরুর কাছে অতিরিক্ত কিছু লাভের প্রত্যাশা। কৈ, দীক্ষা ত' নিলাম, কিন্তু পরীক্ষায় ত' পাশ কর্ল্লাম না! কৈ, অভিলষিতা মেয়েটিকে ত' বিয়ে কত্তে পার্ল্লাম না! কৈ, ডার্বি লটারীর প্রাইজটা ত' আমি পেলাম না! ছেলেটা আমার হাসপাতালে প'ড়ে আছে রোগ-শয্যায়, কত আশা ক'রে দীক্ষা নিলাম, কৈ সে ত' আর সুস্থ হ'য়ে বাড়ী ফিরে এল না, হাসপাতাল, থেকেই সোজা চ'লে গেল যমরাজার বাড়ী। মামলায় জিত্‌ব ভেবেছিলাম, দীক্ষা তারই জন্য ত' নিলাম, কিন্তু কৈ হাইকোর্টে ত' আমারই হার হ'য়ে গেল! দূর ছাই এমন গুরুতে, এমন মুখপোড়া গুরুর মুখ দেখতে নেই। কেউ কেউ আবার ভাবে যে, গুরু দীক্ষা দিয়েছেন, আমি ত' নিজেকে তাঁর অভয় চরণ-তলে চিরতরে সঁপে দিয়েছি। সুতরাং আমার হ'য়ে সাধন-ভজন তিনিই করুন। আমি আবার মন্ত্রজপ, ধ্যান-ধারণা, স্তোত্রপাঠ, কীর্ত্তনাদি কর্ব্ব কেন? এত হাঙ্গামা হবে জান্‌লে কোন্ হতভাগা যেত দীক্ষা নিতে, গুরু কত্তে?—এই ভাবের হাজার কারণ শিষ্যকে গুরুদ্রোহী ক'রে থাকে। গুরু যদি সত্যিকারের গুরু হ'য়ে থাকেন, তবে এই দ্রোহকে নীরবে সহ্য ক'রে যান। অপাত্রে

দীক্ষা দেবার কুফলটুকু থেকে তিনি নিজেকে আর কি ভাবে মুক্ত কত্তে পারেন, বল ত'!

কুশল কর্ম্মের শুভফল

শ্রীযুক্ত হরিবল চক্রবর্ত্তী মহাশয় উকিল-সভার সভাপতি মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে আসিয়াছেন নবীনগর সাবরেজেষ্ট্রী অফিসের সাবরেজিষ্ট্রার জনৈক প্রৌঢ় মুসলমান ভদ্রলোক।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—আখাউড়ার আমার ভাগিনেয়েরা সবাই আপনার শিষ্য। আমি অনেক বছর আগে ওদের দেখেই প্রথম আপনার প্রতি অনুরাগ পোষণ কত্তে অনুপ্রাণিত হয়েছি। সম্প্রতি এখানে স্থানীয় ঘটনাগুলির মধ্যে এমন অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছে, যার ফলে শহরে অনেকেই বারংবার আপনার নাম উচ্চারণ কচ্ছেন।

সাবরেজিষ্ট্রার সাহেব বলিলেন,—একদা আমি কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসছিলাম ট্রেণে। ঐ ট্রেণে আপনি একই কামরায় ছিলেন। কুমিল্লা থেকে শুরু ক'রে আখাউড়া পর্য্যন্ত আমি প্রতিটি ষ্টেশানে চৌদ্দ পনের ষোল আঠার বৎসর বয়সের যুবকদের দেখেছি দলে দলে আপনাকে দেখ্‌তে আস্‌তে। আর আপনি একটী দুটী কথা ব'লেই প্রত্যেককে যেন এক নবজীবনে উত্তীর্ণ ক'রে দিচ্ছেন। সেদিন থেকেই

আমি আপনার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ জান্‌বার জন্য আগ্রহী ছিলাম। নবীনগর এসে চক্রবর্ত্তী মশায়ের সঙ্গে হ'ল পরিচয়। তখন অনেক বিষয় জানলুম। আপনি এই হাজার হাজার ছেলের ভিতরে উদ্দীপনা জাগান কি ক'রে? আপনার মুখের সামান্য সামান্য কথার ভিতরে এত শক্তি আসে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি সাধারণ মানুষ। মানুষ মাত্রেরই সমতায় বিশ্বাস করি। আমি ওদের একজনের চেয়েও এককণা বড় নই, এই ধারণা নিয়েই আমি ওদের কুশল সাধনের জন্য দুচারটা কথা বলি। ওরা যে ব্যাকুল হ'য়ে আমার কাছে আসে, সেটা যৎসামান্য কুশল-কর্ম্মেরই শুভফল। আমার কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই, আমি কোনও আশ্চর্য্যজনক প্রতিশ্রুতিও কাউকে দিতে পারি না। ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত কত্তে অক্ষম ওদের মতনই আমি সাধারণ একটী মানুষ। এই বোধটুকুই আমার শক্তি, এই বোধটুকুই আমার মূলধন।

আমার ঈশ্বর ও তোমার ঈশ্বর এক

সাবরেজিষ্ট্রার সাহেব চলিয়া গেলে উকিল বাবু বলিলেন,—মুসলমানরাও আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বা

ভালবাসেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মুসলমান বা খ্রীষ্টানের সমাজ আমার সমাজ থেকে আলাদা হ'তে পারে, তাঁদের ধর্ম্মমত থেকে আমার ধর্ম্মমত আলাদা হ'তে পারে কিন্তু তাঁদের ঈশ্বর আর আমার ঈশ্বর দুই নন, তিনি এক। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁদের ধারণা আর আমার ধারণা, ঈশ্বর-সাধন সম্পর্কে তাঁদের রীতিনীতি আর আমার রীতিনীতি পৃথক্ হ'তে পারে, কিন্তু যাঁকে নিয়ে এই বিভিন্ন ধারণা আর যাঁর কাছে পৌঁছুবার জন্য এই বিচিত্র রকমের পৃথক্ রীতিনীতি, সেই অসীম অনাদি পরমেশ্বর কখনো দুই নন, তিনি এক। এই সত্যে আমি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং আমাকে দ্বেষ করার কোনো সঙ্গত কারণ ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী কারো আছে ব'লে আমি মনে করি না।

ভারতে হিন্দু ও মুসলমান

উকিল বাবু বলিলেন,—দিনের পর দিন ভারতে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘট্‌ছে। হিন্দুর সংখ্যা ক'মে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যাপারটা আসলে ধর্ম্মনীতির ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণই অর্থনৈতিক। অন্ততঃ বঙ্গদেশের কথা এই বলা চলে যে, দরিদ্র মুসলমানেরা মধ্যবিত্ত হিন্দুর অবস্থায় উঠতে চায়, আর মধ্যবিত্ত হিন্দুরা

দরিদ্র মুসলমানদের মতন লাঙ্গলের মুঠি হাতে ধ'রে নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জন কত্তে চায় না, বরং লজ্জা বোধ করে। মুসলমান গরু পাল্‌বে, হিন্দু তার দুধ খাবে। মুসলমান ধান, পাট, শাকশব্জি উৎপাদন কর্ব্বে, হিন্দু হয় তাতে মুনাফা লুটবে, নয় বেশী পয়সা খরচ ক'রে বিনা শ্রমে দিব্যি তা' পেট ভ'রে খাবে। এই বৈষম্য প্রকৃতি-দেবী সহ্য করেন না। অতএব বাহ্যত ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানরা একত্র হবার চেষ্টা করলেও আসল প্রেরণা অর্থনৈতিক। একদা দলে দলে মধ্যবিত্ত মুসলমানের আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা সাম্প্রদায়িক ভাব-বিবর্জ্জিত আন্দোলন ক'রে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও কর্ব্বে। কিন্তু ইংরেজের প্রখরবুদ্ধি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িকতা মিটাবার নাম ক'রে উভয় পক্ষেরই দ্বারা এমন বিভ্রান্তিকর ঘটনা সব ঘটানো হ'তে পারে, যাতে দেশটা ভেঙ্গে একদিন টুকরো টুকরোও হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধিতে হিন্দুর আতঙ্কিত হবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। প্রয়োজন মনুষ্যত্ব-বৃদ্ধির। এখন ত' দেশে হিন্দুই সংখ্যাধিক জাতি কিন্তু তারা মানুষ ত'? মানুষের মত জীবন-যাপনে তারা আগ্রহী ত'? মানুষের পক্ষে যা সম্মানজনক, এমন আদর্শ নিয়ে চল্‌তে তারা প্রস্তুত ত'? হিন্দুদের সংখ্যায় বাড়ার কোনো প্রয়োজন দেখি না। প্রয়োজন দেখ্‌তে পাচ্ছি হিন্দুদের মানুষ হওয়ার। নিজে মানুষ হ'তে

গেলে প্রতিবেশীকেও মানুষ হ'তে সাহায্য কত্তে হয়। হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলের ভিতরে মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রচারের প্রয়োজনই আজ সব চেয়ে বেশী। কাজটা বৃহৎ কিন্তু মহৎ। বৃহৎ ব'লে কাজটা করা কঠিন কিন্তু মহৎ ব'লেই কাজটা আমাদের করাই প্রয়োজন। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে অনেকেই এখন এ ভাবে চিন্তা কচ্ছেন। অতীতের ইতিহাস ঘাটতে বস্‌লে অপ্রীতিবর্দ্ধক উপকরণই বেশী পরিমাণে চোখের সামনে পড়ে। আবার, অতীতকে একেবারে ভুলে যাওয়াও জীবিত জাতির পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বিধাতা চির-শত্রুতার দুঃখ ভোগ করার জন্যই এই দুটা জাতিকে সৃষ্টি করেন নি। অতএব আমি বিশ্বাস করি, নানা বিচিত্র ঘটনাবলির তরঙ্গাভিঘাতের পরে, নানা আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে আপাত-দৃশ্যমান বৈরভাব দূর হ'য়ে গিয়ে একদা শান্তি, তৃপ্তি ও মৈত্রী নিশ্চিতই প্রতিষ্ঠিত হবে। মানসিক সুস্থতার জন্যও সেটা প্রয়োজন। কেবল বিদ্বেষ, কেবল কলহ যদি একটা দেশে স্থায়ী ভাবে চলতে থাকে, তাহ'লে নূতন প্রজন্মের মানুষগুলি বিকৃত ধ্যান-ধারণা নিয়ে প্রাদুর্ভূত হবে দেশের বুকে, যেন শ্মাশান-প্রেতের তাণ্ডব নিয়ে এবং পিছনে পিছনে মড়ক, হত্যা ও দুর্ভিক্ষকে সঙ্গে নিয়ে। হিংসায় পৃথিবীতল আচ্ছন্ন হ'য়ে যাবে এবং হিংসার চর্চ্চা কত্তে কত্তে মানুষ পুনরায় অতি প্রাচীন কালের পশুদের স্তরে এসে নামবে।

প্রত্যেক মানুষে নারায়ণ বিরাজ করেন, এই উপলব্ধিতে পৌঁছুতে মানুষকে লক্ষ কোটি বৎসরের যাত্রাপথ অতিক্রম কত্তে হয়েছে। সেই যাত্রা পরম সাম্যের মধুময় লক্ষ্যে না পৌঁছে একেবারে আদিম নিষ্ঠুরতার জান্তব স্তরে নিয়ে আমাদের ফেল্‌বে। তাই মিলনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা সুদূর মনে হ'লেও এই স্বপ্নই আমাদের প্রতিজনের দেখ্‌তে হবে।

গণিকার দীক্ষা

উকিল বাবু প্রস্থান করিলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—এখন আমি আসল কথাটি বলি। নবীনগরের দুইটী গণিকা আপনার নিকট দীক্ষা নিতে চায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গণিকা! তা কেমন ক'রে হয়?

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—তারা তাদের জীবনোপায়ের অন্য পথ খুঁজে নেবে। এই কুপথে তারা আর চল্‌বে না। আপনাকেই এদের দীক্ষা দিতে হবে। আপনার মন্ত্রে শক্তি আছে, তেজ আছে, সর্ব্বপাপ-বিনাশকারী ব্রহ্মাগ্নি আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই রকম একটা প্রস্তাব আমার কাছে নিয়ে আসবার বুদ্ধিটা আপনার কি ক'রে এল, বলুন ত'!

শ্রীযুক্ত হরিবল চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-তলে লুণ্ঠিত

হইয়া বলিলেন,—ঠাকুর, আমাদের সঙ্গে আর ছলনা ক'রো না। তুমিই না ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলষ্টেশানে গভীর রজনীতে এক একাকিনী নারীকে দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে বিপন্না দেখে তাকে অভয় দানের জন্য দীক্ষা দিয়েছিলে। তুমিই না তোমার নবীনগরে শ্মশান দেখতে যাওয়ার দিন তাকে দর্শন দিয়েছিলে এবং সে তোমাকে হঠাৎ দেখে চিন্‌তে না পারলেও অন্তরের শিহরণ দিয়ে ঘরে এসে অনেক চিন্তা ক'রে বুঝতে পেরেছিল যে, তুমিই তিনি, সে রমণী আর নবীনগরে নাই, সে তার কুজীবিকা পরিত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনের পথে পথে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে খায় আর বলে "জয়গুরু, তোমার জয় হোক্।" একটি মেয়ের দৃষ্টান্ত পতিতাপল্লীতে যেন নূতন জগতের সৃষ্টি করেছে। এরা সবাই নিজ নিজ জীবিকা পরিত্যাগ কত্তে চায়, কিন্তু পথ নাই।

এমন সময়ে ওস্তাদ আহম্মদ আলি খাঁ আসিলেন। আভূমি প্রণত হইয়া বলিলেন,—প্রভো, আপনার রচনা-করা গানের স্বরলিপি পেলাম ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর নিকট মাইহার থেকে। সেই গানটী আগে শুনাব

প্রাণমন মাতাইয়া সুকণ্ঠ ওস্তাদ আহম্মদ আলি গাহিলেন,—"ভয় ভাবনা নাই মা আর................দূর হয়েছে অন্ধকার।"

কথায় কথায় আহম্মদ আলি ঐ দুইটী দীক্ষাপ্রার্থিনীর

কথা তুলিলেন। বলিলেন,—আমার কাছে যারা গান শিখিতে আসে, তাদের মধ্যে এ দুজন খুবই ঈশ্বরবিশ্বাসী। কোন্ পাপে যে গাণিক্যের নরকে এসে পড়েছে, আল্লা জানেন। এ দুটীকে আপনার দীক্ষা দিতেই হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কয়েকটী সর্ত্তে। আজ থেকেই পাপ-জীবিকা ত্যাগ কর্ত্তে হবে, কাল কৃষ্ণনগরে গিয়ে বেলা দশটায় দীক্ষা-গৃহে প্রবেশ কর্ব্বে, যেতে বা আসতে পথে কোথাও আত্ম-পরিচয় দিতে পার্ব্বে না, কোনও কুকার্য্যের সঙ্গীকে সঙ্গে নিতে পার্ব্বে না। জীবনে আর নবীনগর ফিরে আসবে না।

ওস্তাদ আহম্মদ আলি বলিলেন,—এরা সানন্দে প্রস্তুত।

কৃষ্ণনগর (ত্রিপুরা)

১৬ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

(৩রা অক্টোবর, ১৯৩৫)

শ্রীশ্রীবাবামণি কৃষ্ণনগর আসিয়াছেন। ভক্তিমতী ভগিনী কুসুম কুমারী রায়ের বাড়ীতে উঠিয়াছেন।

পৌছিবার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই একখানা নৌকায় করিয়া দুইটী সুপরিচ্ছন্ন চেহারার মহিলা আসিয়া পৌছিলেন। শ্রীযুক্ত কুসুম কুমারী রায় জিজ্ঞাসিলেন,—আপনারা কে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষার ঘরে নিয়ে যাও। বসিয়ে দাও। এখনি দীক্ষা হবে এবং এঁরা এখনি চ'লে যাবেন। তদ্রূপ ব্যবস্থাই হইল।

দীক্ষার গৃহে পৌছিয়া দুইটী মেয়েই খুব কাঁদিতে লাগিল শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ কাঁদার দিন নয়, আজ আনন্দ করার দিন। তোমাদের অতীত ইতিহাস আমাকে কিছুই বলতে হবে না। তোমাদের সমস্ত পাপ, অপরাধ, অন্যায় আজ আমি গ্রহণ কচ্ছি। কিন্তু প্রস্তুত হ'য়েই এসেছ ত'?

তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন। ভিন্ন নৌকায় জিনিষ-পত্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে। দীক্ষার পরেই তাঁরা সোজা ষ্টেশান রওনা হইবেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছিতে কমপক্ষে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগিবে।

দীক্ষা হইল। মহিলারা চলিয়া গেলেন। শ্রীমতী কুসুম কুমারী রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, এঁরা কে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এরা মহাভাগ্যবতী নারী। কিন্তু এদের অন্য পরিচয় ত' আমি জানি না। আমার নাম শুনে এখানে দীক্ষা নিতে এসেছেন, দীক্ষা নিয়ে নিজের স্থানে চ'লে গেলেন।

গুরু

অপরাহ্নে একটী জনসভা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন,—গুরু হবেন মুক্তিদাতা, বন্ধনত্রাতা, তিনি তোমাদের বন্ধন বাড়াবেন না, বন্ধন কমাবেন, আসক্তি কমাবেন, তোমাদের প্রাণমনকে কাম-লোভ-অসূয়া প্রভৃতি অসদ্বৃত্তি থেকে দূরে থাকবার সামর্থ্য

দেবেন। গুরুদেবদের নামে তোমাদের অঞ্চলে বড়ই কুৎসা। তাঁরা নাকি শিষ্যার নারীত্বে কলঙ্ক-লেপন করেন, তাঁরা নাকি চরিত্রবান্‌কে ধর্ম্মের নামে অধঃপথে নিয়ে যান। না, কচাদ তা' গুরুর কাজ নয়। গুরু সেজে যে লঘুর কাজ করে, তাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করার অধিকার শিষ্যের আছে। যাঁর সংস্পর্শে এলে মন উচ্চ ভাবনায়, দিব্য প্রেরণায় ভ'রে যায়, তিনিই গুরু হবার উপযুক্ত।

কৃষ্ণনগর (ত্রিপুরা)
১৭ই আশ্বিন, শুক্রবার ১৩৪২
(৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৫)

ইন্দ্রিয়-তাড়না শত্রু নহে

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ইন্দ্রিয়-তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িতেছি। উপায় কি বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইন্দ্রিয়-তাড়নাকে তুমি শত্রু ব'লে মনে কচ্ছ কেন? তোমার ভিতরে যে ইন্দ্রিয়-তাড়না আছে, তা' থেকে তুমি প্রমাণ পাচ্ছ যে, তোমার ভিতরে শক্তির অফুরন্ত উৎস আছে। সুপ্তশক্তি তোমাতে রয়েছে ব'লেই ইন্দ্রিয়-তাড়না রূপে সে নিজের জানানি দিয়ে যায়। সে প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাকে বল্‌তে চায় যে, সে তোমাকে ক্রীতদাসে পরিণত কর্ত্তে আসে নি, এসেছে এই কথাটুকু বুঝিয়ে দিতে যে, তোমার ভিতরে অফুরন্ত শক্তির নিঃসীম

উৎস রয়েছে, সেই উৎসের সঙ্গে তোমার পরিচয় স্থাপন প্রয়োজন। কেননা, তার পরিচয় পেলেই তুমি নিজের সঠিক মূল্য ও ওজন বুঝতে পার্ব্বে এবং তখন তুমি জগতে এমন অনেক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপন ক'রে যাবে, যা' ঠিক এই মুহূর্ত্তে তুমি কল্পনাও কর্ত্তে পার না। ইন্দ্রিয়-তাড়না তোমার শত্রু না। সে তোমার সংবাদদাতা। তোমার ভিতরের শক্তির যে খবর আজ পর্য্যন্ত তুমি জান না, সেই খবর সে তোমাকে দিতে এসেছে। মনে কর, তোমার একটা ঘোড়া আছে। সেটা গর্দ্দভও নয়, খচ্চরও নয়, আসল ঘোড়া, হয় অষ্ট্রেলিয়ার আমদানী নয় আরবের। এই তেজস্বী অশ্বকে তুমি যদি বাগ মানিয়ে রাখতে পার, তাহ'লে সে তোমাকে অতীব দ্রুত-বেগে দেশ-দেশান্তরের দিগ্বিজয় করিয়ে আনতে পারে। আর যদি তাকে তুমি নিজের আয়ত্তে না রাখতে পার, তবে সে তোমাকে পিঠ ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেবে এবং তীক্ষ্ণ-ধার ক্ষুর দিয়ে আঘাত ক'রে প্রাণে বধ করবে। তোমার ইন্দ্রিয়-তাড়নাকে তেমন একটা বস্তু ব'লে জান্‌বে এবং শারীরিক কারণে বা মানসিক চাঞ্চল্য বশত যদি সেই তাড়না তোমাতে জেগে উঠে খুব দাপাদাপি আরম্ভ করে, তবে তাকে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে মুখে লাগাম পরিয়ে দিতে হবে। রেলের বা ষ্টীমারের ষ্টীম-এঞ্জিন ত' দেখেছ। কয়লা

পুড়ে জলকে ফুটিয়ে নিরন্তর বাষ্প তৈরী করা হচ্ছে। সেই বাষ্পকে শক্ত হাতে কাবু ক'রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যেতে বাধ্য করার সঙ্গে সঙ্গে হাজার মণ ওজনের পিষ্টনগুলি চলতে আরম্ভ করে এবং তার ফলে গাড়ীর বা জাহাজের চাকাগুলি ঘুরতে থাকে। এত কাণ্ড যে বয়লারের ভিতরে হচ্ছে, যাত্রীরা কজন তা' জান্‌তে পাচ্ছে? তোমার ইন্দ্রিয়-তাড়নাকে ঠিক্ তেমনি জান্‌বে। বশ ক'রে নিতে পার্‌লেই সে তোমার বন্ধু হ'ল, বশ না কত্তে পারলে সে তোমার ঘাড় মট্‌কাবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়-তাড়না এলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাবু করার চেষ্টায় নেমে পড়। তুমি ভিতরে ভিতরে শক্তিধর ব'লে সে তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ কত্তে পেরেছে। তুমি শক্তিহীন জড় পদার্থ হ'লে সে তোমার কাছে ধরাই দিতে পারত না। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা যে ঘট্‌ছে, এটা স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ, অস্বাস্থ্যের নয়। কত জন ত' হাজার চেষ্টা ক'রেও ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত কত্তে পারে না, তারা ক্লীব, তারা নপুংসক। তোমার যে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়, এটা কোনও কুলক্ষণ নয়, তোমার ভিতরের শক্তিমত্তারই লক্ষণ। কিন্তু প্রকৃত শক্তিকে তুমি চিনতে পারবে, জানতে পারবে, ব্যবহারে আনতে পারবে মাত্র তখন, যখন তুমি ইন্দ্রিয়-পীড়নকে নিজের পদানত কত্তে পেরেছ।

কামোচ্ছ্বাসে কামজয়ের চেষ্টা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লিঙ্গোচ্ছ্বাস বা যৌনোচ্ছ্বাস পুরুষ বা স্ত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্যের এক এক অবস্থায় একেবারে সাধারণ। যেমন, অনেক সময়ে অকারণেও তোমার শরীরে শিহরণ হ'তে পারে, কম্পন হ'তে পারে। কিন্তু লিঙ্গোচ্ছ্বাস বা যৌনোচ্ছ্বাস যখনি শরীরে উপলব্ধ হ'ল, তখনি সঙ্গে সঙ্গে যদি এই উচ্ছ্বাসের কারণটাকে খুঁজতে মনে মনে লেগে যাও, তাহ'লে এই উচ্ছ্বাস আপনা আপনি ক'মে যাবে। একটী বালককে বুকে জড়িয়ে ধরলেও অনেকের এই উচ্ছ্বাসটুকু হয়। এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। এটা ব্যাধি। এই অবস্থায় পড়লে সঙ্কল্প কত্তে হয় যে, অন্য যে-ভাবে পারি, বালক বা বালিকাকে আদর কর্ব্ব কিন্তু আলিঙ্গন ক'রে নয়। আমাদের দেশে আলিঙ্গন ব্যাপারটা খুবই সীমাবদ্ধ ভাবে ব্যবহৃত হয়। চুম্বনও তদ্রূপ। একটী ছোট্ট মেয়েকে চুমো খেয়েছ ত' সঙ্গে সঙ্গে তোমার লিঙ্গোচ্ছ্বাস উপস্থিত হ'ল। এটাও খুব একটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। কিন্তু এটা অনেক স্থলে হয় ব'লেই আমাদের দেশে চুম্বন-কার্য্যটী অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে চালু আছে। আপাততঃ বা বাহ্যতঃ যাকে অনিষ্টকারিতাবিহীন একটী নিরাপদ স্নেহ প্রকাশের ভঙ্গিমা ব'লে মনে করা হয়, একজনের পক্ষে হয়ত ঠিক সেই সাধারণ আচরণটাই নিদারুণ লিঙ্গোচ্ছ্বাস বা যৌনোচ্ছ্বাসের হেতু-স্বরূপ হ'ল। এই সকল

অবস্থায় বাহিরের লোকের পক্ষে এর প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি যখন জানছ যে, এরূপ একটী তথাকথিত শিষ্ট আচরণেও তোমার ইন্দ্রিয়গত উচ্ছ্বাসের বা মনোবিকারের সৃষ্টি হ'তে পারে, তখন তোমার পক্ষে ঐ নিরপরাধ আচরণগুলিও বর্জ্জন ক'রে চলা সঙ্গত। আমি ত' লক্ষ লক্ষ লোককে ভালবাসি, ভালবাসি প্রাণ-ঢালা প্রেম দিয়ে কিন্তু আমি যে একটী মানুষকে, এমন কি শিশুকেও, আলিঙ্গন দেই না বা চুম্বন করি না, এতে আমার ভালবাসা ত' কারো উপর থেকে ক'মে যায় নি। প্রকৃত প্রেমিকের ভালবাসা তার চোখের স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু দিয়েই সুপ্রচুর পরিমাণে নির্গত ও নিঃসৃত হ'তে পারে। সেই ভালবাসা দেখাবার জন্য কথার ফুলঝুরি ছুটাবার বা শারীর-ব্যবহারের বাড়াবাড়ির কোনো প্রয়োজন নেই। স্নেহের ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকার উচ্ছ্বাসই বর্জ্জনীয়, অবশ্য যদি তোমার বর্জ্জন ক'রে চলার সামর্থ্য থাকে। লিঙ্গোচ্ছ্বাস বা যৌনোচ্ছ্বাস বা মনের আত্যন্তিক ঝড়-তুফানের মতন বিপর্য্যয়কর লালসাতুর অবস্থা সবই তোমার অন্তর্নিহিত এক মহাশক্তিরই ব্যারোমিটার বা পরিচায়ক যন্ত্র-বিশেষ কিন্তু তোমাকে নত না হ'য়ে সোজা মেরুদণ্ডে উন্নত-মস্তকে তাকিয়ে এই ব্যারোমিটারের পারার লিখন দেখতে হবে এবং ঠিক তদনুরূপ ভাবে যোগ্যতার সঙ্গে জীবন-তরণী নিরাপদে চালিয়ে যেতে হবে। তোমার কাছে কাম বা কামাশ্রিত ভাব বা কামপ্রেরিত

আচরণগুলি এসে তোমাকে বারংবার শুধু ব'লে দিচ্ছে যে, তুমি সাবধান থাক, সতর্ক হও, দৃঢ় হও এবং সর্ব্বশক্তি দিয়ে জয়ী হও।

গুরুবাদ ও ব্যভিচার

ভিন্ন গ্রাম হইতে একটী মহিলা আসিয়াছেন। তিনি কোনও গুরু-গোঁসাই এর শিষ্যা। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব নিজ শিষ্যাদিগকে এমন সব উপদেশ দিতেছেন, যাহা কাহারও কাহারও চিত্তবিভ্রম জন্মাইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎপরে বলিলেন,—পুরুষ-গুরু যদি স্ত্রী-শিষ্যাকে বলেন, দেখ, কলিতে ত' আর শ্রীকৃষ্ণ নেই, তিনি দ্বাপরে ছিলেন। কলিতে শ্রীকৃষ্ণই গুরু হ'য়ে তোমাদের উদ্ধার কত্তে এসেছেন। সেই গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণে ব্রজগোপীদের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার অন্যাভিলাষ ত্যাগ ক'রে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর এবং গৃহ-পরিজনদের সকলের সাথে আত্মীয়তা বর্জ্জন ক'রে হ'লেও একমাত্র গুরুদেবের সহিতই সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, ঘনিষ্ঠতা ও দৈহিক-মানসিক আদান-প্রদান শুরু কর, তবে যুক্তিপথচারী মানুষ কি ভাবে তা গ্রহণ কর্ব্বে, সেটা মানুষের নিজের যোগ্যতার উপরে নির্ভর করে। উল্লিখিত উপদেশগুলি নিলে যে খুব ভাল ভাবে গ্রহণ করা যায় না, ত' নয়, কিন্তু

ঠিক ঐ উপদেশগুলিই মন্দভাবে নিয়ে যদি কেউ অভ্রান্ত বেদবাক্যের মতন পালন ক'রে যায়, তবে তার মধ্যে যে সমাজ-বিপর্য্যয়কর দুর্ঘটনা সৃষ্টির সুযোগ যথেষ্ট রয়েছে, এই কথাটাও অস্বীকার করার উপায় দেখি না। আমার কথা এই যে, গুরুই হউন আর শ্রীকৃষ্ণই হউন, পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করার অধিকার জগতে কারো নেই আর যেই নারী গুরুকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ক'রে বা শ্রীকৃষ্ণকে গুরু জ্ঞান ক'রে স্বীয় স্বামী ব্যতীত অন্যের সঙ্গে অবৈধ ঘনিষ্ঠতা করে, সে পতিতা বা গণিকা মাত্র, সাধিকা ব'লে তাকে পূজা করার রাস্তা খোলা নেই। গুরুদেবের শিক্ষা-দানের কুফলে সমাজ-মধ্যে যদি স্ত্রীপুরুষ-ঘটিত ব্যভিচারের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় কোথাও থাকে, তবে সৎলোকদের কর্ত্তব্য সেই স্থান অচিরে পরিত্যাগ ক'রে দূরে স'রে আসা।

স্বামীস্ত্রীতে অভেদ-ভাব আনয়নের উপায়

অপর এক দম্পতী আসিয়া তাঁহাদের মনের ক্লেশের কথা জানাইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীর পক্ষে অন্য একটী পুরুষ দেখে তাকে তাঁর স্বামীর মতন দেখা যায় ব'লে ভাব্‌তে থাকা এক মারাত্মক মানসিক দুরবস্থা। এই অবস্থা কারো এলে তাকে দীর্ঘকাল এই অবস্থার চর্চ্চা কত্তে দেওয়া

ঠিক নয়। স্বামীর কর্ত্তব্য এই অবস্থায় স্ত্রীকে নিয়ে নানা দেশে চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখ্‌তে বেরিয়ে যাওয়া এবং নানা তীর্থে ধর্ম্মকার্য্যাদি ক'রে মনকে নূতন খোরাকী দেবার চেষ্টা করা। স্বামী স্বামীই। সেই অবস্থাতে আর একজন মানুষকে স্বামীর মতন ভাবতে বসা ক্ষতিকর। এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য কেউ কেউ শিবমূর্ত্তিতে, কেউ কেউ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে, কেউ কেউ ভক্ত-প্রহ্লাদের মূর্ত্তিতে, কেউ কেউ ঋষি-মহর্ষিদের মূর্ত্তিতে নিজের স্বামীর মূর্ত্তির অবস্থিতি চিন্তা কত্তে কত্তে আস্তে আস্তে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে, এটা সবরাচর দেখা যায়। কিন্তু তার চেয়েও ভাল উপায় হচ্ছে, স্ত্রী যদি নিজের সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটাকে নিজ পূর্ণ অস্তিত্বের সহিত স্বামীর সম্পূর্ণ মূর্ত্তির ভিতরে অভিন্ন ভাবে দেখ্‌তে চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামী যদি আবার স্ত্রীর সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটাকে তাঁর পূর্ণ অস্তিত্ব সমেত নিজের সম্পূর্ণ মূর্ত্তির ভিতরে অভিন্ন ভাবে দেখতে প্রয়াস পায়। স্তন-লিঙ্গাদি ক্ষুদ্র কতিপয় প্রত্যঙ্গ ব্যতীত বাকী সর্ব্বাঙ্গের অভিন্নত্ব অনায়াসেই প্রতীতিতে এসে যায় এবং কিছুকাল অভ্যাসের পরে স্তন-পার্থক্য বা যৌনপার্থক্য সম্পর্কিত বোধও দূর হ'য়ে যায়। তখন স্বামীতে স্ত্রীর এবং স্ত্রীতে স্বামীর এমন অপার্থিব অনুরাগ এসে যায়, যার সামনে আর পৃথিবীর অন্য কোনও অভিলষিত ব্যক্তির দাঁড়াবার ঠাঁইটুকুও থাকে না। স্বামী ও স্ত্রীতে অভেদ ভাব এলেই সকল দিকের শান্তি। তার উপায় ত' স্পষ্ট ব'লে দিলাম।

দম্পতীর স্বপ্ন-সমস্যা

আর এক দম্পতী আসিয়াছেন তাঁহাদের নিদারুণ স্বপ্ন-সমস্যা নিয়া। তাঁহাদের যাবতীয় বক্তব্য ধীর ভাবে শুনিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী ঘুমুতে যাচ্ছে কামনাবাসনাহীন স্নিগ্ধ মন নিয়ে কিন্তু স্বপ্ন দেখ্‌লে রমণ-কার্য্যের এবং সেই স্বপ্নে তার রমণসঙ্গিনী হচ্ছে একটি পরনারী, যাকে অতীতে কখনো সে দেখেনি। আবার স্ত্রী ঘুমুতে যাচ্ছে, নিঃসন্দিগ্ধ নিরুপদ্রব মন নিয়ে কিন্তু স্বপ্ন দেখ্‌ল ঠিক ঐ একই রকম এবং সে যার সঙ্গে রমণ-রতা, সে তার স্বামী নয়, একটী পরপুরুষ, যাকে অতীতে সে কখনো দেখেনি। এক সঙ্গে দুজনের একই রকম স্বপ্ন-বিকার, প্রায়ই শোনা যায় না। এর কারণ মনের গভীরে অবস্থিত। দু-পাঁচ মিনিটে আমি সে কারণ অনুসন্ধান ক'রে বের কত্তে পার্ব্ব না। কিন্তু প্রতীকারের পথ ব'লে দিচ্ছি তুমি বাবা দিবারাত্রি চিন্তা কত্তে থাক যে, পৃথিবীর কত নারী, সব নারী তোমার এই স্ত্রীর মধ্যে বিরাজ কচ্ছে আর তোমার মা বা মাতৃস্থানীয়ারা নিয়ত এই নারীকে বিশ্বপালয়িত্রী হবার জন্য আশীর্ব্বাদ কচ্ছেন, অনন্ত উর্দ্ধে থেকে। তুমি মা দিবারাত্রি ধ্যান জমাতে থাক যে, পৃথিবীর যত পুরুষ, সব পুরুষ এসে তোমার এই স্বামীর ভিতরে বিরাজিত এবং তোমার পিতা বা পিতৃস্থানীয় সকলে নিয়ত এই পুরুষকে বিশ্বপালক হবার

জন্য আশীর্ব্বাদ কচ্ছেন অনন্ত উর্দ্ধলোক থেকে। তুমি বাবা ভাবতে থাক, তোমার স্ত্রী ব্যতীত জগতে আর কেউ নারী নেই, ইনিই অনন্যা ও অদ্বিতীয়া। তুমি মা ভাবতে থাক যে, তোমার স্বামী ব্যতীত জগতে আর কেউ পুরুষ নেই। পুরুষ ব'লে যাদের মনে হচ্ছে, তারা ছদ্মবেশী মাত্র, তারা প্রত্যেকে প্রকৃত প্রস্তাবে নারী মাত্র, তোমার স্বামীই এই জগতে একমাত্র পুরুষ, তিনি একেশ্বর এবং তুলনাহীন।

উপদেশগুলি দম্পতী বারংবার শুনিতে চাহিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বারংবার বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন। শেষে উভয়ে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলেন,—বাবামণি, আমাদের দীক্ষা দেবেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষা পেলেই আমার উপদেশ তোমাদের পক্ষে বেদবাক্য হবে। হাঁ মা, হাঁ বাবা, দীক্ষা নিব। চল দীক্ষার ঘরে।

আকুবপুর (রাত্রিকাল)
১৭ই আশ্বিন, শুক্রবার ১৩৪২
(৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৫)

কৃপাদাসের পান্তভাত

শ্রীশ্রীবাবামণি রাত্রি আট ঘটিকায় নৌকাযোগে আকুবপুর পৌঁছিয়াছেন। নৌকা গ্রামের মধ্যে পৌঁছিতেই শ্রীধীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী ধরিলেন, তখনই তাঁহার গৃহে উঠিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি গরীব ব'লে আমি তোমাকে অবমাননা কর্ব্ব না। তবে যদি আগে থেকে নির্দ্ধারিত হ'য়ে থাকে যে, অন্য কারো বাড়ীতে উঠ্‌তে হবে, তবে তার মনেও কষ্ট দিতে পারি না।

দরদর ধারে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বলিলেন,—দরিদ্রের ঠাকুর তুমি, তার পরিচয় সে দিনই পেয়েছি, যে দিন পথ-পরিক্রমা কর্ত্তে কর্ত্তে বল্‌লে, ধীরেন এখনি আমি ভিন্ন গ্রামে যাব। ডাক্ সকলকে দেখা ক'রে যাই। বল্‌লাম, ঠাকুর, না খেয়ে যেতে পার্ব্বে না। তুমি বল্‌লে, খাবার সময় নেই, এখনি আমাকে যেতে হবে। রান্নাবাড়া কর্ত্তে কর্ত্তে ত' বেলা দুপুর হ'য়ে যাবে। তুমি বল্‌লে,—না বাবা, দেরী কর্ত্তে পার্ব্ব না। আরো বল্‌লে,—ঘরে পান্ত ভাত নেই? আমি সোৎসাহে বল্‌লাম,—আছে ঠাকুর, আছে। কিন্তু তুমি খাবে পান্ত ভাত? এ যে কল্পনায়ও আনতে পারি নে। তুমি বল্‌লে,—তবে এখনি দাও, আমার দেরী করার অবসর নেই।

চখের জল মুছিতে মুছিতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র (কৃপাদাস) বলিয়া চলিলেন,—দীনদরিদ্রের ঘরে সেই যে তুমি পান্ত ভাত খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলে তোমার অন্তহীন যাত্রাপথে, তোমার সন্তান কৃপাদাসের জীবনে এই একটী মাত্রই গৌরবের জিনিষ আছে।

দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রের গৃহে একটু পদধূলি দিয়াই শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দাসের বাড়ীতে নৌকাযোগে আসিলেন। দেখিলেন,—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক ও তাঁহার স্ত্রী মনোরামা বসিয়া আছেন সারাদিন নিরম্বু উপবাসে। তাঁহাদের গৃহে যাইতেই হইবে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের গৃহে পৌছিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপার কি?

উভয়ে করজোড়ে প্রণতি করিয়া বলিলেন,—আমরা দীর্ঘকালের জন্য সংযম-ব্রত গ্রহণ করতে চাই। এই জন্যই সারাদিন নিরম্বু উপবাস ক'রে আপনার প্রতীক্ষায় ব'সে আছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি আগ্রহী এই দম্পতীকে তিন বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত দান করিলেন এবং বলিলেন,—একদা তোমাদের এই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণের কথা লোকে নিশ্চয়ই জান্‌বে। বাইরে তোমরা নগণ্য হ'লেও ভিতরে তোমরা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, মাধুর্য্যময়, পবিত্র জীবন যাপন ক'রে দেশের মানসিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন সাধন কর্ত্তে থাক। দেশের অন্য হাজার রকমের উপকার করার চেয়েও ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ অধিকতর প্রশংসনীয় কাজ। তোমরা তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের কথা

বাইরে একেবারেই গোপন রাখ্‌বে। পূর্ব্বেও তোমাদের এই বিষয়ে উপদেশ দিয়েছি, প্রেরণা যুগিয়েছি। আমার রহিমপুর আশ্রমে অবস্থান-কালে তোমরা দুজন যে বারংবার আমার কাছে গিয়েছ এই দাম্পত্য-ব্রহ্মচর্য্যে সিদ্ধি অর্জ্জনের উপায়-অন্বেষণে, তার প্রতিদিনকার কথা আমার মনে আছে। আমি তোমাদের নিয়ে গৌরব কত্তে নিশ্চয়ই পারি। দিকে দিকে দম্পতীরা ব্রহ্মচর্য্য-পালনের উপযোগিতাকে উপলব্ধি ক'রে তোমরা দলে দলে এগিয়ে যাও। তোমাদের মনের স্বচ্ছ চিন্তার তরঙ্গ-রাজি দেশে নবজীবনকে ডেকে আন্‌বে।

আকুবপুর (ত্রিপুরা)
১৮ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪২
(৫ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

গ্রামটায় আজ হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। নৌকায় নৌকায় কীর্ত্তনিয়া দল হরিওঁ-কীর্ত্তন করিতে করিতে সমগ্র গ্রাম পরিক্রমণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে কোনও কোনও বাড়ীতে নামিয়া কীর্ত্তনদল বাড়ীর আঙ্গিনায় উদ্দণ্ড নৃত্যে বসুন্ধরা কাঁপাইয়া গাহিতেছেন,— হরিওঁ, হরিওঁ

কুষ্ঠরোগী ও হরিওঁ-কীর্ত্তন

একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বিকৃতাঙ্গ ব্যক্তি কীর্ত্তনের উন্মাদনাকে যেন তীব্র হইতে তীব্রতর করিতেছেন। যাকে তিনি দেখেন, তাঁকেই হরিওঁ হরিওঁ বলিতে বলিতে আলিঙ্গন করিয়া

জড়াইয়া ধরেন। দু-একজনে খুবই সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা সঙ্কোচ কর গে, আমার সঙ্কোচও নেই, ভয়ও নেই, ঘৃণাও নেই। হরিনাম প্রত্যেকটী মানুষকে শুদ্ধ করে, নীরোগ করে। ভয় পাবার কিছু নেই।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—যার শরীরে মারাত্মক সংক্রামক রোগ, তার নিজের কি এই বিষয়ে কিছু বিবেচনার নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই আছে এবং বিবেচনাটা তাঁরই করা উচিত। কিন্তু হরিনামের অমৃত আমাদের সবাইকে এমন ভাবে মাতোয়ারা ক'রে রেখেছিল যে, আমরা তাঁর বিষয় ভাববার অবসর পাইনি। কেবল শুনেছি নাম আর নাম। হরিনাম শুনতে এমন ভাবেই শুনতে হয় যেন, নাম ছাড়া কিছু নেই, কিছু ছিল না, কিছু থাক্‌বে না।

প্রশ্ন হইল,—কুষ্ঠরোগীটী এমন ভাবে জনে জনে বুকে ধ'রে আলিঙ্গন কেন কচ্ছিল বাবামণি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাণের জ্বালায়। কে জানে কার বুকে কত ব্যথা, কার প্রাণে কত জ্বালা। সংসারে কোথাও জ্বালা মিটাবার স্থান না পেলে মানুষ ভক্তের বুকের স্পর্শ আর চরণ-ছায়া কামনা করে। অনেকের বিশ্বাস, তাতে জ্বালা কমে, ব্যথা দূর হয়। প্রগাঢ় যাদের বিশ্বাস, তাদের সত্য সত্যই সব জ্বালা কমে আর দূর হয়। ব্যথায় ব্যথিত প্রাণ যদি আলিঙ্গন চায়, সে যদি কুষ্ঠরোগীও হয়, না দিয়ে কি কর্ব্বে?

আলিঙ্গন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আলিঙ্গন অতীব প্রগাঢ় আত্মীয়তা প্রকাশের একটা মুদ্রা বিশেষ। যখন মানুষ দুই থেকে আর সুখ পায় না, এক হতে চায়, তখন আলিঙ্গন-মুদ্রাটি আপনা আপনি শরীর মধ্যে প্রকাশ পায়। স্বাভাবিক ভাবে যা প্রকাশ পায়, তা' ত' অত্যুত্তম কিন্তু অস্বাভাবিক ভাবেও ত' এর প্রকাশ হ'তে পারে। হরিনাম কত্তে কত্তে একজন লম্পট কোনো পুরুষ বা নারীকে পাপবুদ্ধিতে আলিঙ্গন কর্ল্ল, এটাও ত' অসম্ভব নয়। শিবাজী আর আফজল খাঁর আলিঙ্গন ত' সত্যিকার আলিঙ্গন নয়, বরং চূড়ান্ত জিঘাংসা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যাঁর মুখে হরিনাম শুনেছেন, তাঁকেই আলিঙ্গন দিয়েছেন। কিন্তু হরিনাম শুনে স্ত্রীলোককে আলিঙ্গন কত্তে উদ্যত হ'লে তাঁর প্রিয় পরিকর কি তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন নি,—প্রভো, একি কাজ কচ্ছ? শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেকে সামলে নিলেন। কীর্ত্তন কত্তে কত্তে পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোককে বা স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষকে আলিঙ্গন করা যদি একটী গুরুতর কারণে নিষিদ্ধ হ'য়ে থাকে, তবে গুরুতর সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে হরিনাম-কীর্ত্তন উপলক্ষ্যে আলিঙ্গন করাতে বাধা দেওয়া দোষের হয় না। প্রথমোক্ত দিকের বাধা দান হচ্ছে মনের স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে, শেষোক্ত দিকের বাধাদান হচ্ছে দেহের স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে।

আলিঙ্গন ব্যাপারটা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতীক হচ্ছে সার্ব্বাঙ্গিক মিলনের। এই মিলন অনেক সময়ে মনের দিক দিয়ে সর্ব্বাত্মক মিলনের সহায়তা করে ব'লেই আলিঙ্গন প্রচলিত এবং প্রশংসিত। কিন্তু যেখানে তার সম্ভাবনা না ঘ'টে অন্য রূপ প্রতিক্রিয়ার অপসম্ভাবনা থাকে, সেখানে আলিঙ্গন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তবে, কেবল বাইরে থেকে কে কার মনের খবর নেবে? যার যার মনের খবরদারী নিজেরই রাখা ভাল।

সমবেত উপাসনার প্রভাব ও মহিমা

অদ্য আকুবপুরে একটী অনাড়ম্বর সমবেত উপাসনা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমবেত উপাসনার দিনে অন্যান্য আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান না রাখাই ভাল। কারণ, আজ তোমরা ঠিক বুঝতে না পার্লেও একদা স্পষ্টই অনুভব কর্বে যে, ব'সে ব'সে কীর্ত্তন করারই এক ফল, পরিক্রমা ক'রে কীর্ত্তনেরই আবার আরেক ফল। একমাত্র নামাশ্রয় ক'রে কীর্ত্তন করার এক ফল, ঈশ্বরের মহিমা-সূচক বা লীলা-প্রকাশক নানা বাক্য-বিন্যাস ক'রে কীর্ত্তনেরই আর এক ফল। প্রত্যহ নিয়মিত একই সময়ে সুনির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ত্তিন করার এক ফল, অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বা অবিরাম সুদীর্ঘকাল কীর্ত্তন করার আর এক ফল। কীর্ত্তনের সঙ্গে ভক্তিভাবমূলক সঙ্গীত

সংমিশ্রিত ক'রে কীর্ত্তন করারই এক ফল, কীর্ত্তনের সহিত অন্য কোনও কিছুর মিশ্রণ না ঘটিয়ে শুদ্ধ নাম কীর্ত্তনেরই এক ফল। কীর্ত্তনেরই এক ফল, স্বাধ্যায়েরই এক ফল। প্রত্যেকটী কাজের মধ্যে অসামান্য নিষ্ঠারই এক ফল, আবার কাজের মধ্যে সামান্য কিছু রকমারি ক'রে করারই আর এক ফল। সমবেত উপাসনার ফল তেমন একেবারে আলাদা। তাকে তোমরা গান আর কীর্ত্তন, ভাষণ আর উপদেশ-দান, সভা-সমিতির অধিবেশন বা কার্য্য-বিবরণী পাঠের সহিত একত্র ক'রে তালগোল পাকিয়ে ফেলো না। তাহ'লেই একদিন তোমরা সমবেত উপাসনার বহু-দূর-প্রসারিণী অপার শক্তির ও অনির্ব্বচনীয় প্রভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় নিজ নিজ জীবৎ-কালেই দেখে যেতে পার্ব্বে। সমবেত উপাসনা মুখের ফুৎকারে নিবে যেতে বা ঝড়ের তাণ্ডবে লোপ পেয়ে যেতে আসে নি, এই কথাটি অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস ক'রো।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় স্থানীয় বিদ্যালয়ের হলে মহিলাদের একটী সভা হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ মহাষ্টমীর দিন। সারা দেশে ঘরে ঘরে পরমেশ্বরকে জগজ্জননী দুর্গা ব'লে করা হচ্ছে পূজা। আজ আমি তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমার ভয়হারিণী অভয়দায়িনী জগজ্জননী দশভুজাকে প্রত্যক্ষ ক'রে তোমাদের পূজা কচ্ছি আমার ভাষণ-পুষ্পাঞ্জলিতে। তোমরাই

ভারতবর্ষের অতীত, প্রাচীন ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে তোমাদের মা ব'লে ডেকেছেন। তোমরাই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান, তোমাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে, তোমাদের স্তন্য-পীযূষ পান ক'রে আমরা জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষকে সেবাদানের আশায়। তোমরাই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ, কেননা তোমরাই জন্ম দেবে এমন মানুষদের, যারা আকৃতিতে মানুষ, প্রকৃতিতে দেবতা এবং প্রত্যয়ে মহত্তম আদর্শের পূজারী। তোমরা জগতে আছ ব'লেই আমরা দেশকে জননী ব'লে ভাবতে শিখেছি, বসুন্ধরাকে জগতের সকলের মাতা ব'লে পূজা কত্তে রুচিমান্ হয়েছি। প্রকৃত মায়ের মত হ'য়ে তোমরা জগতের ভয় বিনাশ কর, তোমরা শুচি হও, শুদ্ধ হও, পবিত্র হও। কামের ক্রীড়নক না হ'য়ে তোমরা কামহারিণী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে জগদ্ব্যাপী ভ্রান্ত পথিকদের তোমরা সত্য পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ কর।

বক্তৃতা দেড় ঘণ্টাকাল হইল।

মীরপুর (ত্রিপুরা)
১৯শে আশ্বিন, রবিবার ১৩৪২
(৬ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

সন্ধ্যা হইবার কিছু আগে শ্রীশ্রীবাবামণি মীরপুর নগেশ ব্রহ্মচারীজীর পৈতৃক বাসভবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আসিয়াই স্তূপীকৃত পত্রের উত্তর দিতে বসিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য, চরিত্র ও স্বদেশসেবা

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে যাহার মন সুস্থির হইয়াছে, তাঁহাকে সাধারণ মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিবে না, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মান্য করিবে। অথবা সরল ভাষায় ইহাও বলিতে পারি যে, তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য তোমার অন্য কাহারও উপদেশের প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার দেহের প্রতিটি রোমকূপ হইতে এবং মনের অফুরন্ত তরঙ্গরাজি হইতে উৎসারিত স্বাভাবিক ব্রহ্মতেজ তোমাকে বাধ্য করিয়া শ্রদ্ধান্বিত করিবে। তুমি যদি মত্ত বা বিভ্রান্ত অবস্থায় না থাক, তবে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত মানুষটীর দিব্য জ্যোতি স্বাভাবিক ভাবেই তোমার উপরে ক্রিয়া করিতে থাকিবে। ব্রহ্মচর্য্যের ভাণ নহে, প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যই এই দৈবী সম্পদের আধার-স্বরূপ হইয়া থাকে। ভাণ বা কপট ব্রহ্মচর্য্য দুদিন বাদে ধরা পড়িয়া যায়। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য ব্যক্তির উপরে, পরিবারের উপরে, সমাজের উপরে, দেশের উপরে, যুগের উপরে এবং যুগযুগান্তরের উপরে নিজের অনস্বীকার্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আগামী কাল আমি পথে পথে চারিটী গ্রামে নৌকা থামাইয়া পথবর্ত্তী গ্রামের যুবকদের প্রত্যেককে ডাকিয়া এই কথা কয়টীই নানা ভাবে বলিয়া যাইব। দলে দলে মানুষেরা

নৌকারোহণ করিয়া আসিতেছে শুধু মুখের কয়েকটী কথা শুনিবার জন্য। প্রত্যেককে আমি এই একটী কথাই শুনাইয়া দিতেছি, 'ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র', অন্য কোনও পন্থা নাই। ব্রহ্মচর্য্য আসিলে সত্য আসিবে, সাহস আসিবে, ধৈর্য্য আসিবে, পৌরুষ জাগিবে, নিষ্ঠা বাড়িবে, একাগ্রতা বাড়িবে। যে সকল সদ্গুণ থাকিলে দেশবাসী বা জাতি বড় হয়, তাহার মূলদেশ হইতেছে ব্রহ্মচর্য্য। অন্যেরা রাজনীতি করিতেছেন, ভালই করিতেছেন। জাতির উন্নতির জন্য রাজনীতির প্রয়োজন আছে কিন্তু রাজনীতি চরিত্র-নীতি-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। মাতাল, দুশ্চরিত্র, পরনারী-লোভী, লুণ্ঠক, দুশ্চরিত্রদের হাতে যেদিন রাজনীতি যাইবে, সেই দিন সমগ্র জাতির সর্ব্বনাশকে রুখিয়া রাখিবার বান্ধব হয়ত আর কেহ থাকিবে না। নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত, চক্ষুলজ্জাবিরহিত উদ্ধত বক্তাদের ধৃষ্ট আশ্বাসে প্রলুব্ধ হইয়া দেশবাসী ইহাদের হাতে নিজেদের মরণ-বাঁচনের চাবিকাঠিটী তুলিয়া দিয়া অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, আচ্ছাদনাভাবে, গৃহাভাবে এবং নিরাপত্তার অভাবে কেবল ধুকিয়া মরিতে থাকিবে। প্রাণে মরিতে পরিলে ইহারা কতই না সুখী হইবে কিন্তু প্রাণে আর মরিবে কয় জন? অধিকাংশই মরিবে ধনে, সম্পদে, সম্মানে, মর্য্যাদায়, মনুষ্যত্বের বিচারে এবং জীবন্মৃত অবস্থার চেয়ে পূর্ণ মৃত্যুকে অধিকতর শ্লাঘনীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। সর্ব্বত্র আমি বলিতেছি, দুশ্চরিত্রদের সংস্পর্শ হইতে হও প্রতিজনে সাবধান

এবং সর্ব্বাগ্রে হও এই বিষয়ে সাবধান যেন তুমি নিজের উপরে নিজে এমন অসম্মান কিছু না কর, যাহাতে তোমার চরিত্রের মান ও মূল্য কমিয়া যায়।"

একখানা পত্র একজন অভ্যাগত

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাকে ত' আমি দীক্ষাদানের কথা কখনও কল্পনা করি নাই এবং তুমি ত' আমার নিকটে দীক্ষিত হইতে আগ্রহীও নহ। তবে তুমি এই প্রশ্ন কেন করিতেছ যে, আমি কিছু কিছু লোককে দীক্ষা দেই কেন? কিছু কিছু লোককে আমার দ্বারা দীক্ষাদান কেন হয়, সেই উদ্দেশ্য জানিবার পরে তুমি আসিয়া আমার নিকট দীক্ষিত হইবে, এইরূপ প্রত্যাশা আমি করি না এবং আমি কেন দীক্ষা দান করি, ইহা জানিবার পরেও তুমি আমার নিকটে দীক্ষা নিতে আসিবে না জানিয়াও, শুধু এই কারণেই এই পত্র লিখিতেছি যে, আমি একটী পত্রলেখকের পত্রকেও কদাচ অমর্য্যাদা করি না। এক একখানা পত্রকে আমি এক এক জন সমাগত অতিথি বা সম্বর্দ্ধনীয় অভ্যাগত বলিয়া জ্ঞান করি। একখানা চিঠি আমার টেবিলে পড়িয়া থাকিলে আমি মনে মনে ভাবি, আমার বসিবার ঘরে একজন ভদ্রলোক অনেক ক্ষণ ধরিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎকারের প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া

ঘরের কারের বাঁশের পাল্লা গণিতেছেন। তাঁহাকে আর দীর্ঘকাল এভাবে অপেক্ষমাণ করিয়া রাখা সঙ্গত নহে। তিনি আমার পক্ষে প্রীতিপ্রদ কোনও সংবাদও দিতে পারেন অথবা নিতান্ত অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তুলিয়া আমাকে বিরক্তও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে আমার অতিথি। তাঁহাকে সুজনতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্যই তোমার পত্রখানার উত্তর দিতেছি। * পত্রে তুমি ভদ্র ভাষা ব্যবহার কর নাই, এই জন্য আমি দুঃখিত নহি। পত্র যে লিখিয়াছ তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদই দিতেছি।"

পিতামাতার প্রত্যাশা পূরণ

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অতীত জীবনে সংগ্রাম করিয়া সংসার চালাইতে হইয়াছে বলিয়া অনেক সময়ে পিতামাতা নিজেদের সন্তানের কাছে তাহার সাধ্যের অতীত সেবা চাহিয়া থাকেন। ইহা অস্বাভাবিক নহে বলিয়াই তাঁহাদের এই দাবীর প্রতি বিরক্তি বা বিদ্বেষের দৃষ্টিতে না তাকাইয়া সহিষ্ণুতার বিনম্র দৃষ্টিতে তাকানো উচিত। এরূপ ভাবে তাকানো যে সকল সময়ে ন্যায়সঙ্গতই হইবে, এমন কথা বলিতেছি না কিন্তু এভাবে তাকাইলে

* পত্রের অবশিষ্ট অংশের প্রকাশ শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দ্দেশে স্থগিত রাখা হইল।—সম্পাদক

সাংসারিক শান্তি-রক্ষা সহজতর হয় বলিয়াই ইহা উচিত। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে নিক্তির কাঁটায় ওজন করিয়া চলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই জন্যই, হিসাবকে সরল সহজ করিবার প্রয়োজনে কোথাও কোথাও Concession বা প্রশ্রয় দিতে হয়। পিতামাতা পুত্রের জন্য অনেক কিছুই করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের বার্দ্ধক্য-কালে যদি তাঁহারা কিছু বেশী সেবা পাইবার আবদার করেন, তবে তাহা **summarily dismiss** অর্থাৎ শুনামাত্র নাকচ করিয়া দেওয়া সুপুত্রের কাজ নহে। গুরুতর কোনও অন্যায়ের অনুষ্ঠান করিতে যদি বলেন, তবে তার কথা আলাদা। যেমন পরশুরাম পিতার আদেশে মাতৃহত্যা করিলেন, একাজটা ভাল হইল, না মন্দ হইল, তাহা নিয়া তর্ক আছে। এমন কঠোর, রূঢ়, অসাত্ত্বিক ও জিঘাংসা-পরায়ণ পিত্রাদেশ পরশুরাম যদি অপালন করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার ভক্তসংখ্যা বাড়িলে বাড়িতে পারিত। এইরূপ সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সর্ব্বক্ষেত্রেই পিতামাতার মনস্তুষ্টি-সাধনের চেষ্টা হিতপ্রদ। তুমি তোমার পিতাকে যেই সেবাটুকু দিবে, যে প্রকারে তাহা দিবে, যতটুকু দিবে, তাহা সেই প্রকারে, ঠিক ততটুকুই তোমার ভাবী সন্তানের কাছে প্রত্যাশা করিতে পার, ইহার অতিরিক্ত নহে। গুরুজনকে মান্য করিতে গিয়া পাপ করা অন্যায় কিন্তু পাপানুষ্ঠান না করিয়া তাঁদের আদেশ যতটুকু মান্য করা সম্ভব, তাহা করিতেই হইবে।"

প্রকৃত ধর্ম্ম

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ধর্ম্মচর্য্যার যদি সত্যিকারের কোনও সার্থকতা থাকে, তবে আমার মতে তাহা নিম্নরূপ। ধর্ম্মচর্য্যার দ্বারা মানুষ শান্তি লাভ করিয়া থাকে, ইহা তাহার ব্যক্তিগত লাভ। ধর্ম্মচর্য্যার ফলে মানুষের লোভ কমে, লালসা হ্রাস পায়, ইন্দ্রিয়-দমনের ক্ষমতা বাড়ে, চরিত্রে অসাধারণ সহিষ্ণুতা সঞ্চারিত হয়, সুদীর্ঘ প্রযত্নে সদনুশীলনে অবিচলিত ভাবে লাগিয়া থাকিবার নির্ভর-শক্তি ও বিশ্বাস-বল আসে। এইগুলি ধর্ম্মচর্য্যাকারীর একার লাভ নহে। এগুলি সমাজের সমস্ত মানবের পক্ষেই লাভের অঙ্ক, ধর্ম্মচর্য্যা যদি এই ভাবে ব্যক্তিগত লাভকে এবং সমাজের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া না দিতে পারে, তবে আমি বলিব, ধর্ম্মের নামে নিশ্চয়ই কোনও অধর্ম্মের চর্চ্চা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম অশান্ত-চিত্ত লোকের সংখ্যা বাড়িতে দেয় না, সকলকে বিশ্বাসে, নির্ভরে ও নিশ্চিন্ততায় অটল করিয়া তোলে। ধর্ম্ম কদাচ লোভ বাড়ায় না, লালসার আগুন জ্বালায় না, ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতাকে প্রশ্রয় দেয় না, ধর্ম্ম পরস্বাপহরণের প্রবৃত্তি নাশ করে, ধর্ম্ম দান করে সুগঠিত চরিত্র এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুসহিষ্ণু

শক্তি। ফল দেখিয়া যদি কোনও চর্য্যার পরিণামে ইহা না পাও, জানিবে, ধর্ম্মচর্য্যা ইহা নহে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মেরই উপাসনা হইয়াছে।"

পবিত্রতাকে জীবনের মূলমন্ত্র কর

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা,—নিরন্তর এই সুন্দর শব্দটী কেবল জপ কর। পবিত্রতা পরমেশ্বরেরই একটী পবিত্রতম নাম। এই নাম জপিতে জপিতে দেহ পবিত্র হইবে, মন পবিত্র হইবে, আত্মার পবিত্রতা তোমার নিকটে দৃশ্যমান হইবে। জপ কর পবিত্রতা জাগ্রতে, জপ কর পবিত্রতা নিদ্রায়, জপ কর পবিত্রতা কর্ম্মনিরত সুব্যস্ত অবস্থায়, জপ কর পবিত্রতা বিশ্রামের নিভৃত নিরালায়, জপ কর পবিত্রতা নিজ কল্যাণার্থে, জপ কর পবিত্রতা সমগ্র জগতের কুশলার্থে। ধরণী পুণ্যময়ী হউক, পবিত্র হউক, ইহাই হউক তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রবল অভীপ্সা। অপবিত্রতার অপসংস্কারে তোমার সূর্য্যসম ভাস্বর বিমল ও প্রখর জ্যোতি ম্লান হইয়া রহিয়াছে। তাই না তুমি অতি সহজে হও পাপের দাস, হও কামের ক্রীড়নক, ভোগের পুতুল, দুর্ব্বলতার আধার। তোমাকে

তোমার প্রকৃত স্বরূপে পৌঁছিতে হইবে, তোমাকে জগদুদ্ধারের মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। একান্ত অপবিত্র ব্যক্তির পক্ষে গ্রহণ সম্ভব নহে। যদি সে গ্রহণও করে, তবে নিজের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চিত পূতিগন্ধময় কলঙ্কগুলি দিয়া যজ্ঞের হবিঃকে করে অহিতকর, গঙ্গার জলকে করে অশুদ্ধ, তুলসী-চন্দন-বিল্বপত্রের করে মর্য্যাদা নাশ। পাপীর হাতে ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য্য পড়িলে তাহা ব্যয়িত হয় বারাঙ্গনার চিত্ত-তোষণে, মনুষ্যত্ব সম্পাদনের জন্য তাহা আসে না। দেশকে লক্ষ্মীমন্ত করিতে চাহ ত' পবিত্রতার অনুশীলন কর, যেন ভাগ্যলক্ষ্মী সত্য সত্য তোমার গৃহে পদার্পণ করিলে অগুরুর সুরভিতে চারদিক আপনা আপনি পূর্ণ হইয়া যায়, পচাগলা মাংস-পিণ্ডগুলির দূষিত পূযরক্তের দুর্গন্ধে দিগন্ত না ভরিয়া যায়। মা সরস্বতীকে ঘরে তুলিতে চাহ ত' পবিত্র হও,—পৃথিবীর অনেক বড় বড় কবিরা নাকি লম্পট ছিলেন বলিয়া লোক-প্রতিষ্ঠা থাকিলেও নব-জাগ্রত ভারত সরস্বতীর বরপুত্রদের অনাচার নির্ব্বিকারে সহ্য করিবে না। ভারতের ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া পবিত্রতাকে জীবনের মূলমন্ত্র কর। কাল আমি রূপসা ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিতে যাইবার কালে পথমধ্যে চারিটি বিভিন্ন গ্রামে অর্দ্ধঘণ্টা কাল থামিয়া ঠিক্ এই কথাগুলিই সমাগত যুবকদের শুনাইব, যেই কথাগুলি আজ মীরপুরে বসিয়া তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও লিখিতেছি।"

ওঙ্কার-মন্ত্র ও বিশ্বৈকাত্মবোধ

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি ওঙ্কার-রূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ। এজন্য তোমার অন্য কোনও মন্ত্র জপিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এক ওঁ এই মহানামের ভিতরেই বিশ্বের সমস্ত নাম রহিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়াই সর্ব্বমন্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ রসাস্বাদন, সর্ব্বতন্ত্রের রূপালেখ্য দর্শন, সর্ব্বমতের তত্ত্বানুভব, সর্ব্বালিঙ্গনকারী সত্যের প্রত্যক্ষ স্পর্শসুখলাভ সম্ভব। অন্তরের অকপট বিশ্বাস নিয়া গুরুবাক্যে ঐকান্তিক নির্ভর নিয়া, অন্য সর্ব্বপ্রকার আলম্বন হইতে মনের ভর তুলিয়া আনিয়া একান্তভাবে প্রণবমন্ত্রেরই শরণাপন্ন হও; দেখিবে, তোমার একক আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার অজানিতে অপর সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীদের অন্তরেও কি আশ্চর্য্য উপায়ে সাম্য, সহিষ্ণুতা ও সততার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়া যায়। একটি মাত্র মন্ত্রের ভিতরে দিয়া যদি সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় মননশীল মানব-গোষ্ঠীর ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার কল্পনা কেহ করে, তবে তাহাকে এই প্রণবে আসিয়া আশ্রয় নিতে হইবে, কারণ, ইহাই ভূমণ্ডলে একমাত্র মন্ত্র, যাহা সর্ব্বতত্ত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক এবং সর্ব্বসিদ্ধি সম্পর্কে সহায়ক। ভাগ্যক্রমে যদি ওঙ্কার মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছ, তবে অন্য সকল বাজে গুজবে কর্ণপাত না করিয়া একনিষ্ঠ মনে

ইহারই সাধনা করিয়া যাও এবং এই সাধনার ফলে কেবল নিজ-জনগণ-মধ্যেই আপন না থাকিয়া বিশ্বজনমধ্যে সকলের আত্মার আত্মীয় হও। হিংস্র যোদ্ধাকুল নিয়া এই যে পৃথিবীর মানবীয় সভ্যতার ঊষাগমনকাল হইতে লুণ্ঠক দস্যুরা অশ্বপৃষ্ঠে ধরিত্রীর দূরত্বের অবসান ঘটাইয়া দেশে দেশে যুগে যুগে কেবল নররক্তরঞ্জিত তরবারির খেলা দেখাইল, এইটাই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ কথা নহে। বিশ্বের সকলে সকলের আপন হইবে, আত্মীয় হইবে, বান্ধব হইবে, পৃষ্ঠপোষক হইবে, সহায়ক হইবে, সেই দৃশ্য আমাদের দেখিবার বাকী আছে।"

গুরুতত্ত্ব গুহ্য

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি ত' পৃথিবীর অতি নগণ্য সাধারণ একটী লোক কিন্তু তোমার কল্পনাকুশল দৃষ্টির সম্মুখে পড়িয়া আমি হঠাৎ তোমার নিকটে এত অসাধারণ হইয়া গিয়াছি যে, এখন আর তুমি আমার মাধ্যমে ছাড়া জগতের সত্য-সমূহকে উপলব্ধি করিতে আদৌ আগ্রহ অনুভব কর না। এই অবস্থাটী তোমার মধ্যে যাহাতে সৃষ্ট হয়, এমন কোনও কাজ বা চিন্তা আমি অলক্ষিতেও কদাচ করি নাই এবং আমার কোনও অসতর্ক বাক্য দ্বারাও এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া নিজের

মতামতের সঙ্গে নিজের বিরোধ সৃষ্টি করি নাই। কিন্তু তোমার বদ্ধমূল বিশ্বাস তোমাকে এমন এক স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে যে, তুমি আমাকে ছাড়া যেন আর একটী পা অগ্রসর হইতে পারিতেছ না। এমত অবস্থায়, সঙ্কট-সন্ধিক্ষণ বিবেচনায়, আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে তোমাকে উপদেশ দিতে পারি যে, বেশ, আমাকেই তুমি তোমার ধ্যান ও জ্ঞানে পরিণত কর, আপত্তি নাই কিন্তু তখন আমাকে আর রক্তমাংসের মরণশীল একটা মানুষ বা জড়পদার্থ নিয়া ক্রিয়াশীল একটা প্রাণিবিশেষ বলিয়া জ্ঞান করিও না। আমাতেই যদি আত্মনিমজ্জন করিয়া জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে হয়, তবে আমাকে আর পরম সত্য চৈতন্যময় সত্তাকে এক এবং অভিন্ন ভাবিতে হইবে।

আমি উপদেশদাতা মাত্র, পথপ্রদর্শক মাত্র, এমনকি অতিরিক্ত করিয়া আমি তোমার একজন সমসাধক, এই রূপেই আমি আজীবন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছি। আমাকে অলৌকিক কিছু বলিয়া না ভাবিতে এবং আমাকে লৌকিক বিচারের মানদণ্ড দিয়াই ওজন করিতে, যাচাই করিতে, বিচার করিতে আমি তোমাদের সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়াছি। মধ্যযুগে প্রবর্ত্তিত গুরুবাদের রহস্যময় তত্ত্ব ও কুহেলীঘেরা প্রথা-সমূহকে আমি এই বস্তুতন্ত্র-যুগের সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ বলিয়া অনুভব করি নাই। এই কারণে আমি নিজে গুরুবাদের আলোটুকু হইতে সযত্নে নিজেকে দূরে রাখিয়াছি, গুরুবাদের

আলোটুকুকে মাত্র সম্বল করিয়াছি। এই জন্য লোকসমাজে আমার গুরুপরম্পরার পরিচয় দিতে বাধা হইয়াছে এবং গুরুপরম্পরা প্রচারের দ্বারা বাস্তব জগতে যে সকল অভাবনীয় সুযোগ ও সুবিধা মিলিয়া থাকে, তাহা হইতে আমি একেবারে বঞ্চিত আছি। সমগ্র-সমাজ-ব্যাপ্ত কুসংস্কারসমূহের সহিত যুদ্ধরত সৈনিক আমি মাত্র একজন এবং যুদ্ধে শুধু অস্ত্রবলই বড় কথা নহে, জনবলও একটা দামী কথা। এত সব সত্ত্বেও আমি গুরুবাদের কতকগুলি দুর্ব্বলতার নিকটে মাথা নত করি নাই। অথচ সেই আমারই নিকটে দীক্ষিত হইয়া তোমরা কেহ কেহ গুরু সম্পর্কে এক দিব্যালোকিত সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছ, যাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আমি কদাচ তাহার প্রচারক-ভূমিকাটী গ্রহণ করিব না, করিতে পারি না। এমন অবস্থায় আমি তোমাদের চিত্তের স্বতন্ত্রতা ও চিন্তার স্বাধীনতাকে দাবাইয়া রাখিতে চাহি না। সাধন করিতে করিতে গুরুকে যে তোমরা যাহা যাহা বুঝিয়াছ, তাহা তোমাদের অন্তরের সামগ্রী করিয়াই রাখ। স্বামি-স্ত্রীর সহবাস যেমন বাজারে বসিয়া গল্প করিবার মত একটী বিষয় নহে, বরঞ্চ উহা একান্তই আত্ম-নিগূঢ় বস্তু, ঠিক্ তেমনি গুরুকে যদি কেহ অসাধারণ কিছু বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে সে তত্ত্ব তোমাদের অন্তরের নিভৃত গুহাতেই নিরালা পূজার্চ্চনায় অভিনন্দিত হউক, বাহিরে তাহা প্রচার করিয়া নিজ সাধনের ক্ষতি করিও না। গুরুতত্ত্ব স্বতঃই অতীব গুহ্য।"

ছেলেমেয়েদের নামকরণ

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

ছেলেমেয়েদের নাম রাখিবে শুভসূচক শব্দে, গৌরববোধক শব্দে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণাদায়ক শব্দে। নামকরণ-কালে যদি নামের আদর্শগত ব্যঞ্জনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাম নিরূপণ হয়, তবে অনেক সময়ে নামের গুণে সাধারণ ছেলেমেয়ে অসাধারণ হয়, ইহা একটা ভ্রান্ত ধারণা নহে। অর্থহীন বা কদর্থযুক্ত নাম রাখিয়া পুত্রকন্যাকে সারা জীবনের জন্য অবসাদগ্রস্ত করা এক মারাত্মক ভুল। নাম রাখিবে উচ্চভাবযুক্ত, সহজে উচ্চারণীয় এবং সুমধুর বর্ণাবলির মিলনে জাত শব্দে। খুব বড় বা কটমট ভাষার নাম সত্যই এক আপদ। অনেকেই সেই নাম উচ্চারণ করিতে ক্লেশ বোধ করে বা সংক্ষিপ্ত করিয়া নিয়া বিকৃত করে। একজনের দুইটা, তিনটা, পাঁচটা নাম রাখা কোনও কাজের কথা নহে। ইহা ভাল নাম, উহা ডাক নাম, এরূপ প্রচলিত আছে বটে কিন্তু তাহা লাভজনক, না মানুষের স্মৃতিশক্তির উপরে অত্যাচার, এই কথাটাও ভাবিতে হইবে। যাহাকে আদর করিবার লোক জগতে অনেক, তাহার দুইটা, পাঁচটা বা দশটা নাম হইতে

পারে কিন্তু একটি নামকেই প্রধান করিলে সেই নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে নাম-বাচক শব্দটুকুর অন্তর্নিহিত মহিমা জীবনের বা জীবন-গতির বেগের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে সুযোগ পায়।"

প্রথম যৌবনে আত্মশাসন প্রয়োজন

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি একটী বিশ বাইশ বৎসর বয়সের যুবক। আঠারো বছর বয়সের একটি মেয়ে অনেকের কাছেই চিঠি লেখে, হয়ত তোমার কাছেও লেখে। সে আবার আমার মতন গুরুদেবের কাছেও চিঠি লেখে। একদিন অনেকের কাছে অনেক চিঠি লিখিয়া খামের ভিতরে পুরিবার সময়ে তাহার দারুণ একটী ভুল হইয়া গেল। অর্থাৎ রমেন নামীয় তোমার কাছে লিখিত চিঠিটা তোমার নামীয় খামে না ভরিয়া গুরুদেবের খামে ভরিয়া দিল, গুরুদেবের নামীয় চিঠি আবার অন্য অন্য আরএকজনের নামীয় খামে চলিয়া গেল। খামে টিকিট মারা হইল, খাম ডাকে দেওয়া হইল, যথাকালে গুরুদেবের কাছে খাম পৌছিল। গুরুদেব খাম খুলিয়া ত' অবাক্। এমন সব উচ্ছ্বসিত ভাষা, এমন সব শব্দ-ঝঙ্কারপূর্ণ

কবিত্বের ফোয়ারা কে কাহাকে প্রেরণ করিল? আগাগোড়া বহুবার পাঠ করিবার পরে বোঝা গেল যে, ইহা একটী উচ্ছ্বসিত-হৃদয়া কোমলা কুমারীর পত্র তারই এক অতীব প্রিয় কিশোর-যুবকের নিকট। কাহারও ঠিকানা জানা না থাকায়, গুরুদেব যাহার পত্র তাহাকে আর পাঠাইতে পারিলেন না, যে লিখিয়াছে তাহাকেও আর জানাইতে পারিলেন না। ডেড্-লেটার-অফিসের কেরাণীরা এই রকমের পত্র সপ্তাহে দুই এক হাজার করিয়া পান, এবং পাঠ করিয়া ঠিকানা বাহির করিতে চেষ্টা করেন এবং বিফল-মনোরথ হইয়া রণে ভঙ্গ দেন। কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার মন অত সহজে দমিবার নহে, তাহারা প্রেম নিবেদনের জন্য এবং প্রেমের আবেদন লইয়া নূতন পথে নূতন উদ্যমে প্রয়াস পরিচালন করে। তরুণ-জীবনের ইহাই প্রণয়-নীতি, ইহাই প্রেমের রীতি। ইহাকে আমি অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করিতেছি না। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু, প্রতীক্ষাক্ষম বীরপুরুষ সত্যই সর্ব্বলোকের বন্দনীয়, যে এই সময়টাতে নিজেকে উচ্ছ্বাসের মুখে বহিয়া যাইতে দেয় না, যে শক্ত করিয়া নিজ আদর্শের মাটি আঁকড়াইয়া থাকে। আমি চাহিব যে, প্রণয়ের মধুর বংশী নিনাদিত হইয়াছে বলিয়াই বা বসন্তের কোকিল তোমার নবযৌবনের তমাল শাখায় বসিয়া কুহু তান তুলিয়াছে বলিয়াই তোমার চঞ্চল হইবার সময় আছে বলিয়া কদাচ মনে করিও

না। যাহা কিছু করিতে চাহ, জীবনে সবই করিতে পারিবে, কিন্তু ধৈর্য্য-সহকারে কালপ্রতীক্ষা কর। ভোগ-সম্ভোগ, প্রেম-প্রণয়, সবই জীবনের একটা অংশ এবং যাহা করিবার যখন সময়, তখনই তাহা করা কর্ত্তব্য। এখন তোমার আত্মগঠনের সময়, এখন তুমি আত্মগঠনের দিকেই দাও সমস্ত মন, প্রাণ ও অধ্যবসায়। দুর্ব্বলের প্রণয় চঞ্চল, শক্তিশালী লোকের প্রণয় গভীর এবং স্থায়ী। জীবনকে স্থায়ী প্রণয়ে সমৃদ্ধ করিবার জন্যই তোমার এখন আত্মশাসন প্রয়োজন। জীবনে যৌবনকে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা না করিয়া যে যৌবনচিত শক্তির অপব্যবহার করে, তাহার মতন গণ্ডমূর্খ জগতে আর কে আছে? যৌবনকে ক্ষণচঞ্চল উদ্বায়ু বাষ্পের মতন উড়াইয়া না দিয়া নিজের ভিতরে শক্তির উৎস-রূপে প্রতিষ্ঠিত কর। প্রেম আর প্রণয়ের চিন্তা তাহার পরে করিও।”

আমার আবাল্য সাধ

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“আবাল্য আমার সাধ পায়ে হাঁটিয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিব, কত পরিচিত আর অপরিচিত দেশে যাইব, কত দীন-দরিদ্রকে দেখিব, কত দুঃখী-কাঙ্গালকে বুকে ধরিব, কত শোকার্ত্ত,

ভয়ার্ত্ত, পাপার্ত্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিয়া তাহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান ও সতর্কতা সঞ্চয় করিয়া দুর্ব্বার বিক্রমে নিজ মনোরথ-পথে কেবলি চলিব আর চলিব। চারিদিকে বেণু-বীণা-মন্দিরা, সেতার-এস্রাজ-বেহালা বাজিতে থাকিবে আমার কণ্ঠের আরোহণ অবরোহণের সঙ্গে সঙ্গে আর লক্ষ লক্ষ অলক্ষিত শ্রোতা তাহা শুনিয়া বিশ্বাস অর্জ্জন করিবে,—হরি ওম্, ঈশ্বর আছেন। আমার আবাল্য সাধ, নৌকায় করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিব এবং চতুর্দ্দিকের জলমগ্ন ভূমিগুলিতে কুমুদ-কহ্লারের রূপলীলা দেখিতে দেখিতে শত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিব হরিওঁ, হরিওঁ,— ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন। শেষের সাধটী এই ত্রিপুরায় এবং কখনো কখনো নোয়াখালী জেলায় আমার বহুবার বহ্বংশে মিটিয়াছে। কিন্তু তাহাতে পূর্ণ তৃপ্তি আসে নাই। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, শীতললক্ষা, পদ্মা, মেঘনা ও তিতাসের জলরাশি হরিওঁ মহানামে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া আকাশের মেঘরাশিকে স্পর্শ করুক, এই দৃশ্য-সুখটুকু আমার বাকী রহিল। মানুষের সকল সাধ সকল সময়ে পূর্ণ হয় না, তথাপি সাধ-আহ্লাদ করিতে দোষ কি? ভাল বিষয় নিয়া সাধ করিলে তাহা বস্তুর জগতে পূর্ণ না হইলেও অন্তর্জ্জগতে নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ তৃপ্তির অভাবনীয় ও দিব্য আস্বাদ দিতে পারে।"

মীরপুর ও কসবা (ত্রিপুরা)
২০শে আশ্বিন, সোমবার, ১৩৪২
(৭ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

মীরপুর ছাড়িবার প্রাক্কালে

মীরপুর হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি রওনা হইবার সময় একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখা গেল। চারিদিকে বিভিন্ন গ্রাম হইতে ছোট ছোট ডিঙ্গি বোঝাই ছাত্র ও যুবকদের দল তাঁহাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— তোদের উপকারার্থ একটা কথাও বল্লাম না, কাজ করা ত' দূরের কথা, আর তোরাই এলি আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে!

একটি যুবক বলিয়া উঠিল,—আমরা আপনার মুখের কথাই ত' শুনতে এসেছি। আপনি যে এ গ্রামে এসেছেন, তা' ত' আমরা জানলুম কাল সন্ধ্যার সময়ে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আমাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঠিক বেলা দুটা উনত্রিশ মিনিটে ফেণী যাবার জন্য ট্রেণ ধরতে হবে। আমি ত' দেরী কর্ত্তে পারব না বাবারা।

যুবকরা বলিল,—আমরা অপনার সঙ্গে সঙ্গে কমলাসাগর যাব। সেখানে পৌছে যদি দেখ্তে পান যে, ট্রেণ আসার এখনো বিলম্ব আছে, তাহ'লে ত' কিছু বল্বেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের আগ্রহ দেখে

নিজেকে ধন্য মনে কচ্ছি কিন্তু আমাকে যে পথে পথে চারটী গ্রামে নৌকা ভিটাতে হবে এবং প্রত্যেক স্থানেই দু-দশ মিনিট ক'রে কথা বল্‌তে হবে।

যুবকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—তবে ত' ভালই হ'ল। আমরা চুপ ক'রে এক পাশে ব'সে সব কথা শুনব।

একজন যুবক বলিল,—তবু আমরা আলাদা ক'রে আপনার মুখ থেকে আমাদের নিজেদের জন্য কিছু কথা শুন্‌তে চাই। তবে এই বিষয়ে আমাদের কোনো জিদ নেই। আপনি কমলাসাগরে পৌঁছে যদি ঘড়ি দেখে বোঝেন যে, কিছু বলার অবসর আছে, তবেই আপনাকে আমরা কষ্ট দেব।

একজন বর্ষীয়ান্ ভদ্রলোক একটী নৌকা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—ভাষণ কিছু শুনি আর না শুনি, সঙ্গ সুখটুকু যে পেলাম, তাতেই পরম সৌভাগ্য মনে করি। উপদেশ পেলাম আর না পেলাম, শ্রীচরণ যে দর্শন কত্তে পেলাম আর শ্রীমুখকমলের দিব্য-জ্যোতির মধ্যে ভগবানের স্পর্শটুকু যে দেখ্‌লাম, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমরা সাধারণ পাপী-তাপী অজ্ঞ-অন্ধ সংসারী লোক। তীর্থ-ভ্রমণ বা মহাপুরুষ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। আপনার কৃপায় দুটীই আমাদের আজ এক সঙ্গে হ'ল।

একজন বলিল,—তীর্থভ্রমণ কথাটার মানে হয়ত বাবামণি বুঝলেন না। এর দুটী মানে আছে। একটী মানে এই যে,

বাবামণি নিজেই একজন সচল তীর্থ। তিনি আসাতে এই গ্রাম আজ তীর্থ হ'য়ে আছে। আর একটী মানে এই যে, এই গ্রামে শ-খানিক বৎসর আগে একটী সতী নারী স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণ বরণ করেছিলেন। তিনি নগেশ ব্রহ্মচারীজীর ঠাকুরমা। কুমিল্লা থেকে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন সতীদাহ নিবারণ কত্তে। ব্রহ্মচারীজীর ঠাকুরমা একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে নিজের তর্জ্জনীটি ধ'রে চুপ ক'রে বসে রইলেন। চামড়া পুড়ে গেল, মাংস পুড়ে গেল, তারপরে খালি হাড়গুলি বের হ'য়ে জ্বলতে লাগ্‌ল। তবু মহিলার মুখে এক কণা কাতরতার চিহ্ন দেখতে না পেয়ে ইংরেজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ব'লে গেলেন, এমন সতীকে সহমরণে যেতে আমি বাধা দিতে পারি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশ্চর্য্য! কিন্তু এরূপ ঘটনা সত্য যে হ'তে পারে, তা আমি বিশ্বাস করি। প্রাণের জ্বলন্ত অনুরাগের কাছে আগুনের শিখা হিমশীতল যে হ'তে পারে, এটা সত্য কথা।

রামমোহন রায় ও সতীদাহ

একজন প্রশ্ন করিল,—লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী আমলে এদেশে জোর ক'রে মৃতভর্ত্তৃকা নারীকে শ্মশানের অগ্নিতে তার স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ করা হ'ত, একথা কি সত্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জোর ক'রে এভাবে নারী-হত্যা করা হ'ত, একথা সত্য নয়। কেউ কেউ ইচ্ছা ক'রে স্বামীর দেহের পাশে অন্তিম শয্যা গ্রহণ ক'রে অক্লেশে জীবন দিতেন। এবাবে জীবন দেবার সার্থকতা কিঃ সেই প্রশ্নের জবাব দিতে যেতে চাই না। কিন্তু এরকম যে ঘট্‌ত, সেটা সত্য। আবার এও দেখ যে, রামমোহন রায় সতীদাহের প্রচণ্ড বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নাকি তাঁর ভ্রাতৃবধূকে প্রাণপণে বুঝিয়েও সহমরণ থেকে নিবৃত্তা কত্তে পার্‌লেন না, আর রামমোহনের মা কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে সহমৃতা হলেন না। রামমোহনের মা যে সহমৃতা হন নি, তজ্জন্য সমাজে কেউ তাঁর নিন্দা করে নি বা অপযশ কীর্ত্তন করে নি। রাণী ভবানী বা রাণী রাসমণির মতন প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলারা কেউ সহমৃতা হন নি ব'লে সমাজ এঁদের হেয় জ্ঞান করে নি। এই থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, সমস্ত সমাজ বা সমগ্র দেশই মৃতভর্ত্তৃকা নারীকে জোর ক'রে জীবন্তে দগ্ধ ক'রে মারার স্বপক্ষে ছিল না। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতেন, সম্পত্তি আদি লাভের লোভে কিছু কিছু দুষ্ট লোক নিজ নিজ ধনবতী ভ্রাতৃবধূদের বা এইরূপ আত্মীয়াদের জোর ক'রে শ্মশানের আগুনে হত্যা কত্ত। রাজা রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, ভাল কাজই করেছেন। বেণ্টিঙ্ক সাহেব সতীদাহ রোধ ক'রে আইন প্রণয়ন করেছেন, তাও ভালই করেছেন। কিন্তু এটা সত্য যে,

তৎকালের সতীদাহের বিভীষিকাকে যেরূপ রং চড়িয়ে প্রচার করা হয়েছে, তাৎকালিক অবস্থা ঠিক তা-ই ছিল না। অতিরঞ্জন সংপ্রয়াসেরও মহিমা খর্ব্ব করে।

সতীর প্রেরণার উৎস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁরা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতেন, তাঁরা যে অন্তরের কতখানি প্রেম থেকে মৃত স্বামীর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে অগ্নিশয্যা গ্রহণ কত্তেন, ভাবতে বিস্ময় জাগে, আশ্চর্য্য লাগে। কোন্ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আর কোন্ সংস্কারের প্রেরণায় এমন অসাধ্য-সাধন তাঁরা কত্তেন, ভাব্‌লে অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা জাগে। প্রথমতঃ তাঁদের বিশ্বাস ছিল, যিনি আজ স্বামী, যিনি আজ মৃত, যিনি আজ পরলোক-পথগামী, তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হ'তে পারলে পরলোকে এবং অনন্ত কোটি পুনর্জ্জন্ম কালে তাঁকেই পুনরায় জীবন-সঙ্গী এবং পরম সখা-রূপে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের জানা ছিল, এই নশ্বর পৃথিবীতে কীর্ত্তিই একমাত্র জীবিত থাকে, মানুষ চিরকাল থাকে না। প্রধানতঃ তাঁদের সংস্কার ছিল এই যে, পতিই সতীর দেবতা, পতিতে সম্যক্ আত্মসমর্পণই সতীর একমাত্র কর্ত্তব্য, জীবনে বা মরণে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তাঁর প্রীতি-সাধন এবং অনুগমনই সতীর প্রকৃত ধর্ম্ম। পাতিব্রত্য ধর্ম্মই সতীর একমাত্র ধর্ম্ম বা মুখ্য ধর্ম্ম, অন্য যাবতীয় ধর্ম্মাচরণ তার তুলনায় গৌণ। পতিব্রতা হবার শিক্ষা ভারতবর্ষের নারীরা

কয়েক সহস্র বৎসর ধ'রে পেয়ে এসেছে, সম্ভবত শ্বেতকেতুর বিধানের পর থেকেই। ভারতের নারী পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অনুশীলনের নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু তাঁর সেই পতিগতপ্রাণতাকে যে শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক অত্যাচারে বা দলবদ্ধ হত্যাকাণ্ডে নিয়ে পরিণত করা হবে, একথা আদিতে কে জান্ত?

পাতিব্রত্য ও পত্নীপরতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীর পতিতে একনিষ্ঠার সদ্দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী থেকে শুরু ক'রে রাজপুতানার পদ্মিনী আদি পর্য্যন্ত নারী তাঁদের জীবনের পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের অক্ষুণ্ণতা প্রদর্শন ক'রে জগতে অতুলনীয়া হয়েছেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া সম্ভবতঃ দ্বিতীয় আর কোনও নামী বা দামী পুরুষ সমগ্র ভূভারতে স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠার এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন নি। প্রজারঞ্জন রাজার কর্ত্তব্য, এই বোধের তাড়নায় তিনি সীতাকে নির্ব্বাসন দিতে বাধ্য হ'লেও, বহু মহিষীর স্বামী দশরথের আত্মজ হ'য়েও শ্রীরামচন্দ্র সীতার পরিবর্ত্তে আর একটী দার পরিগ্রহের কথা চিন্তা কর্ত্তে পারেন নি। শ্রীরামচন্দ্রের এই মহত্ত্ব যদি আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনে অনুকৃত হ'ত, তাহ'লে আমরা নিশ্চয়ই পতির শোকে সতী নারীর সহমৃতা হবার মহিমা উপলব্ধি কর্ত্তে পার্ত্তাম। শত সহস্র সতী ভারতের

প্রান্তে প্রান্তে স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় একদা সোল্লাসে আরোহণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের একব্রততার, একনিষ্ঠার এই ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত দেখে দেখেও ভারতের পুরুষ-জাতির মনে একবার একথা জাগে নি যে, নারী যদি পতির জন্য জীবন দিতে পারে, তাহ'লে পুরুষেরও তার স্ত্রীর প্রতি এমন একনিষ্ঠার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, যার ফলে তার পক্ষেও স্ত্রীর জন্য অবহেলে জীবনদান সম্ভব হয়। পুরুষেরাও যদি দলে দলে স্ত্রীদের মৃতদেহের সঙ্গে নিজ নিজ জীবন্ত দেহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ত্তে পার্ত্ত, তাহ'লে বলতে পার্ত্তাম, না, ভারতবর্ষ সত্যই এক অদ্ভুত দেশ, যেখানে একনিষ্ঠার সম্মান স্ত্রীলোকেরাও জানে, পুরুষেরাও জানে। নারীর জন্য এক প্রকারের নীতি-শাস্ত্র প্রণয়ন ক'রে পুরুষদের জন্য আর এক প্রকারের নৈতিক মান নির্দ্ধারণ ক'রে দেওয়া সমাজ-পতির পক্ষে এক মারাত্মক অন্যায় ও অবিচার হয়েছে, এইটী স্বীকার কর্ত্তেই হবে। তবু শেষ কথা আমার এই যে, স্বেচ্ছায় যিনি স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে নিজের জীবন্ত দেহ বিসর্জ্জন দিতে পেরেছেন, এমন মহীয়সী নারী কেবল নগেশ ব্রহ্মচারীরই পিতার মা ছিলেন না, তিনি আমাদের সকলের মা। এস আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম নিবেদন করি।

কথা কহিতে কহিতে দেরী হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণির নৌকাতে অন্য নৌকার আরোহী চারিটী যুবক আসিয়া বৈঠা ধরিল। নৌকা তীরবেগে ছুটল। অন্যান্য নৌকাগুলি পিছে

পিছে চলিতে লাগিল তালে-তালে বৈঠা ঠেলিয়া ঠেলিয়া। একটার পর একটা নৌকা সেই বিস্তীর্ণ বিল-সম জলাকীর্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়া যখন ছুটিল, মনে হইতে লাগিল যেন চলিয়াছে এক রণবাহিনী। যথানির্দ্দিষ্ট স্থানগুলিতে শ্রীশ্রীবাবামণির নৌকা ভিড়িল। গ্রামবাসী যুবকেরা তৈরীই ছিলেন। নৌকায় দাঁড়াইয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি বিশ পঁচিশ মিনিট করিয়া একে একে চারিটী গ্রামে ছোট ছোট চারিটী ভাষণ দিলেন। কমলা-সাগরের কাছাকাছি আসিয়া ঘড়িতে দেখা গেল, গাড়ী আসিবার এক ঘণ্টা দেরী আছে। শ্রীশ্রীবাবামণি স্থলভাগে উঠিয়া অদ্যকার তাঁহার পঞ্চম ভাষণ দিতে উঠিলেন।

ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় লাগিয়া যাও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এটী আমার অদ্যকার পঞ্চম ভাষণ। সুতরাং সুরকে পঞ্চমে তু'লে আমি তোমাদের শোনাতে চাই শুধু এই একটুখানি কথা যে, আমাদের জীবন জন্মমাত্রেই আমাদের মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য, জগদ্বাসীর হিতের জন্য উৎসর্গীকৃত। আমাদের জীবনে চপলতার, চঞ্চলতার, ভোগলুব্ধতার, পরপ্রবঞ্চনার, পরপীড়নের এবং পরস্বাপহরণের কোনো প্রবেশ-পথ নেই। আমাদের জীবনকে আমরা যত সুন্দর ক'রে গড়ে তুল্‌তে পারব, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফল করা তত সহজ হবে। অবশ্য, প্রকৃত মানুষের জীবন-

পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা থাকে। সেই বাধাতে সে ভীত না হ'য়ে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার বলে অতিক্রম ক'রে চ'লে যায়। আমাদের প্রতিজনেরই তা' কত্তে হবে। এই জন্যই আমাদের চাই আজ ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত ক'রে তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় লেগে যাও।

হও মানুষ, হও পুরুষোত্তম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সবাই তোমরা সন্ন্যাসী হবে, এমন কোনো জিদ কেউ রেখো না। প্রত্যেকেই তোমরা বিবাহিত হবে, এমন ভরসারও কোনো কারণ নেই। বিবাহ বা অবিবাহ এমন একটা ব্যাপার, যার উপরে সত্য সত্য মানুষের যেন কোনো হাত নেই। বিবাহ কত্তে যাবে, সাজা-গোজা হচ্ছে, এমন সময়েও কত জনের মনে বৈরাগ্য এসে যায়, আর তাকে বিবাহ-বাসরে পাওয়া যায় না, শেষ পর্য্যন্ত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্য বর খুঁজে এনে নিজের সম্মান বাঁচাতে হয়,—এমন ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে। বিয়ে কর্ব্ব না ব'লে জীবনের পঞ্চাশ বৎসর সময় দৃঢ়তার সঙ্গে কাটিয়ে দিয়ে হঠাৎ একপঞ্চাশ বৎসর বয়সে একজনকে দয়ায় পড়ে, অনুকম্পা বশতঃ বা কারো রূপের আকর্ষণে, কারো অসাধারণত্বের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে বিয়ে ক'রে ফেল্‌তে হ'ল, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। কার জীবনে বিবাহ-

ব্যাপারে কোন্ ঘটনা কখন কেমন ক'রে ঘট্‌বে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং বিবাহ বা অবিবাহ নিয়ে দুশ্চিন্তা না ক'রে তোমরা জীবনকে এমন ভাবে গঠন কত্তে লেগে যাও, যেন সন্ন্যাসী হ'লে একজন বিবেকানন্দ হ'তে পার, গৃহী হ'লে একজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হ'তে পার। যার সংস্পর্শে এলে লক্ষ মানুষ নবজীবনের প্রেরণা পায়, সেই ত' প্রকৃত মানুষ। তোমরা সন্ন্যাসী হবারও আকাঙ্ক্ষা ক'রো না, গৃহস্থ হবারও নয়, কিন্তু সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্য, জীবনের এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে যেটাই ভাবী কালে তোমার জন্য প্রয়োজন হোক না কেন, মানুষ-হিসাবে তুমি যেন পৃথিবীর অন্য কোনও মহৎ মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট না হও, এইটাই তোমার লক্ষ্য হোক্। তোমাকে হ'তে হবে পুরুষোত্তম।

ফেণী যাইবার পথে লাকসাম জংশন
২০শে আশ্বিন, সোমবার ১৩৪২
(৭ই অক্টোবর, ১৩৩৫)

সধবার পত্যন্তর

কুমিল্লা ষ্টেশানেই একটী বিশ বাইশ বৎসর বয়সের সধবা মেয়ে গাড়ীতে উঠিয়াছে। প্রণাম করিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোথায় যাচ্ছ।

মেয়েটি বলিল,—আপনার সঙ্গেই লাকসাম যাচ্ছি।

সেখানে ট্রেণ অনেকক্ষণ থামে। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।

যাত্রি-পরিপূর্ণ ট্রেণে কথা কহিতে মেয়েটী কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীকে গাড়ীতে মালপত্র দেখিবার জন্য রাখিয়া প্লাটফর্ম্মে নামিলেন। মেয়েটির প্রকৃত নাম পাণ্ডুলিপিতে আছে। কিন্তু তাহা প্রকাশ সম্ভব নহে। কল্পিত নাম এখানে দিলাম রমলা।

রমলা ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তৎপরে বলিল,—আমি দুর্ভাগিনী, আমি লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম, অনেক খরচ করিয়া পিতামাতা বিবাহ দিয়েছিলেন এক পাত্রের সঙ্গে, যিনি নিজের অতীব কুৎসিত ব্যাধির কথা গোপন করিয়া বিবাহ করেন। বিবাহের মন্ত্রপাঠ করিবার সময়েই ধরা পড়িয়া গেল যে বরের সর্ব্বাঙ্গে ঘৃণিত কুষ্ঠব্যাধি। মাতাপিতা নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া কাঁদিলেন কিন্তু তখন আর কিছু করিবার উপায় ছিল না। আমি সতী, সীতা, দময়ন্তীর আদর্শে বিশ্বাস করিয়া এই রুগ্ন অক্ষম সর্ব্বাঙ্গময়-ব্যাধিযুক্ত স্বামীকে লক্ষহীরার মতন সেবা দিতে লাগিলাম। তাঁর একটি ইচ্ছারও বিরুদ্ধতা করিলাম না। প্রতীক্ষায় রহিলাম, আমি মরিবার পরে পুনরায় জন্ম নিলে আমার পাতিব্রত্য ধর্ম্মই আমার ভাবী জীবনে সুখদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করিবে। কিন্তু এই জীবনটা ধারণ করিয়া চলি কিসের বলে? স্নেহ নাই, প্রেম নাই, এগুলি আমি সহ্য

করিতে পারি কিন্তু আমি লেখাপড়া কেন শিখিলাম, এই এক অজুহাতে দিনের পর দিন নির্দ্দয় প্রহার এবং পরিশেষে একদিন গলায় দড়ি ফাঁসাইয়া দিয়া আমাকে হত্যা করার চেষ্টা হইল। আমার গোঙানি শুনিয়া প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিল এবং আমার প্রাণ রক্ষা করিল। তারপরেই পিত্রালয়ে চলিয়া আসি। মাস ছয়েক পিত্রালয়ে থাকিবার পরে পিতামাতার বাধা সত্ত্বেও আবার স্বামিগৃহে যাই। আবার ঐ অত্যাচার শুরু হয়। এভাবে জীবন আমার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

মেয়েটী শরীরের কয়েক স্থানে কয়েকটা গভীর ক্ষতের চিহ্ন দেখাইল। বলিল,—এগুলি আমার স্বামীর দান।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মা আমি সমাজ-ব্যবস্থাপক নহি। আমি সামাজিক ব্যাপারে তোমাকে কোনো উপদেশ দিতে পারি না। কিন্তু ধীর সুস্থ মনে চিন্তা ক'রে তুমি যে পথ ভাল মনে কর, সেই পথ গ্রহণ কত্তে পার।

রমলা বলিল,—আমি যদি অন্যত্র বিবাহিত হবার চেষ্টা করি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশের প্রচলিত আইন হয়ত তোমাকে পত্যন্তর গ্রহণের সে অধিকার দেবে না কিন্তু নীচ পতিতার জীবন-যাপনের চেয়ে অন্যকে বিবাহ ক'রে জীবনে সুখী হওয়ার চেষ্টা নিশ্চয়ই অনেক ভাল। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ এবং অনেক ক্ষেত্রে সধবার পত্যন্তর গ্রহণ প্রাচীন শাস্ত্রেও

সমর্থিত হয়েছে। দেশ ও সমাজের পক্ষে জীবনকে লাভজনক ক'রে তোলার সঙ্কল্প নিয়ে যদি তুমি পত্যন্তর গ্রহণ কর, তবে আমার দিক থেকে কোনো বাধা তুমি পাবে না। তবে একটী কথা। তুমি যদি সামাজিক মানুষদের মধ্যে কারো কোনো সমর্থন এই ব্যাপারে না পাও, তাহ'লে তুমি সমাজে একঘরে হ'য়ে থাকবে। তাতে ভবিষ্যতে তোমার পুত্র-কন্যাগুলির সামাজিক জীবন কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়বে। অতএব, আর কারো সম্মতি নাও আর না নাও, তোমার পিতামাতার সম্মতি নিশ্চয়ই নিতে হবে। কিন্তু মা, বরের কি তুমি সন্ধান পেয়েছ?

রমলা বলিল,—না বাবা, সন্ধান এখনো করি নাই। কেবল আপনার অনুমতির প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম। আপনার হয়ত মনেও নাই যে, আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে একদা কুমিল্লাতে আপনার নিকটে দীক্ষিতাও হয়েছিলাম। আপনার কাছে দীক্ষা পেয়েছিলাম ব'লেই চখমুখ বুজে আমি এতদিন এই অত্যাচার সহ্য কত্তে পেরেছি।

বলিয়াই মেয়েটী আবার কাঁদিতে শুরু করিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভ্রমণ-পথে আমি তোমার স্বামীকে দেখেছি। সর্ব্বাঙ্গে দূষিত ক্ষত নিয়েও সে হরিওঁ কীর্ত্তনে মেতে যায় এবং ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে আলিঙ্গন দেয়। বর অন্বেষণের চেষ্টা ক'রো না মা। পত্যন্তর গ্রহণের অনুমতি রইল কিন্তু বর্ত্তমানের স্বামীকে আরও পাঁচ বৎসর কাল সুস্থ হবার সুযোগ দাও।

রমলা বলিল, তাঁর দেহের রোগকে ত' আমি ভয় করি নাই বাবামণি। আমি সাদরে রুগ্ন স্বামীকে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তাঁর হিংস্র মনকে নিয়ে আমি কি কর্ব্ব? এত হিংসা, এত আক্রোশ, এত মিথ্যাচরণ, এত অপমান সহ্য ত' করা যায় না বাবামণি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তথাপি পাঁচ বৎসর প্রতীক্ষা কর। পত্যন্তর গ্রহণের মত কাজ হঠাৎ কত্তে নেই। কারণ, পুনর্ব্বিবাহেরও ঝুকি আছে। সম্ভবপর হ'লে, শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে, কুমারীর মত জীবন-যাপন ক'রে সৎ-জীবিকার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিপালন ও জনসেবা।

পূর্ব্বঅলকা (পরশুরাম, নোয়াখালী)
২২শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪২
(৯ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়া উঠিয়াছেন পূর্ব্বঅলকার পোদ্দারদের বাড়ীতে। শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র পোদ্দার, শীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র পোদ্দার দুই মাতুল এবং শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন পোদ্দারের এক ভাগিনেয়, ইঁহাদের ইহা মিলিত সংসার। ইঁহারা তিন জনেই দেশ-প্রচলিত বহু কুসংস্কারের উর্দ্ধ জগতে বাস করেন বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে অনেকে ইঁহাদের একটু ভীতির দৃষ্টিতে দেখেন কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও চরিত্রের দৃঢ়তায় ইঁহারা অতুলনীয় বলিয়া শ্রদ্ধাও করেন। রেবতী মোহন মিষ্টভাষিতায় এবং মধুর ব্যবহারের জন্য

সকলের বিশেষ প্রিয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিজের ভিতরে শ্রেষ্ঠত্ববোধ না থাকিলেও বাহিরের লোকেরা এমন লোকদের প্রতি সম্মানের দৃষ্টিতে না তাকাইয়া পারেন না।

সুতরাং দেশপ্রচলিত অনেক সংস্কারের উর্দ্ধদেশে অবস্থিত তিনটী হরিহরাত্মার গৃহে এক মহতের আগমন-সংবাদে স্বাভাবতই চতুর্দ্দিকের গ্রামগুলিতে একটা অসাধারণ সাড়া পড়িয়া গেল।

পূর্ব্বঅলকার পোদ্দার-পরিবার

কোলাপাড়া-নিবাসী একটী যুবক প্রশ্ন করিল,—আপনি পরশুরাম রেলষ্টেশানের নিকটবর্ত্তী কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে না উঠিয়া ষ্টেশান হইতে এত দূরে পূর্ব্বঅলকাতে উঠিলেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—অনেক কারণে। প্রথম কারণ, এঁরা আমাকে ডেকেছেন, অন্য কেউ ডাকেন নি। দ্বিতীয় কারণ, আমি এই বাড়ীতে আস্‌ব আশায় এঁরা দশ বৎসর আগে থেকে আস্তে আস্তে নিজেদের চেষ্টায় এবং অপরের উপদেশ বা প্রণোদনা-বিনাই নিজেদিগকে এমন কতকগুলি গ্রাম্য সংস্কারের উর্দ্ধে নিয়ে স্থাপন করেছেন, যা' আমার কাছে বড়ই প্রীতিপ্রদ। তৃতীয়তঃ এঁরা নিজেরা ব্যক্তিত্ব-বোধে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বও নিজ গৃহ থেকে ষ্টেশান অর্থাৎ বাজার পর্য্যন্ত চলাচলের রাস্তাটুকুকে নিজেদের ব্যয়ে এমন ভাবে তৈরী ক'ম্বরে

দিয়েছেন, যাতে অন্য লোকেরা নিশ্চিতই নিরাপদে,—কি পায়ে হেঁটে, কি গোযানে ক'রে, বর্ষাকালেও নিরুদ্বেগে চলাচল কত্তে পারে, গায়ে কাদা না লাগে, হাঁটু কাদায় না ডোবে। একাজের জন্য এঁরা সর্ব্বসাধারণের কাছে টাকা তোলেন নি, জেলা বোর্ডের দারস্থ হন নি, বাধাপ্রাপ্ত জমি নিজেদের ঘরের টাকা দিয়ে কিনে রাস্তা ক'রে দিয়েছেন সর্ব্বসাধারণের জন্য। অথচ এঁরা লক্ষপতি বা কোটিপতি নন, স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী মাত্র। রংপুরে ব'সে এঁদের আমন্ত্রণ-লিপি যখন পাই, তখন আমি ফেণীতে পত্র দিয়েছিলাম, এঁদের বিষয়ে বিস্তারিত খবর জান্‌তে।

সদ্‌গুরুর শুভাগমনের প্রাক্‌প্রস্তুতি

সলিয়া-নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন,—হাঁ বাবা, আমরা একথা স্বীকার করি। জীবনে সদ্‌গুরুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্ব-সূচনার প্রয়োজন আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই আছে। যে নিজেকে যত অধিক পরিমাণে গ্রাম্য কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা কর্ব্বে, যে নিজেকে সংযমের পথে আরূঢ় কর্ব্বার জন্য যত প্রয়াসী হবে, জীবনে শাশ্বত সত্যকে নূতন ক'রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে যত অধিকতর আগ্রহী হবে, যথার্থ

সদুপদেশদাতা সদ্‌গুরুর শুভাগমন তার জীবনে তত সহজ, তত সার্থক ও তত সময়োপযোগী হবে। বহুদেববাদের জটিল গ্রন্থি-মোচন মানুষের সকল সময়েই একাকী-সাধ্য ব্যাপার নয়, গুরুর শক্তি, গুরুর প্রেরণা এই ব্যাপারে অমোঘ। আবাল্য তোমরা তোমাদের চেয়ে অধিক বয়স্ক লোকদের মুখে কেবলই শুনে আস্‌ছ, 'অমুক রোগে অমুক দেবতার, অমুক বিপদে অমুক গ্রহের, অমুক অসুবিধায় অমুক যজ্ঞের শরণাপন্ন হও,'—এবং তারা তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় ব'লেই তাদিগকে নির্ব্বিচারে জ্ঞানী ব'লে ভ্রম ক'রে তাঁদের বাক্যানুসরণ করেছ, অন্ধের মতন তাঁদের পদানুবর্ত্তন করেছ, কিন্তু শিশুকাল থেকে তারাও যে অজ্ঞানতারই করেছেন আরাধনা, জ্ঞানের রাস্তা মাড়ান নি, প্রচলিত কুসংস্কারগুলিরই করেছেন অনুশীলন, নিজেদের স্বাধীন চিন্তা ও সদসদ্‌বিবেকের করেন নি সদ্ব্যবহার আর তারই ফলে একটী অজ্ঞান শিশু কেবল বয়সে বেড়ে বেড়ে সুদীর্ঘ জীবন যাপন ক'রে কালে পরিণত হয়েছে একটী অজ্ঞান বৃদ্ধে এবং তাঁর বয়সের মহিমাকেই তাঁর জ্ঞানের মহিমা ব'লে ভ্রম ক'রে তোমরা করেছ তার পদাঙ্কানুসরণ,—এই কথাটী প্রায় সর্ব্ব-সময় রয়েছে বিবেচনা-বৃত্তের বাহিরে। পিতৃ-পুরুষানুক্রমে জ্ঞান যেমন সঞ্চিত এক বিশাল সম্পদ হয়, পিতৃপুরুষানুক্রমিক সুসংরক্ষিত অজ্ঞানতাও তেমন এক কল্পনাতীত বিশাল জঞ্জালের স্তূপই সৃষ্টি করে। মানুষের কুসংস্কার ভাঙ্গবার জন্য বারংবার

মহতেরা এসেছেন কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই জন্ম নিচ্ছে অজ্ঞানতা নিয়ে। বিপদ ঘটেছে সেইখানে।

বংশানুক্রমিকতার প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরবে, পারস্যে, মিশরে, গ্রীসে, রোমে, ইংল্যাণ্ডে, জার্ম্মানিতে বা অন্যান্য বহু দেশেও বহুদেববাদ ছিল। ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীগুলি ঐ সব দেশকে বহুদেববাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছে। সেখানে বাধা ছিল যা' যা' তাদের সবগুলিকে অস্ত্র বা যুক্তি অনায়াসে জয় কত্তে পেরেগুছ। বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত-করণে বা একই লক্ষ্যে বহুবর্ষব্যাপী অনলস প্রচারণার ফলে মানুষের পূর্ব্বসংস্কার বাধ্য হ'য়ে হঠাৎ বা বিচার-শক্তির ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে এসকল দেশের অধিবাসীদের বহুদেবে আস্থা বিনাশ-প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু রক্তস্রোত, উৎপীড়ন, প্রলোভন বা যুক্তিশাস্ত্র ভারতের নানা দেবদেবীর উপাসকদের মনে সেই পরিবর্ত্তন আনতে পারে নি। তার একমাত্র কারণ, ভারতের আদি আধ্যাত্মিক চিন্তার মধ্যে বিশ্বদেববাদ ছিল, এক দেবতার মধ্যে সব দেবতা আছেন, সব দেবতার মধ্যে এক দেবতা আছেন, এই উপলব্ধি ছিল। আর, নিজেরা একের, অদ্বিতীয়ের, তুলনারহিত অনন্যের উপাসক হ'য়েও চারিদিকের নানা খণ্ড দেবতার উপাসকদের প্রতি এঁদের ছিল ক্ষমাসুন্দর সহিষ্ণুতা।

ফলে এক-ব্রহ্ম-বাদী আর্য্য-সাধক নিজের সাধনার সমগোষ্ঠীদের সংখ্যা বাড়াতে পারেন নি। আচারে, ব্যবহারে, নীতিবোধে অনার্য্যদের ভিতরে সমুন্নতি আনয়নে সমর্থ হ'লেও ভারতীয় আর্য্যেরা নিজেদের একব্রহ্মবাদকে ব্যাপক বিস্তার দিতে পারেন নি বা দিতে চেষ্টা করেন নি ব'লে মনে কত্তে হয়। কিন্তু বহুদেববাদের সংস্কার থেকে মুক্ত ব্রহ্মবাদকে স্থায়ী আসনে বসাতে হ'লে পুরুষানুক্রমিকতার হচ্ছে প্রয়োজন। অতএব আমি তেমন গৃহস্থদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, যারা বংশানুক্রমে একের করবে বন্দনা, একের করবে সাধনা, একের সেবার উদ্দীপনা নিয়ে জীবন সংগ্রামের শত সহস্র ব্যূহ করবে রচনা। আজকের কুমার কুমারীরা একদিন হবে গৃহস্থ ও গৃহিণী, এবং পুরুষানুক্রমিক সত্যের সাধনাকে ধারাবাহিকতায় প্রাণোজ্জ্বল রাখার ব্যাপারে তারাই হচ্ছে আমার আশা ও ভরসার একান্ত আধার।

গুরু

কোলাপাড়ার যুবকটি প্রশ্ন করিল,—আপনি কি তা' হ'লে রেবতী বাবুদের আজ দীক্ষা দেবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—পাগল হয়েছ? দীক্ষা লাভের জন্য এই বাড়ীর প্রত্যেকটী প্রাণীর দেহ-মন-প্রাণ আকুল হোক্, অধীর হোক, তবে ত' দীক্ষা দিব বা দিব-না, সেই কথাটা উঠবে! দেখ্‌লাম, একজন তার কাণটা আমার

মুখের কাছে এনেছে আর অমনি তাকে একটা মন্ত্র দিয়ে বস্‌লাম আর বল্লাম, এই বাবা তুমি আমার শিষ্য হ'য়ে গেলে, এমন গুরু আমি নই। দেখ্‌লাম, দুদিন ধ'রে সেবা-যত্ন ক'রে ধর্ম্ম-পিপাসু দম্পতী মনে মনে অশেষ আত্ম-প্রসাদ অর্জ্জন করেছে, আর অমনি কাণ দুটো আমার ঠোঁটের সামনে টেনে এনে একটা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ব'লে দিলাম, এই আমি তোদের গুরু হলাম,—আমি সেই শ্রেণীর গুরু নাই। এত সস্তায় যদি গুরু হওয়া যেত, তবে গুরু শব্দটার সঙ্গে এত মর্য্যাদা, এত মহিমা, এত মাধুর্য্য কদাচ সংযুক্ত হ'ত না। ট্রেণে, ষ্টীমারে, সভাস্থলে, হাট-বাজারে, রেল-ষ্টেশনের বিশ্রাম-শালায় যাকেই দেখ্‌ব প্রণাম কত্তে এসেছে, তারই কাণে একটা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে দিয়ে তাকে আমার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত কত্তে হবে, মানসিক এমন কোনও দুর্ব্বলতা আমার নেই। যার কাণে মন্ত্র একটী উচ্চারণ ক'রে শোনাব, তার কাছে আমার প্রত্যাশা থাক্‌বে, নয়-পুরুষ-ব্যাপী ধারাবাহিক সাধনার, তিনশত বৎসর-ব্যাপী সুগভীর আত্মোন্নয়ন-প্রচেষ্টার, সমগ্র দেশ, জাতি ও জগতের ভাবী অভ্যুদয়ের প্রতি প্রখর-দৃষ্টি প্রসূত অভিনন্দন-মনোভাবের। আজ আমি গুরু হলাম মাত্র সমসাময়িক একটা বিশেষ অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য, আর গুরু হলাম শুধু একটা লোকের ব্যক্তিগত কুশলের জন্য,—গুরুর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে

আমার উপলব্ধি মাত্র এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং প্রতীক্ষার আমার প্রয়োজন আছে এবং প্রতীক্ষার আমার সামর্থ্যও আছে। একদিন এই পরিবারের ছোট-বড় প্রত্যেকটী প্রাণী যখন দীক্ষা লাভের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সাশ্রু-নয়নে বল্‌বে,—বাবা, শরণ নিলাম, আশ্রয় দাও, কৃপা কর,—দীক্ষা সেদিন দিব। * কত কত লোককে কত স্থানে দীক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু তার মধ্যে কয় জন আগে থেকে ঘরের জঞ্জাল সাফ করেছে? কয় জন নিজেদের তপস্যাকে পুরুষানুক্রমিক কত্তে চায়?

পোদ্দার-বাড়ীর জনসভা

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় পোদ্দার বাড়ীর উঠানে একটী জনসভা হইল। জনতা প্রায় সাত আট শত হইল। তন্মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা খুবই অধিক ছিল এবং যুবক ছিল প্রায় তিনশত। বক্তৃতা শ্রবণ-কালে যুবকদের মধ্যে এত আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়াছিল যে, শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা-প্রসঙ্গেই বলিলেন,—উচ্চভাব যারা অন্তরে সুদীর্ঘ কাল এবং সযত্নে

* পরবর্ত্তী কোনও সময়ে এই বাড়ীর প্রত্যেকটী প্রাণীর দীক্ষা ঠিক এই ভাবেই হইয়াছিল এবং সুখের বিষয় এই যে, পোদ্দার-বংশের একটী দুইটী শাখায় শ্রীশ্রীবাবামণির প্রদত্ত সাধন পুরুষানুক্রমিকতায় সংবর্দ্ধিত হইবার সংসম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাইতেছে।

পোষণ কত্তে পার্ব্বে, জান্‌বে মহৎ সৃষ্টির অধিকার এবং দায়িত্ব ভগবান্ তাদের হাতে একদা নিশ্চয়ই তুলে ধর্‌বেন। *

দাম্পত্য-জীবনে সংযম-সম্বন্ধে যখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতেছিলেন, তখন অনেক তরুণী সধবার-মুখমণ্ডল যেন চন্দ্রসমপ্রভ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ভাব দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দাম্পত্য জীবনে সংযম-পালন যে মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়, এটা তোমরা এক মাসের চেষ্টাতেই যে-কেউ প্রমাণ ক'রে দিতে পার। সেই সামর্থ্যের সংবাদ আমি তোমাদের মুখে চখে আহরণ কত্তে পাচ্ছি। †

আনন্দিত মনে ব্রহ্মচর্য্য ও সৎসাহস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অকৃতদার অবস্থায় পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য

* একথা সত্য হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে পরশুরামে শ্রীশ্রীবাবামণির এক আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহাতে পরশুরামের ও চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম-সমূহের যুবকেরা দলে দলে আসিয়া কায়িক শ্রম করিয়া সদৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। দেশবিভাগের পরে নানা পাকিস্থানী জটিলতার মুখে পড়িয়া সেই বিরাট আশ্রমটী উঠিয়া গিয়াছে।

† সত্য সত্যই নিকটবর্ত্তী কয়েকটী পল্লীর যুবতী বধূরা নিজ নিজ স্বামীর সহযোগিতায় সুদীর্ঘকাল দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য পালনের সফল দৃষ্টান্ত দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পালন সহজসাধ্য। শুধু একটু যত্ন ক'রে একটু চেষ্টা ক'রে কুসঙ্গ, কদালাপ ও কুচর্চ্চা থেকে দূরে থাক্‌তে হয়। কুমারী অবস্থায় মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্য পালন অতীব সহজ, শুধু প্রাণপণ যত্নে পুরুষদের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকতে হয়। অবোধ বালক বা সরলা বালিকাকে প্রতারণা করার লোকের অভাব নেই, সুতরাং তাদের সতর্ক থাক্‌তে হয়। নিয়ত সতর্ক থাকা তাদের একটা বড় সাধনা। সর্ব্বদা সশঙ্ক অবস্থায় থাক্‌লে মনোবিকারের সৃষ্টি হ'তে পারে, এজন্য তাদের প্রয়োজন সানন্দে ও সাহ্লাদে ব্রহ্মচর্য্যকে ব্রতরূপে গ্রহণ করা। সানন্দ চিত্তে যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তার মনে শঙ্কার চেয়ে সাহস থাকে বেশী। 'বিপরীত অবস্থা এলে আমি নিশ্চয় পদাঘাতে তাকে চূর্ণ কর্‌ব,'—এই প্রতিজ্ঞা তার ভিতরে জাগে। এই সাহস প্রকৃত প্রস্তাবে সৎসাহস। সৎসাহসকে সঙ্গী কর আর আনন্দিত মনে সংযম-ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।

স্বামীকে সংযম-পথে টানিয়া আন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যুবতী সধবারা প্রায় প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেছে যে, তাদের স্বামীরা যে প্রায় প্রতি রজনীতে

ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়, তার প্রধান কারণ তাদের শারীরিক প্রয়োজন নয়, তার প্রধান কারণ তাদের মোহ ও অভ্যাসের ক্রীতদাসত্ব। শারীরিক প্রয়োজনের তাগিদে পুরুষ তার পত্নীতে আসক্ত হবে, এটা কোনো পাপ কাজ নয়। এটার প্রয়োজন আছে। শরীর যখন সত্য সত্যই রমণকে করে আকাঙ্ক্ষা, তখন তাকে তার প্রার্থনা পূরণ কত্তে দেওয়াই স্ত্রীর কর্ত্তব্য কিন্তু অধিকাংশ সময়েই পুরুষের পক্ষে ব্যাপারটা ঠিক তাই নয়। প্রত্যহ একটা কাজ প্রয়োজনে ও নিষ্প্রয়োজনে কত্তে কত্তে অভ্যাসের কাছে এমন দাসখৎ এক একজন পুরুষ লিখে দেয় যে, যখন যা দরকার নয়, তখনো সে তা' কর্ব্বেই কর্ব্বে, তাকে বাধা দিয়ে ঠেকানো এক শক্ত ব্যাপার। এই সকল স্থলে প্রত্যেক স্ত্রীর উচিত নিজ নিজ স্বামীর বোধোদয় ঘটাবার জন্য একটু শক্ত হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের স্বাভাবিক প্রেমের বলে স্বামীকে প্রবোধ দেওয়া। দুচারবার এরূপ চেষ্টা বিফল হ'য়ে যেতে পারে কিন্তু সত্যি সত্যি দরদী মন যদি হয় কোনো স্ত্রীর, সে নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে স্বামীর মদমত্ত হস্তীর মতন অবুঝ মনকেও বাগে আনতে পারে। এর শত শত দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র রয়েছে এবং যত স্থানে যত দম্পতী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে সমর্থ হয়েছে, তার শতকরা পঁচানব্বইটী স্থানেই স্ত্রীর মহত্ত্ব স্বামীকে সংযমের পথে টেনে এনেছে।

বক্তৃতা দুই ঘণ্টা কাল হইল।

পূর্ব্বঅলকা (পরশুরাম) নোয়াখালী
২৩শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
(১০ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

অবিবাহিতা বয়স্ক কন্যার শাসন সম্পর্কে

দিনাজপুর জেলান্তর্গত কুশমণ্ডী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যাকে যে-কোনও বিষয়ে শাসন করিতে যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনার এবং বাক্-সংযমের প্রয়োজন আছে। মধুর করিয়া যে কথাটি বলা অসম্ভব হইবে, পারতপক্ষে সেই কথাটী উচ্চারণ না করাই হইবে সঙ্গত। রাগের ঝোঁকে বা অভিমানের বশে কিম্বা কাহারও কুপরামর্শে উদ্ভিন্ন-যৌবন কন্যা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলে তাহার সম্ভাবিত বিপদ ও অবশ্যম্ভাবী অপবাদ তাহার জীবন-গতিকে শেষ পর্য্যন্ত কোন্ পথে পরিচালিত করিবে, তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাবকে শাসন করিবার জন্য হিতবাক্য বলিবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে কিন্তু যৌবন এমনই একটা বয়স, যে বয়সে আত্মসম্মানকে ক্ষুন্ন করিয়া কেহ কিছু বলিলে বা করিলে সেই বলার বা করার মধ্যে যুক্তিযুক্ততা যতই থাকুক না কেন, আহত অভিমান সেই কথা বিবেচনা করিয়া

নিজের ক্রুদ্ধ ফণাকে গুটাইয়া নিতে সম্মত হয় না। যাহাকে উপদেশ দিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা, তাহাকে কৌশলে কাবু করিবার ফিকির দেখিতে হইবে। তবে, সেই কৌশলের মধ্যে মিথ্যার সংযোজন ঘটিলে অনর্থপাত ঘটিবার সম্ভাবনা অত্যধিক, জানিও। আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা বা নৈতিক সদুপদেশ সেই কর্ণে মধুবর্ষণ করে না, যাহা যৌবন-মদমত্ততার বিভ্রান্ত গুঞ্জনে নিয়ত ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শুনিতেছে। বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারীর পিতামাতার যে নিশীথে নিদ্রা আসে না আর দিবসে দুশ্চিন্তা ছাড়ে না, তাহার কারণই ইহা। যাহাতে বয়স্ক কন্যার জীবনে দুর্গতির রেখাপাত না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য কন্যার জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই পিতামাতার সতর্ক ভাবে অগ্র-প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটী তাহার পুত্রের সম্পর্কেও সমভাবে সত্য কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মে পুত্র সম্পর্কে পিতামাতার দুশ্চিন্তা আংশিক ভাবে কম।

পুত্রের সম্পর্কে সতর্কতা

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার কন্যা পরের গৃহে বধূ-রূপে যাইয়া সেই বংশের চিরাচরিত বিশেষত্বকে স্ফুটতর করিবার জন্য জননীত্ব স্বীকার করিবে কিন্তু তোমার পুত্র হইতে তোমার নিজ বংশধারার

মহিমা হইবে প্রতিষ্ঠিত এই কারণে পুত্রের ব্যাপারে তোমার দুশ্চিন্তা কিছু কম হইলেও দায়িত্ব কম নহে। তোমার পুত্রকে তাহার কোনও বাচাল বন্ধু যদি এই কথা শুনাইতে থাকে যে, বিবাহ করিয়া ত' দাম্পত্য জীবন-যাপন করিতেই হইবে এবং পত্নীকে পরিপূর্ণ সন্তোষ-দান একটা প্রাথমিক কর্ত্তব্য, আর এই কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে পালন করিবার জন্য রিহার্সালের প্রয়োজন আছে এবং সেই শিক্ষানবিশীটী কচি বয়সের গণিকার নিকটে গিয়া নিঃসঙ্কোচে কিঞ্চিৎ রজতমূল্যে করিয়া আসা যায়, তাহা হইলে তোমার পুত্র যে বিচলিত ও প্রলুব্ধ হইবে না, তাহার কি কোনও নিশ্চয়তা আছে? সুতরাং যে ছেলে সম্পর্কে তুমি তোমার বয়স্ক কন্যার চেয়ে বেশী নিশ্চিন্ত, প্রকৃতই কি তুমি তাহার সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পার? দাম্পত্য জীবনের শিক্ষানবিশীটুকু করিবার জন্য তোমার পুত্র গণিকা-সংসর্গ করিল এবং ঔপসর্গিক যৌন রোগে আক্রান্ত হইল। তারপরেই তাহার বন্ধুরা যদি অবিরল তাহাকে উপদেশ দিতে থাকে যে, এই রোগের প্রতীকার ঘটিবে কুমারী-সংসর্গে, তখন তোমার পুত্র কতগুলি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিতামাতার বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তা কুমারী কন্যার যাবজ্জীবনের মত সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার জরায়ুতে করিবে রোগ-সঞ্চার, তাহার শোণিতে করিবে বিষ-সঞ্চার, তাহার গুপ্ত অঙ্গে করিবে কণ্ডুয়ন-সৃষ্টি, তাহার কি কোনও ইয়ত্তা আছে? সুতরাং

তোমার কন্যা সম্পর্কে তোমার যেমন সাবধানতা প্রয়োজন, তোমার পুত্র সম্পর্কে সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে কোনও অংশে কম নহে।

ভবিষ্যতের গৃহীরা যাহা করিবেন

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

"তোমরা যে পুত্রকন্যার পিতামাতা হইয়াছ, ইহা দ্বারা তোমরা কেবল দুশ্চিন্তা আর দুঃস্বপ্নেরই উত্তরাধিকার অর্জ্জন কর নাই, ইহা দ্বারা তোমরা এক সুসম্ভাবিত সুমহান গৌরবেরও আস্পদ তথা অধিকারী হইয়াছ। তোমরা এক দেবমানব-গোষ্ঠী সৃষ্টির আদি পিতা ও আদি মাতা হইতে পার। নিজেদের জীবনে যে সুকৃতিকে করিয়াছ অনুশীলন, তাহারই প্রতি পুত্রকন্যাদের রুচিকে আকৃষ্ট করিয়া এবং প্রকৃতিকে অনুগামিনী করিয়া তোমরা ইন্দুরের বংশে ঐরাবত জন্মাইতে পার, কণ্টক-বনকে কমল-কাননে রূপান্তরিত করিতে পার, হিংস্র নারকীকে প্রেমময় দেবতায় পরিণত করিতে পার। শিশিরবিন্দু সম ক্ষুদ্র একটা শাদা ফুলের বীজ বিরাটকায় মাঘী ফুলকফিতে পরিণত হইয়াছে বংশানুক্রমিকতার যে স্বাভাবিক শক্তিতে, তোমরাও ঠিক সেই শক্তিকে নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূলে ব্যবহার করিয়া সাধারণ মানুষ-জাতিকে

এক নরদেবতার জাতিতে উন্নয়িত করিতে পার। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীরামকৃষ্ণই কেবল নারায়ণ হইবেন কেন, তোমাদের বংশানুক্রমিক সাধনা ও অনুশীলনের ফলে ভাবী বংশধরেরা সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে কোটিতে কোটিতে পূর্ণ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ প্রতিবিম্ব হইয়া ভূতলে আবির্ভূত হইবেন,—এই গৌরব-সম্ভাবনার তোমরা পরমাশ্রয়। এই জন্যই আমি গৃহীদের প্রতি এমন একটী অসাধারণ সম্ভ্রম-সিক্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকি, যাহা আমার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ অধিক লোকে করেন নাই। অতীতের গৃহীরা কি করিয়াছেন, মাত্র প্রশংসমান দৃষ্টিতে সেইটুকু দেখিয়াই আমি তুষ্ট রহিতে পারি নাই, ভবিষ্যতের গৃহীরা যে অসাধ্য-সাধন নিশ্চিতই করিবেন, তাহা ভাবিয়াই আমি কখনো ধ্যানস্তিমিত-লোচন, কখনো বা রোমাঞ্চিততনু।"

কাম-বিকার স্বাভাবিক

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"মানুষের বংশবিস্তার পৃথিবীতে কম পক্ষে কয়েক লক্ষ বৎসর ধরিয়া একটী সুনির্দ্দিষ্ট দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া ঘটিয়াছে। একজন যীশুখ্রীষ্টের মাত্র অপৌরুষিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়া জন্ম গ্রহণের কাহিনী শুনিতে পাই, একজন

যুধিষ্ঠিরকে যোগবলে বিদুর কর্ত্তৃক জন্মদানের কথা ভারত-পুরাণে নাকি একবার খুব অস্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু মাতৃজরায়ুর আশ্রয় তাহাদেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। কর্ণ, অর্জ্জুন, ভীম, এমন কি, মাদ্রীসুতদেরও জন্ম দেবতাদের দ্বারা ঘটিলেও তাহাতে গর্ভদাতা ও গর্ভগ্রহীত্রীর মধ্যে শারীরিক ঠিক্ সেই ব্যবহারগুলিই প্রয়োজন হইয়াছিল, যাহা অদ্যকার দিনের অতি সাধারণ অদেবতা দম্পতীরও সন্তান-জননের ব্যাপারে প্রয়োজন হয়। মানুষ-রূপে বিকশিত হইবার প্রারম্ভ-মূহূর্ত্ত হইতেই এই জীবটীর জন্মদান ও গর্ভগ্রহণ-প্রথা যে-সকল শারীরিক ক্রিয়ার অঙ্গীভূত ছিল, আজও ঠিক তাহাই বিদ্যমান রহিয়াছে বিধায় যে-কেহ মানুষ-রূপে জন্মগ্রহণ করুক, তাহারই জীবন-মধ্যে ঐ সুনির্দ্দিষ্ট একটী প্রক্রিয়ার অনুশীলনের দিকে স্বাভাবিক একটী ঝোঁক থাকিয়াই যায়। এজন্যই একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে এক এক প্রকারের সুনির্দ্দিষ্ট মনোবিপ্লব প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কৈশোরোদ্‌গমের সময় হইতেই কি পুরুষ কি নারী প্রত্যেকের পক্ষে উদ্দাম কাম-বিকার স্বাভাবিক। কিন্তু এই কামবিকারকে নিরঙ্কুশতার অপবাদ হইতে মুক্ত করিয়া সুদক্ষ ধানুষ্কের হস্তধৃত ধনুর্ব্বাণের ন্যায় একান্ত অনুগত করিবার সামর্থ্যও মানুষেরই আছে।"

কামজয়ী গৃহস্থের সন্তানার্থে প্রস্তুতি

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"কামকে করায়ত্ত করিয়া কামক্রিয়াকে একটা অনুশীলনের পর্য্যায়ে আনিয়া একদা মানুষ তাহার জান্তব ব্যবহারকে দিব্যভাবানুপ্রাণিত সন্তান-সন্ততির জন্মদানের কাজে অতীব কুশলতার সহিত যে ব্যবহার করিতে পারিবে, এই বিশ্বাস আমার সুগভীর, দম্পতীর জীবনের প্রতি এই আস্থা আমার অপরিমেয়। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, এই জন্যই এক শ্রেণীর সাধকদের ভিতরে কামাঙ্গকে দৈবী-সম্পদের আধার বলিয়া বিবেচনা করা হইত এবং ব্যবহারকে ঈশ্বর-সাধনের প্রতিরূপ বলিয়া মর্য্যাদা দান করা হইত। মনকে কেবল কামাবেগকালে নন্দিত করিবারই উদ্দেশ্যে নহে, পরন্তু কামরূপ বিষাক্ত পারদকে বিষমুক্ত করিয়া জীবনের পরম-রসায়ন মকরধ্বজে পরিণত করিবার লালচে এই জন্যই একদা কামচর্য্যাকে ধর্ম্মচর্য্যায় পর্য্যাবসিত করিবার এক কল্পনাতীত অধ্যবসায় গুপ্ত ভাবে ভারতীয় সাধক-সমাজের একাংশে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। ইহা যখন সুনিশ্চিত যে, সন্তান-লাভের জন্য মানুষ-জাতি বহু লক্ষ বৎসর ঠিক একই শারীরিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াছে এবং একই অঙ্গ-সমূহকে ঠিক একই ভাবে ব্যবহার করিয়াছে, তখন ইহাও

অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে যে, এই একই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত একই ভাবে ব্যবহার করিয়া তাহাকে তাহার পরবর্ত্তী বংশধরদের পাইতে হইবে,—যদি বিকল্প কোনও অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক নূতন ব্যবস্থা ইহার স্থানাধিকার হঠাৎ করিয়া না বসে। সুতরাং কামক্রিয়াকে নিশ্চয়ই একটা আলাদা অনুশীলন বা বিদ্যা হিসাবে গ্রহণ করিয়া দম্পতীরা অর্থাৎ কামশাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীরা, ইহার মধ্য দিয়া নবাবিষ্কারের সম্ভাবনাকে নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারে। একই সনাতন কামাঙ্গ-সমূহের এবং একই সনাতন দৈহিক আচরণের স্থায়িত্বের গ্যারাণ্টি যখন কয়েক লক্ষ বৎসরের জন্য মিলিয়া গিয়াছে, তখন কামক্রিয়ানুশীলনের পশ্চাৎপটবর্ত্তী মনোভাব-সমূহের বিব্যায়নের ভিতর দিয়া মানুষ নূতন মানব-জাতির সৃষ্টি বা অবতরণ নিশ্চয়ই সম্ভব করিতে পারে এবং নবমানব-জাতির আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনাকে ক্রতায়িত করিবার জন্য প্রতিটি দম্পতীর, অর্থাৎ সন্তানের মাতাপিতার, তাহারই সাধনা করিতে হইবে। প্রকরণ ও জনন-যন্ত্র ঠিক আদিকালেরই রহিয়া গেল কিন্তু তাহাদের সামর্থ্য, যোগ্যতা, উপযোগিতা, সার্থকতা ও প্রভাব-শক্তি বর্দ্ধনের জন্য মানসিক শুচিতার দিক দিয়া এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দেওয়াই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িল। অর্থাৎ দম্পতীর দেহের ও দেহ-ব্যবহারের যুগান্তকারী কোনও পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়াও তাহার মধ্যে প্রয়োজনীয়

যোগ্যতার পরিবর্দ্ধনের জন্য একদিকে করিয়া যাইতে হইবে কৃচ্ছ্রসাধনা, যাহার অপর নাম ব্রহ্মচর্য্য, এবং কামক্রিয়া-ব্যপদেশে এই দেহকে ব্যবহারের কালে মনকে লোলুপ না রাখিয়া তাহাকে একান্তই ভাবী ইতিহাসের সৃষ্টিকারী এক আত্মাদানকারী প্রভুতে পরিণত করিতে হইবে মনস্তত্ত্বের মধ্যেই বিরাট বিপ্লব সাধন করিয়া। বয়স্ক পুত্রকন্যার শাসন ও পোষণ নিয়া যখন মনে মনে একান্তই উদ্বিগ্ন হইয়াছ, তখন আমি তোমাদের ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রটী দেখাইয়া দিয়া সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে চাহিতেছি যে, তোমার রেতঃ-রূপ অগ্নি যখন তোমার পত্নীর রজোরূপ জলের দিকে তীরবেগে ছুটিতেছে, তখন তাহা তোমাদের কাম-লালসা মিটাইবার জন্য নহে, পরন্তু অগ্নি ও জল রূপ পরস্পর-বিরোধী দুইটী স্থায়ী সত্যের মধ্যে একটী মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্টি করিয়া জগতের ভবিষ্যৎ রচনা করিতে যাইতেছে একটী অধ্যাবসায়—একেবারে সকেলের অজ্ঞাতসারে এবং সকলের দৃষ্টির অগোচরে। প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা শুক্রকে কেবল প্রাণভৃৎদের প্রাণ বলিয়াই জানেন নাই, তাঁহারা ইহার মধ্যে অগ্নিকে তাহার পূর্ণ প্রতিভায় ও অমিত তেজে দীপ্যমান দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পত্নীরাও কেবল প্রাণভৃতের প্রাণাধারটুকুকেই দেখেন নাই, তাঁহারা তাহাতে অন্যতম আদিত্য বরুণের বিপুল মহিমাকে সন্দর্শন করিয়াছিলেন। অতীতের ঋষি একদা যাহা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাহাই

আর একবার নূতন ভাবে যুগোচিত রীতিতে নূতন করিয়া দেখিতে ও নূতন করিয়া বুঝিতে প্রেরণা যোগাইতে চাহিতেছি। আমার অধিকাংশ কথাতেই নূতনত্ব নাই, আমি পুরাতনী কথাকেই নূতন করিয়া বলিয়া যাইতেছি মাত্র।"

জ্ঞানই শক্তি

হাওড়া জেলান্তর্গত বাকশারা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যেটুকু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা সাধারণের দৃষ্টিতে খুবই বেশী বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, তাহাতেই তুষ্ট থাকিও না। আরও অধিক বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য অধ্যবসায়ী হও। ডিগ্রি পাইবার পরেই অনেকে লেখাপড়ার হাল ছাড়িয়া দেয়। এমন ভ্রমাত্মক আচরণ মানুষের পক্ষে দ্বিতীয় আর কিছুই হইতে পারে না। অবশ্য, একটা মানুষকে পৃথিবীর সব বিদ্যাই শিখিতে হইবে, সব ভাষাই আয়ত্ত করিতে হইবে, সব উপাধিই অর্জ্জন করিতে হইবে, সকল বৃত্তিতেই পারঙ্গম হইতে হইবে, এমন জেদের মতন পাগলামী আর কিছুই নাই। যেটুকু বিদ্যা স্বাভাবিক ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছ, তাহা তোমাকে কোনও বৃত্তিতে বা জীবিকার পথে নামাইয়া দিয়া থাকিলে, ঐ বৃত্তি বা জীবিকার পন্থানুবর্ত্তন করিবার কালে সর্ব্বদা হিতকর ও প্রজ্ঞাবলবর্দ্ধক নূতনতর জ্ঞান-

সঞ্চয়ের চেষ্টায় কদাচ কুণ্ঠিত হইবে না, আমার উপদেশ দানেরই ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। দৈনিক দশ বা বিশ মিনিট করিয়া সময় কোনও একটী প্রয়োজনীয় বিষয়ে সুনিয়মিত ভাবে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আহরণের চেষ্টা যদি কাহারও জীবনে দশ বা বারো বৎসরকাল অবিরল ভাবে চলিতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমিক উন্নতিটা হঠাৎ করিয়া কাহারও নজরে পড়িবে না বটে কিন্তু এই কয় বৎসরের লব্ধ জ্ঞান তোমার পক্ষে এক মহাশক্তির উৎস-স্বরূপ হইবে। জ্ঞানই শক্তি একথা মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও কথার কথা হিসাবে তাহাকে মর্য্যাদা দিয়াছি। এই কথাটিকে নিজেদের জীবনে সত্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি অতি অল্প জনেই। আমরা সৎকথাকে নিজেদের জীবনে সত্যাকার অনুশীলন দিবার কোনও চেষ্টা করি নাই বলিয়াই যুগযুগসঞ্চিত শাস্ত্রোপদেশ ও জ্ঞানিজনবাণী আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

ধ্যানই শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"জ্ঞানই শক্তি, একথা যেমন সত্য, ধ্যানই শক্তি একথাও তেমন সত্য। কিন্তু এই সত্যকে জীবনে আস্বাদন করিতে হইলে চাহি এই সত্যকে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ

জীবনকে এই সত্যের অনুশীলনে নিয়োগ। কেবল ভাল ভাল কথা মুখে আওড়াইলেই তাহার শক্তি জীবন-মধ্যে ফুটিয়া ওঠে না। ধ্যানই শান্তির আগার, শান্তির আধার, তাই ধ্যান শক্তিরও আগার, শক্তিরও আধার। প্রত্যহ যদি অল্প অল্প করিয়াও ধ্যান জমাও, তবু সুদীর্ঘকাল পরে তাহাদের সম্মিলিত সুফলটুকু তোমার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকার বজায় রাখিয়া চলিবে। ধ্যানময় মন বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তিকে করে আগ্রাহ্য, দুর্ব্বলতাকে করে জয়, প্রলোভনকে করে লণ্ডভণ্ড, প্রচ্ছন্ন মায়াজালকে অনায়াসে করিয়া যায় অতিক্রম। ধ্যান-শিক্ষাকে বিদ্যাশিক্ষার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করিয়া নিবার চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা একদা এদেশে নিশ্চয়ই অনুভূত হইবে। কিন্তু মনীষী বা ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তিরা ইহার প্রবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত তোমরা সিলেবাস বা কারিকুলামের জন্য ঘরে বসিয়া অলস নিদ্রায় কাল কাটাইবে, ইহা হইতে পারে না।"

মেয়েলী রোগের চিকিৎসা

হাওড়া জেলান্তর্গত জগাছা-নিবাসী জনৈক পত্র-প্রেরিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুরুষের পুরুষালি রোগ থাকিবে, স্ত্রীলোকের মেয়েলী রোগ জন্মিবে, ইহা কোনও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে। ইহা

অসম্ভব, অসঙ্গত বা অনুচিত ব্যাপারও নহে। সুতরাং রোগ হইলে লজ্জা করিবার কারণ কিছু নাই। রোগের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখি না। রোগের বিষয় হিতকারী বান্ধবদের জানিতে না দিয়া সযত্নে চাপিয়া রাখিবার ফলে অনেক সহজে-নিরাময়-সম্ভব রোগ পরিণামে এমন কঠিন হইয়া পড়ে যে, তাহার আরোগ্যের সবগুলি পথ এক সঙ্গে অবরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু বা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ক্লেশ-সমূহকে অপরিহার্য্য করে। মেয়েলী রোগ হইয়াছে বলিয়া ঘাবড়াইয়া যাইতেছ কেন? শরীরটা যখন মেয়ের, তখন কেবল শিরঃপীড়া, কর্ণশূল, আর দন্তশূলই হইবে, অন্য রোগ হইতে পারিবে না, এমন দাবী তোমাদের নিকট কেহ করিবে না। শরীরটা যখন মেয়ের, তখন মেয়েলী রোগ হইলে নিশ্চয়ই হইতে পারে এবং তাহারও চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। শরীরটা যখন মেয়ের, তখন মেয়েলী রোগের চিকিৎসার জন্য স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞের কাছেই যাইতে হইবে এবং সেই বিশেষজ্ঞ নিজে স্ত্রীলোক হইয়া থাকিলে ত' আরও ভাল কথা। স্ত্রীরোগের চিকিৎসক পুরুষ হইয়া থাকিলে তাহার কাছে মাতার বা কন্যার ভাবটী নিয়া গেলে এবং তাহার প্রতি সন্তানের বা পিতার ভাব বজায় রাখিলে তোমার নিজের দিক দিয়া অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবে। অবশ্য, স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞেরা সকলেই কামজয়ী মহাপুরুষ বা স্ত্রী-পুরুষে ভেদ-বুদ্ধি-বিরহিত শুকদেব পরমহংস এমন কথা

হলফ করিয়া কেহ বলিতে পারিবে না। জীবিকার্জ্জনের জন্য নিত্যরুগ্ন স্ত্রী-যোনির পূযরক্ত ঘাটিবার পরেও এমন নরপিশাচ চিকিৎসক জগতে কেহ আছে যে, রোগিণীর শরীর পরীক্ষার ও রোগ-পর্য্যবেক্ষণের নাম করিয়া অন্যায় ঘাটাঘাটি করে। কিন্তু রোগিণীর পক্ষে তাহাকে চিনিয়া নেওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার। কারণ, শরীর-তত্ত্বের দিক দিয়া চিকিৎসকের সত্য সত্য কি কি বিষয় জানা একান্তই প্রয়োজন, তাহা রোগিণীর পক্ষে বুঝিবার কথা নহে। তবে, ফিজিশিয়ানদের রোগ নির্ণয় প্রধাণতঃ মলমূত্র রক্ত, থুথু প্রভৃতি পরীক্ষার মধ্য দিয়াই হয় কিন্তু অস্ত্রোপচারকারক সার্জ্জনকে শরীরটা নিয়া ঘাটাঘাটি না করিলেই চলে না। এই সব ক্ষেত্রে মনের দিক দিয়া সচেতন থাকিয়া চিকিৎসকের হাতে নিজেকে নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া গতি নাই। কিন্তু রোগ নির্ণীত হইবার পরে চিকিৎসায় কোনও ত্রুটি রাখিতে নাই। চিকিৎসার প্রয়োজন শুধু শরীরটাকে আপাততঃ সুস্থ করা নহে। এই শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পরে যে ইহাকে দেশ, সমাজ এবং জগতের কল্যাণের জন্য খাটাইতে হইবে, এই কথাটা বিশেষ ভাবে মনে রাখিয়াই সুচিকিৎসার প্রয়োজনকে স্বীকার করিতে হইবে। আমার বা তোমার দ্বারা যদি দেশ, জাতি ও জগতের কোনও মঙ্গলজনক সেবাই না হইল, তবে শুধু শুধু নিঃশ্বাস আর প্রশ্বাস টানিবার ও ছাড়িবার জন্য এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার সার্থকতাই বা কি, লাভই বা কি আছে?

তুমি জগন্মঙ্গলকর্ম্মী

ঢাকা জেলান্তর্গত বালিয়াটি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহার ভিতরে এককণা দেখিয়াছ সদনুশীলন বা সদনুরাগ, তাহার সহিত মনে প্রাণে লগ্ন হইবে। তাহাকে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করিবে মঙ্গলকর্ম্মে ও কল্যাণ-চিন্তায়। সে মঙ্গল তাহার একার জন্য নহে, দেশবাসী, বিশ্ববাসী সকলের যেন তহাতে কুশল লাভ হয়। মঙ্গল-চিন্তায় বা মঙ্গলমার্গে কাহাকেও দীনদৃষ্টি হীনবুদ্ধি থাকিতে দিও না। তাহার চিন্তা ও চেষ্টা, তাহার ধ্যান ও ধারণা, তাহার উদ্দেশ্য ও উপায় সর্ব্বজনের শুভবর্দ্ধক হইবে। তাহার পিছনে লাগিয়া থাক, তাহার গতিবেগ ও আদর্শবত্তার দৃঢ়তা বর্দ্ধনের জন্য। তাহার পিছনে লাগিয়া থাক, তোমার নিজের কর্ম্মধারাকে স্বচ্ছতর, সুন্দরতর ও অনিন্দনীয় করিবার জন্য। লক্ষ্য রাখিও নিখিল বিশ্বের-অশেষ কুশলকে। চেষ্টাকে করিও তাহারই অনুমোদিত ও অনুগত। সকলকে নিয়া সকলের কুশল সম্পাদনে ব্রতী হওয়ার ভিতরে যে আনন্দের কলোচ্ছ্বাস, তাহার বাস্তব উপলব্ধি হইতে তোমরা যেন একজনেও বঞ্চিত হইও না, পৃথিবীর একটী প্রাণীকেও বঞ্চিত থাকিতে দিও না। যার কর্ম্মশক্তি অল্প, সে অল্পই করুক, কিন্তু কিছু না কিছু কাজ করুক। যার চিন্তাশক্তি দুর্ব্বল ও অদূর-প্রসারী, সে যৎসামান্যই

ভাবুক কিন্তু তার হাতের মুঠার চিন্তাশক্তিটুকুর সে সদ্ব্যবহার করুক। গরুর গলায় যেমন আঠালি লাগিয়া থাকে, তাহার গলায় তুমি তেমনি করিয়া লাগিয়া থাক। তবে, আঠালি-পোকা গরুর রক্তপান করে, তুমি যাহার কণ্ঠ-বিলগ্ন হইয়াছ, তাহাকে নিজের রক্তদান করিয়া দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে তাহাকে বলদান করিও। যাহাকে একবার দেখিয়াছ এই স্নিগ্ধ চোখে, তাহাকে সম্পূর্ণতঃ জ্ঞানের জ্যোৎস্নায় আপ্লুত না করিয়া ছাড়িবে না, এই পণ কর। যাহার সহিত জীবনে একবার মাত্র করিয়াছ বাগ্-বিনিময়, তাহার ব্যক্তিগত প্রতিভাকে তোমার উৎসাহের আলোকে প্রোজ্জ্বলতর করিবার জন্য কর প্রতিজ্ঞা। যে নিজ জীবনে যতটুকু প্রতিশ্রুতি নিয়া আসিয়াছে, তাহার সবটুকু সম্ভাবনাকে বাস্তবতার আলোকে পূর্ণতঃ প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়াই তোমার জীবন-ব্রত, নিজের মত, নিজের পথ অনিচ্ছুক স্কন্ধের উপরে চাপাইয়া দেওয়ার ব্রত বা কর্ম্ম-তালিকা তোমার নহে। আমি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে অশেষ সম্মান করি, অমিত শ্রদ্ধায় তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া থাকি কিন্তু আমার, তোমার এবং সকলের সকল ব্যক্তিত্বের প্রখর প্রকাশ এই একটী সুমহৎ লক্ষ্যে হওয়া প্রয়োজন যে, আমাদের প্রতিজনের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় অধ্যবসায় যেন জগতের সর্ব্বজনের সর্ব্ববিধ কুশলের উপচায়ক হয়। ঘরে ঘরে যাও, জাগরণের ভৈরব-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শোনাও, নিদ্রিতকে কর জাগ্রত, জাগ্রতকে কর কর্ম্মরত,

কর্ম্ম-পরায়ণকে কর জগৎকল্যাণপ্রেরণায় উন্মাদিত। তোমার সাধনা কদাপি তুচ্ছ সাময়িক স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, সম্প্রদায়-গত বা দেশ-বিশেষ-গত স্বার্থে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া তোমার ঘর অথবা অন্য ভাষায় বলিব, তোমার গৃহেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড; তার যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ সমারোহ লইয়া বিরাজিত। এই জন্যই তুমি শুধু মঙ্গলকর্ম্মী নহ, তুমি জগন্মঙ্গল-কর্ম্মী।"

কেমন প্রচারক চাই

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত পরহাট্টা-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাধারণতঃ সকলের সুবিধার দিকে তাকাইয়া কর্ম্মতালিকা করাই সঙ্গত। কিন্তু প্রত্যেকটী প্রাণীর সুবিধা-অসুবিধার সহিত কাজকে খাপ মানাইতে হইলে কর্ম্ম-পরিকল্পনাকে খর্ব্ব করিয়া লইতে হয়; কর্ম্ম যখন দশ জনের হিতার্থে, তখন পরিকল্পনাকে খর্ব্ব না করিয়া কি ভাবে কি করা যায়, তাহা আগে দেখিতে হইবে। ইহার ফলে যদি দুই একজন কর্ম্মীর কাজে অসুবিধা জন্মে, তবে হয় সেই কর্ম্মীদিগকে অসুবিধা সত্ত্বেও কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে নতুবা সেই কর্ম্মীর প্রাপ্য কর্ম্মভার অন্য সুবিধাজনক কর্ম্মীর স্কন্ধে ন্যস্ত করিতে হইবে। কাজের মত কাজ যাহারা চাহে, তাহাদের পক্ষে এইরূপ করা ছাড়া অন্য গতি নাই। কাজ

যদি শুধু বক্তৃতা দান করাই হয়, তাহা হইলেও, তাহাদের জীবনে কর্ম্মাদর্শের প্রতি অনুরক্তি তথা সর্ব্বজনের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতি অনুরক্তি এবং সর্ব্বজনের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য নহে, কেবল ধনবল বা বচন-বাহাদুরীর দৌলতেই তাহারা মঞ্চে দাঁড়াইবার অধিকারী হইতে পারে না। যাঁহাদের জীবন-কর্ম্মে আদর্শ প্রতিফলিত হয় না,—না ত্যাগে, না দানে, না স্বার্থ-বিসর্জ্জনে, না বারংবার চেষ্টার মধ্য দিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পতার প্রমাণ-প্রদানে,—তাঁহারা বিদ্বান্ বা অন্য প্রকারে প্রতিষ্ঠাবান্ বলিয়াই সভাস্থলে আমাদের হইয়া কথা বলিবার অধিকারী হইতে পারেন না। যিনি দুই চারিটি কথা বলিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে চাহেন, তাঁহার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্যই তাঁহার প্রতি আমাদের পক্ষপাতের কোনও যুক্তি হইতে পারে না, তাঁহার চরিত্র ও লক্ষ্য-লাভ-সঙ্কল্পে সাধনারও ইঙ্গিত তাঁহার বাক্যাবলির মধ্যে থাকিবার সুপ্রচুর সম্ভাবনা আমরা নিশ্চয়ই দাবী করিব। যে-কোনও সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মতালিকা,—তাহা যদি আবার সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রসারের রাখে ভরসা,—সফল করিতে হইলে বক্তা, প্রচারক, ব্যাখ্যাতা, প্রবোধদাতা, পরামর্শদাতা প্রভৃতি শ্রেণীর নানা প্রকারের সংগঠন-কর্ম্মীর আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী হইয়া থাকে। কেহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থানে স্থানে যাইয়া মানুষের সহিত সুনির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গগুলি লইয়া আলোচনা করিবেন, কেহ বা নিজ গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ-প্রকল্প পরিচালন করিয়া প্রতিবেশীদের ডাকিয়া

আনিয়া প্রয়োজনীয় কথাগুলি শুনাইবেন, কেহ বা দেশ-দেশান্তরে অবিরত ভ্রমণশীল থাকিয়া সাড়ম্বরে আয়োজিত বিরাট সভাস্থলে উচ্চ মঞ্চ হইতে কম্বুকণ্ঠে নিজের বক্তব্য বলিয়া পাণ্ডিত্যে, গবেষণায়, আলোচনায়, সমালোচনায়, নিত্য নব তথ্য-সমাহারে শ্রোতার কর্ণকে চমকিত করিয়া দিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট একটী সংপন্থার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন,—সংগঠন-কর্ম্মীদের এইরূপ নানা জাতি আছে। যিনি যেই বিশেষত্বটুকু দিয়াই কাজ করুন, চরিত্রবত্তায় যদি তিনি অতুলন হইবার চেষ্টা না করেন, নির্লোভতায়, নিষ্পাপতায়, নিষ্কলুষতায় যদি তিনি মানুষের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা বিনা আয়াসে আহরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে পরীক্ষামূলক-ভাবেও এমন লোকের উপরে কোনও সংগঠনের ভার প্রদান করা হিতপ্রদ হয় না। যাহা করি, তাহাই যদি বলিতে পারি, যাহা বলি, তাহাই যদি করিতে পারি, আমার সকল বলার ও সকল করার একমাত্র লক্ষ্য যদি হয় নিষ্কাম জীবহিত, তবেই আমি একজন যোগ্য প্রচারক বা সংগঠক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিব। লক্ষ্য তোমাদের সুদূরে, এই জন্যই কর্ম্মীর জীবনে শুচিতা ও শুদ্ধতার, সততা ও সাধুতার, সরলতা ও স্বচ্ছতার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। ধাতুদৌর্ব্বল্যের রোগীরা চিকিৎসকের সম্মুখে আসিয়া এক ঘণ্টা ধরিয়া নিজ রোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিবার পরেও মনে করিয়া থাকে যে, তাহার সব কথা বলা হইল না এবং চিকিৎসক রোগের

অবস্থা ঠিক ঠিক বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। ঠিক তেমনি জানিও, যশোলিপ্সু বক্তারা বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যাখ্যাতারা একটা বিষয়ে দীর্ঘকাল প্যাচাল পাড়িবার পরেও মনে করিয়া থাকে যে, শ্রোতারা কিছুই বুঝিল না, আরও বহুক্ষণ তাহাদের কর্ণপীড়া উৎপাদন করা প্রয়োজন ছিল। যাহারা নির্দ্ধারিত সময়টুকুর মর্য্যাদা মানিয়া কথা বলিতে পারিবে না, এমন লোককে কদাচ সভামঞ্চে দাঁড়াইতে দিও না।"

যুবকেরা যুদ্ধের ঘোড়া

হাওড়া জেলান্তর্গত মুগকল্যাণ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যুব-মানসে নানা সময়ে নানা রকম হুজুগের সৃষ্টি হইতে পারে, এবং যাহা মনে করা হইতেছিল সাময়িক চাঞ্চল্য মাত্র, তাহা হয়ত বেশ কিছু কালের জন্য স্থায়ী এক দৃঢ়বদ্ধ মুদ্রাদোষে পরিণত হইতে পারে। যুবকের যৌবনকে যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার এই উচ্ছৃঙ্খলতা বা উন্মার্গগামিতার সম্ভাবনাকেও মানিয়া লইতেই হইবে। ইহাতে ত্যক্ত, বিরক্ত বা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে চলিবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা তাপস প্রাণের মোহন পরশ না পাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে সুদূর-প্রসারিণী দৃষ্টি লইয়া ধীর প্রযত্নে ধারাবাহিক কর্ম্মযজ্ঞে সুনিশ্চিত-সঙ্কল্প-বাহক আহুতির প্রত্যাশা করা হয়ত চলিবে না। এজন্য আমাদিগকে প্রতীক্ষা

করিতে হইবে। যুবকেরা যুবক বলিয়াই চঞ্চল এবং চঞ্চল বলিয়াই করিলে অসামান্য সৎকর্ম্ম অক্লেশে সম্পাদন করিতে পারে, করিলে বা অকল্পনীয় দুষ্কর্ম্ম সাধন করিয়া অকীর্ত্তি ও দুঃখ অর্জ্জন করিতে পারে। আগুন তুষার-শীতল জলকে উষ্ণ করে, ইহা তাহার মহিমা, কিন্তু অসতর্ক ব্যক্তির হস্ত, পদ, গাত্রকে দগ্ধ করিয়া জ্বালা দেয়। লক্ষ্য করিয়া যাও, ইহারা কি করে বা করিতে চাহে। আবেগের উচ্ছলতায় যখন ইহারা দম ফেলিবার জন্য থামিবে, তোমার কথা কহিবার সময় মাত্র তখন। গায়ে পড়িয়া হিতোপদেশ দিতে যাইও না কিন্তু ঠিক প্রয়োজনের সময়টীতে প্রকৃত দিগ্দর্শনযন্ত্রটী তাহার হাতে বিদ্যুদ্গতিতে তুলিয়া দিতে হইবে। যুবকেরা যুদ্ধের ঘোড়া। তাহাদের সহিত মিশিতে হইলে ক্ষিপ্রতা ও উপস্থিত-বুদ্ধির চূড়ান্ত চর্চ্চা চাইই চাই। আর চাই চরিত্র-বল।"

যশকে বড় করিয়া দেখিও না

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত দামোদরদী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎকর্ম্মীর যশোলিপ্সা তাহার কর্ম্মকে ম্লান করে। যশোলিপ্সার ধর্ম্মই এই যে, অল্প করিয়া বেশী প্রশংসা পাইব, কিছু না করিয়া যদি সম্মান পাওয়া যায়, তবে তাহা যে তস্কর-বৃত্তি, ইহা বুঝিব না। অত্যল্প সৎকর্ম্ম করিয়া অত্যধিক যশ পাইবার কামনা থাকিলে সৎকর্ম্মটার প্রতি

মনের নজর থাকে না, কর্ম্মটা একটা উপলক্ষ্য মাত্রে পরিণত হয়। ইহা যেন সাধুবেশ ধারণ করিয়া রাবণ রাজার সীতা হরণের মতন। কীর্ত্তিকার কর্ম্ম করিব না, করিব কর্ম্মের একটু ভাণ বা অভিনয়, কর্ম্মে থাকিবে না গভীরতা কিন্তু প্রসংসা-গুঞ্জনে নিখিল ভুবন মুখরিত করিয়া দিয়া সকলের মুখে নিজের তারিফ শুনিতে চাহিব, ইহা এক নিদারুণ ভণ্ডামি। এই ভণ্ডামি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা না করিলে তোমার সংকর্ম্মের সাধুতা বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সংকর্ম্ম করিলে এবং অবিরাম করিতেই থাকিলে, সংকর্ম্মে একবার লাগিয়া গিয়া সেই কর্ম্মের ধারাকে অত্র অবরুদ্ধ হইতে না দিলে, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস নিরবচ্ছিন্ন প্রযত্নে আদর্শের নিশ্ছিদ্র সেবা করিয়া যাইতে থাকিলে, যশ, কীর্ত্তি, মান ও প্রশংসা তোমার পায়ের তলায় সাগর-বেলার ঝিনুক-খণ্ডের ন্যায় হাজারে হাজারে আর কাতারে কতারে আসিয়া পড়িয়া থাকিবে, তোমার পদাঙ্গুলির একটা কোণার এক কণা স্পর্শ লাভের জন্য তাহারা কাঁদিয়া মরিবে। যশকে বড় করিয়া দেখিও না, কাজকেই বড় করিয়া দেখ। ইহাই হইবে ধর্ম্মোপেত আচরণ।"

অপযশে অরুচি

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"কিন্তু অপযশকে ভয় পাইও না, এমন কথাটা আমি

লিখিতে পারিলাম না। অপযশের ভীতি অনেক সময়ে আমাদিগকে সংকর্ম্ম হইতেও বিরত রাখে, এমন দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু অপযশের ভীতি সাধারণতঃ আমাদিগকে অপকর্ম্ম হইতেই বিরত রাখে অত্যধিক সংখ্যায়। মিথ্যা, চুরি, প্রবঞ্চনা, অনাচার, ব্যভিচার, জালিয়াতি, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষ্যা-পরায়ণতা, চাটুকারিতা, দাসত্ব ও বিবেকহীনতা মানুষকে সর্ব্বদাই অপযশের ভাগী করিয়া আসিয়াছে। আমরা অপযশকে ভয় না পাইলে ঐ সকল কার্য্যে আমাদের রুচি ও রতি অবারিত হইত। কিন্তু অন্তরের ভিতরে আত্মপ্রসাদ ও অনুতাপ এই নামে দুইটী বিপরীত-ধর্ম্মী বৃত্তি রহিয়াছে, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের ব্যাপারে অসামান্য সহায়তা মানব সৃষ্টির আদিযুগ হইতে দিয়া আসিতেছে এবং অনন্ত ভবিষ্যতে দিয়া যইবে। তাহার কাঁটার পানে তাকাইয়া অনেক সংসাহসী ব্যক্তি অপবাদ-সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সুমহৎ কিন্তু প্রশ্নোত্থাপন-যোগ্য সংকর্ম্মে অধ্যবসায় করিয়া থাকেন। যাহা সং বলিয়া বুঝিয়াছি, যাহাকে অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া অন্তরে অনুভব করিয়াছি, যে বিষয়ে অধ্যবসায় বিনিয়োগ করিলে ধর্ম্মচ্যুতি না ঘটিয়া ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি, তেমন কার্য্যে অগ্রসর হইলে দেশ ও সমাজ যদি ধিক্কারও দেয়, তথাপি একাজ না করিয়া ছাড়িব না, ইহা পুরুষসিংহেরই মনোভঙ্গিমা। ইহা প্রশংসনীয়। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণচার্য্য, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন প্রমুখ লোকোত্তর-

চরিত্র পুরুষেরা নিজ নিজ যুগে ধর্ম্মসঙ্গত বা ন্যায়োপেত এমন অনেক কাজ করিয়াছেন, যাহা আমাদের যুগের বিচারে ঠিক সুসঙ্গত কার্য্য নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে, ধর্ম্মোপেত বলিয়া মনে করিয়াই তাঁহারা কাজ করিয়াছেন এবং অধর্ম্ম করিলে অপযশ হইবে, ইহাও ভাবিয়াছেন।"

ব্যর্থ শিক্ষা

হাওড়া জেলান্তর্গত সামতা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুত্রকন্যাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতেছ এবং তাহারাও নানা শিক্ষণীয় বিষয় বিশেষ আগ্রহ সহকারে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহার চেয়ে চিত্ত-সুখকর সংবাদ আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু যে শিক্ষা তাহাদের দেওয়া হইতেছে, তাহাই যে তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু নহে, আরও যে কিছু তাহাদের পাইবার আছে, যাহা না পাইলে তাহারা তোমার এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষদের জীবন-সাধনার সব চেয়ে মূল্যবান্ স্রোতোধারার সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে পারিবে না, হইয়া পড়িবে দিগ্‌ভ্রান্ত ও পথশ্রান্ত, সেই বিষয়ে তোমরা হয়ত কেহই বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিতেছ না। আমি যে-সকল কচি শিশুদের একদা নিজ হাতে গড়িয়াছি, মারিয়া পিটিয়া ছানিয়া বুনিয়া মানুষের মূর্ত্তি দিয়াছি, আজ তাহাদের কত কত জন নানা দিকে দিগ্‌গজ পুরুষের মত বল-বিক্রান্ত চরণ-

ক্ষেপে জীবনের গৌরবময় পথে উচ্চ শিরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতেছি যে, তাহারা নিজেদের পুত্রকন্যাদের সেই চিন্তাধারার সহিত পরিচিত ও সেই ধারায় পরিস্নাত করিয়া তুলিবার এক কণা চেষ্টাও করিতেছে না, যাহার দৌলতে তাহারা আজ মানুষ বলিয়া পরিচিত হইল। বংশানুক্রমে আমার সুচিন্তিত আদর্শবাদকে ইহারা প্রবাহিত করিতে আগ্রহী হইল না অথচ আমার জন্মোৎসবের উপলক্ষ্যে কৃত না মধুর বচনাবৃত ভাষণমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাণে ঢালিয়া দেয়। মনে হয়, ইহারা যেন কথার ফুলঝুরি দিয়াই আকাশের অগণিত জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রগুলিকে আনিয়া ধূলার ধরণীতে হাজির করিয়া দিবে। ইহা অপেক্ষা রোমাঞ্চকর আত্ম-প্রতারণা যে আর কিছু হইতে পারে না, এই বিষয়ে ইহাদের এক কণা লক্ষ্যও নাই। জীবনের ব্যক্তিগত কৃতিত্বকে বংশানুগত ও বহুশতাব্দীবাহী করিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকিলে এই ব্যাপারে ইহারা এত উদাসীন হইতে পারিত না। পুত্রকে বড় চাকুরে করিয়া দেওয়া আর কন্যাকে বড় মানুষের সহিত বিবাহ দেওয়া ছাড়া পুত্রকন্যার প্রতি আর কোনও আবশ্যিক কর্ত্তব্য আছে বলিয়া ইহারা মনে করে না। সকল কিছুর গোড়ায় ইহাই হইয়াছে আসল গলদ। তুমি আগ্রহী হইয়া জানিতে চাহিয়াছ বলিয়াই লিখিতে হইতেছে যে, আমি যখন নিতান্ত কিশোর বয়সে মানুষ গড়িবার কাজে হাত দিলাম, তখন হইতে আজ

পর্য্যন্ত এই একই কাজে আমি লাগিয়া রহিয়াছি এবং শ্রম দিতেছি সর্ব্বত্র নিষ্করুণ নিঃস্বার্থপরতা নিয়া এবং দিতেও থাকিবে আমার পরিপক্ক বার্দ্ধক্যের শুভতম শেষ দিনটী পর্য্যন্ত কিন্তু ইহা কেন আমি প্রত্যাশা করিব না যে, আমার সস্নেহ সেবা-হস্তের স্পর্শ যাহারা নিজ নিজ জীবনে পাইয়াছে, তাহারা মানুষ্যত্বের উচ্চ শিখরে উঠিবার জন্য আমাকে শুধু মই রূপেই ব্যবহার করিয়া যাইবে না, তাহারা আমার প্রদত্ত শিক্ষা ও সাধনাকে নিজ নিজ বংশাবলীর ধারাবাহিকতার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়াসও চালাইবে? ইহা তাহারা না করিলে তাহাদের পুত্রকন্যার বিপুল শিক্ষা ও অগাধ বিদ্যা হইয়া যাইবে যে।"

আমার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"আমি অনেক দূরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রতিটি কার্য্য করিতেছি। এত দূরে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ যে, তোমরা আমার সব কথা শুনিলে আমাকে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে করিবে না। অল্প কিছু যাহা তোমরা আমার সম্পর্কে জানিয়াছ, তাহাতেই তোমাদের উচিত ছিল আমাকে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত, ম্যানিয়া-বাতিকের মনোবিকারীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ জানিয়া পরিহার করিয়া চলা। আমি অনেক সময়ে দুঃখের সহিত ভাবি যে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের সব

চেয়ে বড় অনুভবী পুরুষ হইয়াও কেন অনুমান করিতে পারিলেন না যে, আরবের মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া আশ্চর্য্য ধরণের একটী একেশ্বরবাদী বেদান্ত এই ভারতের দিকে নক্ষত্র-বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, যাহারা আলোকের বন্যা ও তীক্ষ্ণ অগ্নিরসনা হইতে মানুষের বিবেককে বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষে কমঠ-নীতিই একমাত্র সম্বল হইতে পারে না, যাহার জন্য বৌদ্ধমতবাদ বিধ্বংসকারী দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের হস্তে আরও কিছু প্রহরণের প্রয়োজন ছিল। আমি অনেক সময়ে দুঃখের সহিত ভাবি যে, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অহিংসার প্রচারক ও প্রসারক শ্রীবুদ্ধ, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও নিজ ধর্ম্মমতকে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ কেন রাখিলেন, যাহার ফলে কট্টর বৌদ্ধদের বংশধারাবর্দ্ধকেরা ঈশ্বরের প্রয়োজনে আরবীয় ধর্ম্মসাধনাকে দলে দলে অকাতরে গ্রহণ করিয়া পরধর্ম্মে অসহিষ্ণু একদল দুর্দ্ধর্ষ ও নির্ম্মম ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে শোণিত স্রোতের প্রবণতাই ঘটাইল। অনাগত সেই সুদূরের এক অদৃশ্যপ্রায় জগতের দিকে তাকাইয়া আমি কাজ করিতেছি, চিন্তা পরিচালনা করিতেছি, কথা কহিতেছি, প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতেছি ও ছাড়িতেছি, যে যুগে ধর্ম্ম লইয়া মানুষের সহিত মানুষের কলহ থাকিবে না, যে যুগে সকল ধর্ম্মের মানুষ এক মিলন-মঞ্চে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের কথা কহিতে পারিবে, এক বেদীমূলে ঈশ্বরারাধনার অর্ঘ্য অর্পণ করিতে পারিবে। যাহা তোমাদের নিকটে অবিশ্বাস্য, তাহা আমি শিশুর সারল্য

নিয়া বিশ্বাস করিতেছি। যাহা তোমাদের দৃষ্টিতে অসম্ভব, ঠিক সেই ঢংএ আমি কাজ করিতেছি। তথাপি তোমরা যে আমার কাছে চিঠি লিখ, ইহাতে আমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি।"

স্বদেশ ও বৈচিত্র্য

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত কানুনগো-পাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দেশ আমার নিকটে কোনও সুদূরের বস্তু নহে। দেশ আমার নিকটে এমন প্রত্যক্ষ দেবতা, যেই দেবতাকে আরাধনা করিয়া ধ্যানের জগতে নামাইতে হয় না, পরন্তু যে দেবতা নিজে আরাধনা করিয়া আমাকে তাঁহার কোলে স্থান দিয়াছেন। দেশের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আমি আমার সেই স্বদেশকে দেখিতে পাই। এই জন্যই জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-মতামত-নির্ব্বিশেষে দেশের প্রত্যেকটী মানুষ আমার প্রাণতুল্য প্রিয়জন। আবাল্য এই দৃষ্টিতে যাহাকে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছি, তাহার ভিতরে নানা স্বার্থের সংঘাত হেতু অনৈক্যের কোলাহল দেখিলে আমার প্রাণ বেদনায় আতুর হইয়া ওঠে। দেশের প্রত্যেকে চেষ্টিত হউক যে, কি করিয়া বিক্ষিপ্ত নানা মতবাদে আচ্ছন্ন মানুষগুলি একটী মিলনের মঞ্চে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারি। এস আমরা চিন্তা করি, এস আমরা ধ্যানে বসি যে, কি করিয়া শত সহস্র বিভিন্ন মতবাদের উপাসক ও

অনুসরণকারীদিগের জন্য একটী মিলনের সেতু রচনা করিয়া দেওয়া যায়। সকলের ধীশক্তি সমভাবে প্রযুক্ত হইলে দেশের আবহাওয়ার প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন একদা এমন ভাবে ঘটিবেই ঘটিবে যে মানুষের সহিত মানুষের মতান্তর কদাচ মানুষের সহিত মানুষের বিবাদ, বিসম্বাদ, মনোভঙ্গ বা বিদ্বেষের কারণ হইবে না। বৈচিত্র্য বিধাতার সৃষ্টিরই এক মহিমা, আর ভারতে ও মানচিত্রে ধর্ম্মের, সংস্কৃতির, ভাষার, মূল্যবোধের এবং রসগ্রাহিতার ব্যাপারে বৈচিত্র্য ত' একান্তই অবশ্যম্ভাবী। স্বদেশ-প্রেম খাঁটি হইলে বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সমাজে সমাজে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী-বন্ধনের ঐক্য রচনা সুসম্ভব।"

সাধুতা ও দেশসেবা

২৪ পরগণা জেলান্তর্গত দুলদুলী মঠবাড়ী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাধুতা ও স্বদেশসেবার স্পৃহাকে দুইটী পরস্পর-বিচ্ছেদ্য বা অসম্বদ্ধ সদ্‌গুণ বলিয়া কদাচ কল্পনাও করিও না। সাধুতা যাহার নাই, স্বদেশ-সেবা তাহার হস্তে পড়িয়া অতীব মারাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। দেশসেবার নাম করিয়া যে সকল অসাধু ব্যক্তি সুকৌশলে মানুষের চোখে ধূলা দিয়া উচ্চ পদে, সম্মানের উচ্চ শীর্ষে ক্ষমতার তুঙ্গে উঠিয়াছে, জানিবে, তাহারা স্বেচ্ছায় কিছু করুক আর না করুক, নিজেদের অজ্ঞাতসারে

হইলেও দেশের সর্ব্বনাশ না সাধিয়া ছাড়িবে না। চরিত্রবল-বর্জ্জিত বাক্সর্ব্বস্ব মানুষেরা সংপ্রয়াসের অপেক্ষা অপকৌশলকে কার্য্য-সিদ্ধির শ্রেষ্ঠতর উপায় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই স্থানেই রহিয়াছে দেশসেবার অপমৃত্যু ঘটাইবার মর্ম্মঘাতী কালকূট, যাহার অন্য নাম প্রলোভন, যাহার নগ্ন-রূপ ব্যভিচার, যাহার ছদ্মবেশ নানাবিধ সংপ্রয়াসের সম্ভাবনাতীত বিরাট বিরাট কল্যাণ-কর্ম্ম-তালিকা। এই রাস্তায় একবার যাহারা নামিয়াছে, তাহাদের হাতে গাণ্ডীবও নাই, ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র বা বরুণাস্ত্র প্রভৃতি কিছুই নাই, আছে মাত্র ধাঁধা-সৃষ্টিকারী ধোকা, যাহা গরম থাকিতে থাকিতেই অন্য ধোকার চাপায় পা পড়িয়া গেলে নির্লজ্জ-ভাবে কপটীর কাপট্য অত্যল্প সময়-মধ্যে ধরাইয়া দেয়। ইহাদের সম্পর্কে তোমরা সাবধান থাকিও।"

আশ্রম-বাস

ঢাকা জেলান্তর্গত দুবতারা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রাচীন কালে গুরু-গৃহে বাস কেবল তরুণ বিদ্যার্থীর জীবন-গঠন এবং শিক্ষার সম্পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রয়োজনীয় ছিল না, যাহারা সংসারের কাদামাটি ঘাটিতে ঘাটিতে ক্লান্ততনু ও শ্রান্তমনা হইয়াছে, তাহাদের জীবনকে নব-জীবনের

অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া নিয়া নূতন করিয়া জাগতিক ও পারমার্থিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্যও ইহার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যাহাতে গৃহস্থদের এইরূপ আগমন অত্যধিক সংখ্যায় হইতে থাকিলে আশ্রম-পীড়ার উৎপত্তি না হয়, তজ্জন্য একটা পাকা ব্যবস্থা এই ছিল যে, গৃহস্থ গুরুগৃহে আসিয়া বাস করিলে গুরুগৃহের সকলের ভোজ্যপানীয় তাহাকেই সরবরাহ করিতে হইত এবং সকলের ভোজনান্তে নিজের প্রসাদটুকু গ্রহণ করিতে হইত। শাস্ত্রে এই প্রথা সম্পর্কে কোথাও কিছু লিখিত আছে কিনা, আমার জানা নাই, কিন্তু কুলগুরু ও গোস্বামী-বংশাবলীতে এই প্রথাটী আজ পর্য্যন্ত অনেক স্থানে কঠোর নিয়মে প্রতিপালিত হইতে দেখিয়াছি। অর্থাৎ শিষ্য আসিয়া গুরুগৃহে বসিয়া গুরুর স্কন্ধে চাপিলেন এবং অনেক কাণ্ড করিয়াও আর অলস, কর্ম্মকুণ্ঠা জীবন-যুদ্ধে নিরন্তর পলায়নাভিলাষী এই শিষ্যকে বাড়ীতে ফেরৎ পাঠাইবার কোনও সরল উপায় আবিষ্কার করিতে না পারিয়াই যেন গুরুদেবেরা এই গুরুভার কুটিল ফন্দীটী আবিষ্কার করিলেন। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি বিচার করিয়া স্থির করিও যে, তুমি তোমার গুরুদেবের আশ্রমে গিয়া আশ্রমের ভার-স্বরূপ হইবে কিনা। যে শিষ্য বিবেচক নহে, বিনীত নহে, শ্রমশীল নহে, স্বার্থবোধশূন্য নহে, অপরের উপকারার্থ নিজের দেহমনকে খাটাইতে যে কুণ্ঠিত,

অনিচ্ছুক ও অপারগ, তাহার পক্ষে তাহার গুরুদেবের আশ্রমে গিয়া আশ্রমপীড়া উৎপাদন করা উচিত নহে। ধনী লোকেরাই কেবল গুরুগৃহ-বাসের অধিকারী হইবে, এমন কথা ভাবিতে যাওয়াও পাপ। নির্ধন দরিদ্র ব্যক্তিরই বরং সেখানে আশ্রয় মিলিবার সম্ভাবনা এবং অধিকার অধিক। কিন্তু তুমি শ্রম করিবে না, বসিয়া খাইবে, কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিলে তাহাতে সাড়া দিবে না, বসিয়া থাকিবে, অন্য সতীর্থদের প্রতি স্নেহ, দয়া, মায়া, পোষণের বালাই রাখিবে না, কেবল নিজের একপেট ভোজন এবং দিবানিদ্রা নিয়া কালহরণ করিবে, এমন ব্যক্তির পক্ষে কোনও গুরুর আশ্রমে গিয়া বাস করিবার কল্পনা করা উচিত নহে। অন্যেরা আশ্রম-ধেনুর ঘাস যোগাইবে, পরিচর্য্যা করিবে, আর তুমি শুধু দুগ্ধ দোহনের পরে নিজের বাটিটি নিয়া গিয়া একটু বেশী দুগ্ধ সেবনের জন্য কোন্দল তুলিবে,—এমন ব্যক্তি কোনও গুরুরই আশ্রমে বাস করিবার যোগ্য নহে। সকাল বেলা অনেক ডাকাডাকি করিয়া তোমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া তবে প্রত্যহ তোমাকে পুষ্পোদ্যানে পাঠাইতে হইবে আর ফুল তোল আর না তোল, উদ্যানভ্রমণের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য তুমি নির্জ্জন বৃক্ষতলে সারা সকাল ঘুমাইয়া থাকিয়া দ্বিপ্রহরে হঠাৎ লম্ফ দিয়া উঠিয়া ছুটিবে রান্নাঘরের দিকে অন্নপ্রসাদ পাইবার জন্য,—এমন লোক কোনও আশ্রম বাসের যোগ্য নহে।"

আর সন্তান চাহি না

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত লাউর-ফতেপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আর সন্তান চাহি না বলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে আমাকে বা ভগবানকে আবেদন জানাইলেই নব সন্তানের আবির্ভাব বন্ধ হইয়া যাইবে না। যে সকল কার্য্য-কারণ ঘটিলে সন্তান মায়ের গর্ভে স্থান গ্রহণ করে, তাহাদের উপরে সংযমের শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। আর্ত্তকণ্ঠে প্রার্থনার কোনও মূল্য নাই, তাহা আমি বলিতেছি না। এইরূপ প্রার্থনা সংযম-ব্রতে সিদ্ধ হইবার নিশ্চয়ই সহায়তা করে কিন্তু প্রধান কাজটী মূলতঃ দৈহিক। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অপার ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তাহারা ইচ্ছা করিলে দেহ-সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে পারে। তাহারা যে ইহা পারে, তাহার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত আমার চখের সম্মুখে রহিয়াছে। এমন দম্পতীরা নিজেদের সংযম-সামর্থ্যের কথা,—নিজেদের আংশিক বিফলতা এবং বৃহত্তম সফলতার বার্ত্তা—বাহিরে কোথাও বর্ণনা করে না। এই জন্যই করে না যে, এই ব্রতের কথা প্রকাশ পাইয়া গেলে মানুষের নিকট নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিবার জন্য এক প্রচ্ছন্ন অভিমানের সৃষ্টি হয়, যাহার ফল অত্যন্ত অশুভ, যাহার ফলে অতি দ্রুত এবং অকস্মাৎ ব্রতভঙ্গ ঘটে। আর সন্তান যদি সত্যই না চাহ, তাহা হইলে দেহ-সুখের

কামনার ঊর্দ্ধ্বেদেশে নিজের মনকে স্থাপিত কর। এই একটী কাজ করিতে পারিলেই দেখিবে, তোমার সুবিস্তীর্ণ যাত্রাপথ জীবন ভরিয়াই চির-সুগম, চিরানন্দময়। বাহিরের সংগ্রামে ক্লান্ত স্বামী গৃহে আসিয়া নিভৃত নিবাসে নিশীথ-শয়নে হয়ত একটু প্রমোদ প্রার্থনীয় মনে করিতে পারে। তোমার মুখের মধুর হাসিই কি তাহার সকল প্রার্থনা পূরণের তৃপ্তি দিয়া দিতে পারে না? একটা জন্তু আর একটা জন্তুর যোনি-সম্ভোগ করিয়া যে তৃপ্তি পায়, একটা মানুষ আর একটা মানুষের স্নিগ্ধ হাসিতে কি তাহার কোটি গুণ সুখ পাইতে পারে না? এই প্রশ্নের উত্তর ত' তোমাদের জীবনের যোগ্যতার উপরে নির্ভর করে মা।"

ইতর প্রাণীর মৈথুন দর্শন নিষিদ্ধ কেন

একটী বিবাহিত যুবক তাহার কতকগুলি ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বর্ণনা করিয়া উপদেশ চাহিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শাস্ত্র বল্‌ছেন কুদৃশ্য দেখ্‌বে না। সাধুজনেরা বল্‌ছেন, কুদৃশ্য থেকে চক্ষুকে ফিরিয়ে নাও। তোমার মনও বল্‌ছে ছিঃ এমন একটা দৃশ্য তুমি দেখ্‌ছ, এটা অন্যে জানতে পারলে তোমার কি আর ইজ্জৎ থাক্‌বে? অথচ দৃশ্যটা কি? না, জীবজন্তুর, পশুপক্ষীর স্ত্রীপুরুষের ইন্দ্রিয়গত মিলন। এই

মিলনটা কি অস্বাভাবিক? এটা কি তাদের পক্ষে অন্যায়? কুক্কুর-কুক্কুরী, শূকর-শূকরী নিজেদের জান্তব প্রয়োজনের দাবীতে দৈহিক ভাবে মিলিত হচ্ছে, তাতে তোমার কি? তুমি ত' কুক্কুরও নও, শূকরও নও। তবু এ দৃশ্য দেখতে তোমার লজ্জা করে। তবু এ দৃশ্য দেখ্‌তে তোমাকে শাস্ত্র, সাধুজন ও তোমার মন বারণ করে। তার কারণ এই যে তুমি যখন সকাম-ভাবে এই দৃশ্য দেখ্‌তে থাক, তখন তুমি তোমার নিজের মনুষ্যত্ব ক্ষণকালের জন্য হ'লেও ভুলে যাও এবং তুমি ঐ তির্য্যক্ যোনির সমগোত্রীয় হ'য়ে যাও। তুমি তখন কুকুরের বা শূকরের সুখসম্ভোগ-চেষ্টার মধ্যে নিজের সুখসম্ভোগকে অজ্ঞাতসারে জড়িয়ে নাও। এটা বাস্তব সত্য নয়, মনস্তাত্ত্বিক সত্য। মানুষ হ'য়েও তুমি পশু বা পক্ষীর মত ইতর আনন্দে মজ্‌গুল হবে, এটা বাঞ্চনীয় নয়। একটী মেয়ে যখন ইতর জন্তুর মধ্যে এই সব ইন্দ্রিয়-বিলাস দেখে, তখন সে ক্ষণকালের জন্য নিজের মানুষ-সত্তার কথা ভুলে নিজেকে হয় পক্ষিণী, নয় শূকরী, নয় কুক্কুরী ব'লে জ্ঞান করে। তার মানবদেহ সম্পর্কে তখন তার পূর্ণ বিস্মৃতি জ'ন্মে যায় ব'লেই এটা সম্ভব হয়। অথচ এক যুগের ইতর প্রাণীরা ক্রম বিকশিত হ'তে হ'তে আজকের যুগে তোমার আমার মতন মানুষ হয়েছে। এমতাবস্থায় আমার আমাদের ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত না হ'য়ে ক্রমাবনতির দিকে যেন ঝুঁকে না পড়ি, তার জন্যই ইতর প্রাণীর মৈথুন দর্শন নিষিদ্ধ হয়েছে।

নর-নারীর মৈথুন-মিলন দর্শন

শ্রীবাবামণি বলিলেন,—মিথুনীভূত নরনারীর মিলন থেকেই প্রতিটি মানুষের জন্ম হচ্ছে। এক মাত্র যীশুখ্রীষ্টের জন্ম সম্পর্কেই এই কথাটার ব্যত্যয় হয়েছে ব'লে খ্রীষ্টানেরা মনে ক'রে থাকেন। আর, যুধিষ্ঠিরের জন্মে প্রাকৃতিক যোগাযোগ ব্যতীতই ধর্ম্ম বা বিদুর এর মধ্যে কেউ এসে যোগবলে গর্ভ সৃষ্টি ক'রে গেছেন ব'লে মহাভারতে নাকি ইঙ্গিত দেখা যায়। ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবতা হ'লেও মানুষেরই মত এসে মানুষটীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন ব'লেই অন্য পাণ্ডবদের জন্ম হয়েছে ব'লে বর্ণিত আছে। যে স্বাভাবিক ক্রিয়ানুষ্ঠান না হ'লে রাম, কৃষ্ণ বা বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হ'ত না, হ'ত না কবীর, নানক, গৌরাঙ্গের জন্ম, সেই স্বাভাবিক ক্রিয়াতে রত মানব-মানবীকে দর্শন কর্ম্মে বা চিন্তা কর্ম্মে পাপ বা অপরাধ কেন হবে, এ প্রশ্ন অসঙ্গত নয়। কোনো কোনো পুরাণে শিব ও পার্ব্বতীর সুরত-ক্রীড়া বর্ণিত থাক্‌তে পারে। সেগুলি শুন্‌লেই বা পাপ হবে না কেন, এ প্রশ্নও তুলতে পার। আমি বলি, যে নারীতেও দেখে ভগবানকে, নরেও দেখে তাঁকেই, আর তাঁদের উভয়ের ঘনিষ্ঠতম মিলনে বা মিলনোচ্ছ্বাসেও দেখ্‌তে পায় সেই একই পরম বস্তু শ্রীভগবানকে, তার পক্ষে মৈথুন দর্শনে, মৈথুন মননে বা মৈথুন-বিবরণ শ্রবণে কোনো পাপ

নেই। অর্থাৎ তাতে তার গায়ে কোনও তাপ লাগার সম্ভাবনা নেই, তার প্রতিক্রিয়ায় তার কোনও অশান্তি ঘটবার কারণ নেই। কিন্তু কারো রসগোল্লা ভক্ষণ দর্শনে যেমন দ্রষ্টার মনে রসগোল্লার আস্বাদন গ্রহণের ব্যাকুলতা জন্মাতে পারে, অপরের তেঁতুল চাটার দৃশ্যে যেমন দ্রষ্টার রসনায় রস সঞ্চার স্বাভাবিক, ঠিক তেমনি অপর নর-নারীর সঙ্গম-কার্য্য দর্শন, শ্রবণ বা মননের ফলে দ্রষ্টার নিজের মনে ঐরূপ কাজ কর্ব্বার জন্য দুর্ব্বার বাসনার সৃষ্টি হতে পারে, যা' তার পক্ষে ক্ষতিকর বা মারাত্মক। সঙ্গম ব্যাপারটা নিজে তত গুরুতর নয়, যত গুরুতর সেই লালসা-ব্যাকুলতাটা, যা' মানুষকে স্ত্রীসঙ্গমে বা পুরুষসংসর্গে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করে। অপরের লালসা-প্রণোদিত উদ্বেল কর্ম্ম তোমার শুদ্ধ সরল সংযত মনেও লালসার নানা তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে দিতে পারে। কারণ, তুমি যখন যা-কিছু দেখ্‌ছ, তখন নিজের অজ্ঞাতসারে স্বীয় দেহজ্ঞান বিস্মৃত হ'য়ে গিয়ে ঠিক সেই জিনিষটীতে ক্ষণকালের জন্যও রূপান্তরিত হ'য়ে যাচ্ছ। নিজেকে লালসার জাল থেকে বাঁচিয়ে চলতে হ'লে তোমার দৃষ্টি-সংযম এই কারণেই প্রয়োজন।

শ্লীলতা ও অশ্লীলতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একদা মানুষ উলঙ্গ হ'য়ে বিচরণ কর্ত্ত। কেউ কাউকে উলঙ্গ দেখে বা নিজেকে অপরের

নিকটে উলঙ্গ ভাবে দেখিয়ে লজ্জা বোধ কত্ত না। জৈবিক তাড়নায় পুরুষ ও নারী ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হ'লে কোনও আবরণ বা আবরুর প্রয়োজন অনুভব কত্ত না। কিন্তু একের লালসাতুর ব্যবহার অন্যদের মনে অকারণেও ক্ষণে ক্ষণে যখন লালসার উদ্রেক কত্তে শুরু কর্ল্ল তখন স্বভাবতঃই প্রয়োজন অনুভূত হ'ল অবারিত স্বাধীনতার উপরে কতকগুলি সীমাবদ্ধতার শাসন আরোপিত করার। তা' থেকেই আস্তে আস্তে নানা প্রকারের সমাজ-বিধি ও নীতি-বিধানের বিবর্ত্তন ঘটল। নিজের মৈথুন-মিলন অপরকে দেখ্তে দেবে না। অপরের মৈথুন-মিলন নিজে কখনো দেখ্তে চেষ্টা কর্ব্বে না, এই একটী নির্দ্দিষ্ট বিধান জগতের প্রায় সমস্ত সভ্য-সমাজে এভাবে আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল। এই জন্যই সঙ্গম-ব্যাপার নিয়ে অঙ্কিত চিত্রকে অশ্লীল চিত্র ব'লে গণ্য করা হয়। এজন্যই সঙ্গম-ব্যাপার নিয়ে বর্ণিত কথা-সাহিত্যকে ভদ্র-সমাজে অপাংক্তেয় ক'রে রাখা হয়। যে দৃশ্য, যে বাক্য, যে কাব্য, যে কাহিনী, যে আচার, যে রীতি মানুষের ইন্দ্রিয়-লালসাকে ইন্ধনের পর ইন্ধন যোগায়, তাকে চখ থেকে, কাণ থেকে, মন থেকে, স্মৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা মানুষের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্যই প্রয়োজন। এই চেষ্টার সফলতার নাম শ্লীলতা-রক্ষা, এই চেষ্টাকে অবহেলা ক'রে তার বিপরীত আচরণের নাম অশ্লীলতার চর্চ্চা।

নারী, পুরুষ ও কাম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটী বিরাট চিত্র-প্রদর্শনী, যাতে একা একা চিত্র দেখার আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ আছে, যাতে দর্শকের রুচি-চারুতা বা রুচিবিভ্রম নিয়ে সমালোচনা করার জন্য কোনও দর্শক সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্বে না, তাতে যদি একস্থানে একটী সৌষ্ঠব-সম্পন্না সুন্দরী রমণীর এবং একটী পূর্ণযৌবনমণ্ডিত সুশ্রী পুরুষের উলঙ্গ অবস্থার অবিকল প্রতিচিত্র রক্ষিত হয়, তাহ'লে নিশ্চয়ই দেখা যাবে যে, পুরুষটীর চিত্র দেখ্তে নারীদের যেমন ভিড় হয়েছে, নারীটির চিত্র দেখ্তেও পুরুষদের তেমন ভিড় জমেছে। এই নিদারুণ ভিড়ের কারণ এই নয় যে, একটা পুরুষও এর আগে কোনও নারীমূর্ত্তিকে নিজের চখে সম্পূর্ণ অঙ্গ-সুষমার দেখ্তে পায় নি, বা একটী নারীও এর আগে কোনও পুরুষমূর্ত্তিকে তার পূর্ণ মূরতিতে দেখ্তে পায় নি। তথাপি এই নিদারুণ ভিড়ের একটী কারণ আছে তা এই যে, পুরুষকে দিয়ে নারীর পূর্ণতা এবং নারীকে দিয়ে পুরুষের পূর্ণতা। একের প্রতি অপরের আকর্ষণ দুষ্পরাজেয় এবং স্বাভাবিক। এই আকর্ষণটা জগতে আছে ব'লেই জগতে মানুষ আছে, সংসার আছে, বংশবৃদ্ধি ঘট্ছে, মানবজাতি জগৎ থেকে নির্ব্বংশ হ'য়ে যেতে পারছে না। কিন্তু নারীকে

সম্যক্ রূপে পেতে পুরুষ বা পুরুষকে সম্পূর্ণরূপে পেতে নারী একাকীই চাইবে, এইটাও স্বাভাবিক। দুর্জ্জয় কাম তাদের একাকী পাওয়ার বাসনাকে দুর্দ্ধার করেছে। এই জন্যই নারীর জন্য পুরুষ বা পুরুষের জন্য নারী অনাদি কাল থেকেই ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটে গেছে নূতন ক'রে ঘর বাঁধার জন্য। এইগুলি স্বাভাবিক ব'লেই কামকে কেবল শত্রু ব'লে মনে করার মতন ভ্রম আর কিছু নেই। কামকে সর্ব্বকামনা-দমনের মহৌষধ রূপে লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। জীবনকে ভগবদাশ্রিত কর্ত্তে পার্লে নারীর রতি আর পুরুষের রিরংসা বিমল প্রেমানন্দে পরিণত হ'তে পারে। যাই দেখ, যাই শোন, যাই বোঝ আর যাই স্মরণ কর, সব-কিছুর মধ্যে যদি শ্রীভগবানের উপস্থিতিকে প্রত্যক্ষ অনুভব করার চেষ্টা করে যাও, তবে পাপও হ'য়ে যাবে পুণ্য, তাপও হ'য়ে যাবে শান্তি-শীতল সুস্নিগ্ধ, অনুতাপ হ'য়ে যাবে সর্ব্বজীবে পরম প্রেমে রূপান্তরিত আর ভোগ পরিণত হবে নিকষিত কাঞ্চনের মতন অমূল্য এক ত্যাগশক্তির অফুরন্ত আধারে।

শিব-পার্ব্বতীর আদর্শে গার্হস্থ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্তান-জননের প্রয়োজনে অথবা নিছক আনন্দ লাভের তাগিদে যে কাজ পৃথিবীর প্রত্যেক দম্পতী নিজেদের মধ্যে করে, তাকে দেখা, তার

বিষয়ে শোনা, তাকে বিবৃত করা বা তার বিষয়ে চিন্তা করায় কোনো দোষ নেই,—সাহিত্যিকদের মধ্যে এরূপ একটা মতবাদ খুবই প্রবল ভাবে প্রচারিত হ'তে দেখা যাচ্ছে। শুধু দম্পতীর সামাজিক ভাবে বৈধ আচরণ নিয়েই তাঁরা কথা কন্ না, তাঁরা অসামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্তগুলিকেও বিলাসীর ড্রয়িংরুমে, দুঃসাহসীর নাচঘরে, কুলীর ধাওড়ায়, চা-বাগিচার জঙ্গলে, কয়লা-খনির-ময়লা খাদে দেখিয়ে দেখিয়ে রস সৃষ্টি কর্ত্তে চান। বলাই বাহুল্য, এগুলি সত্য হ'তে পারে কিন্তু সুন্দর কিনা, শিব বা মঙ্গলময় কিনা, একথাও ত' জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে। বৈষ্ণব যখন রসতত্ত্ব আলোচনা করেন, তখন তাঁর কৃষ্ণ রক্তমাংসের মানুষ নন, রাধাও মাটির পৃথিবীর জীব নন, তাঁরা দেহেন্দ্রিয়াতীত পরম সত্ত্বা। এই বোধে উদ্দীপ্ত থাকেন ব'লেই প্রকৃত বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাতত্ত্বের আস্বাদন-কালে জৈবিক রিপুর উত্তেজনা ঘটে না, বরং তা প্রশমিতই হয়। স্বামী ও পত্নী যখন নিজেদের ভিতরে জীবভাবের অণুমাত্রকেও থাকতে দেন না, তখন তাঁরা নিজেরাই পরমশিব ও পরমশক্তিতে রূপান্তরিত হন। তখন তাঁরা আর মানুষ থাকেন না, তাঁরা হন দিব্য চেতনার জাগ্রত প্রতিভূ। এই জন্যই শিবপার্ব্বতীর যুগলকে ভারতের গার্হস্থ্য-জীবনাদর্শে এত উচ্চ স্থান দান করা হয়েছে।

পূর্ব্বঅলকা (পরশুরাম) নোয়াখালী
২৪শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪২
(১১ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

আদেশ চাই

কথা হইয়াছে যে, আজই বিকাল পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটের ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবামণি পরশুরাম হইতে বিলনিয়া যাইবেন এবং বিলনিয়া এক ঘণ্টা থাকিয়াই সাতটা দশ মিনিটে ফেণী রওনা হইবেন। বিলনিয়ার কতিপয় ছাত্র আসিয়াছে তদ্বিষয়ে শেষ নির্দ্দেশ জানিতে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনের সব চেয়ে জরুরী কথাটী বলতে লাগে মাত্র এক মিনিট। ট্রেণ থেকে নেমে যথাস্থানে যেতে এবং সেখান থেকে ফিরে ফেরৎ ট্রেণ ধর্‌তে লাগবে দশ আর দশ মোট বিশ মিনিট। সুতরাং বক্তৃতা যদি শুনতে চাও ত' চল্লিশ মিনিট সময় মাত্র তোমাদের হাতে আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বক্তৃতা দিব। সুতরাং বল্‌ব ঝড়ের বেগে। এতে রাজি থাক ত' বক্তৃতা দিতে আমার আপত্তি নেই।

ছাত্রেরা বলিল,—আপনি দশ মিনিট বক্তৃতা দিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমরা আপনার আদেশ পালন কর্ত্তে চাই। বক্তৃতা শুনে সময় নষ্ট কর্ত্তে চাই না। কি আপনার

আদেশ, তা' আমাদের অকপটে বল্‌বেন আর আশীর্ব্বাদ কর্ব্বেন যেন সে আদেশগুলি পালন কর্ত্তে পারি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ঠিক্ এই কথাটিই ত' তোমাদের কাছে শুনতে চেয়েছিলাম। বেশ, বক্তৃতাও দেব, আদেশও দেব এবং দু-একজনকে আমি দীক্ষাও দেব। অবশ্য, আমি জানি না যে, ওখানে দীক্ষার্থী কেউ আছে কি না।

প্রশ্ন হইল,—যেচে দীক্ষা দিবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেচে দিব সবাইকে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ, সংযম-সাধনার উপদেশ। স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আদেশ দিব প্রত্যেককে দেশ, দশ ও জগতের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গের জন্য আত্মপ্রস্তুতিতে লেগে যাওয়ার। এগুলি করব আমি নিজের গরজে। দীক্ষা যদি কেউ পায়, তবে সে পাবে তার প্রয়োজন-বোধের তাগিদে। দীক্ষা দিয়ে আমি তোমার গলায় শিকল বাঁধব, আর সেই শিকলের শেষ প্রান্ত ধ'রে আমি তোমাকে ত্রিভুবন ঘুরাব, সেই গুরু আমি নই। আমাকে গুরু-রূপে পেতে হ'লে তোমাকে নিজের গরজ প্রমাণ কর্ত্তে হবে। কেউ সেই গরজকে প্রমাণ করে একটা নিমেষের যোগ্যতায়, কেউ আবার তা' প্রমাণ করে বহু বৎসরের ধারাবাহিক নিষ্ঠায়। গুরু করা সহজ নয় এবং শিষ্য হওয়াও সহজ নয়।

পুত্রকন্যারা পিতামাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ

শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিয়া গেলেন। জলপাইগুড়ি জেলান্তর্গত দ্বারিকামারী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার পুত্রকন্যারাই যে তোমার সব চেয়ে দামী সম্পদ, এই কথাটী নিমেষের জন্য ভুলিও না। সম্পত্তি কিনিয়া বা ব্যাঙ্কে টাকা জমাইয়া মানুষ কোন্ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়? ঐ সম্পদ অতীব তুচ্ছ বস্তু। যাহার পুত্রকন্যা সৎপথে চলিল না, যাহার পুত্রকন্যা গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে কোনও চেষ্টা করিল না, যাহার পুত্র-কন্যা কুসঙ্গে মিশিল, কুকার্য্য শিখিল, কুকথা কহিল, কদাচারে আসক্ত হইল, অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গৌরবের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ইতর আমোদে আর লঘুচিত্ততার পরিতোষণে তরল সুখের গরল পান করিল, তাহার মতন হতভাগ্য জীব এই জগতে আর কে আছে? অবশ্য পুত্রকন্যার শিক্ষাদানে ও যোগ্যতাবর্দ্ধনে সর্ব্বস্বান্ত হইবার পরে এই সকল তথাকথিত শিক্ষিত পুত্রকন্যার পিতামাতার অসহায় বার্দ্ধক্য যে অবহেলাময়ী বঞ্চনায় উৎপীড়িতও হইয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পুত্র বা কন্যার নিকটে বিনিময়ে ভবিষ্যতে কিছুমাত্র সেবাও হয়ত পাওয়া যাইবে না, এই

সম্ভাবনাটীকে সম্পূর্ণ-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াই পিতামাতাকে পুত্রকন্যার শিক্ষাদানে, চরিত্র-গঠন এবং সুপ্ত শক্তি ও প্রতিভার উন্মেষণে পরিশ্রম করিতে হইবে। সন্তান পিতামাতার প্রকৃতই সর্ব্বস্ব ধন বলিয়াই তাহাদের জন্য পিতামাতাকে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে হইবে।"

বসিয়া থাকা পাপ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ইলিয়টগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বসিয়া থাকা পাপ, ঘুমাইয়া থাকা মহাপাপ, আর জাগিয়া ঘুমানো এমন এক পাপ, যাহার যোগ্য শাস্তি দিবার মত স্থান কোনও নরকেও নাই। জীবনকে কর্ম্মময়, কর্ম্মকে ধর্ম্মময়, ধর্ম্মকে প্রেমময় এবং প্রেমকে নিষ্কলুষ করিবার জন্য নিরন্তর সাধনা করিয়া যাও। একাকী বা বহুজনের সঙ্গে মিলিয়া উচ্চাদর্শানুপ্রাণিত পবিত্র ও প্রাণময় জগজ্জনসেবার কর্ম্মতালিকাতে নিজেকে নিঃশেষে লগ্ন কর।"

ব্রহ্মচর্য্য পালন ও প্রচার

খুলনা জেলান্তর্গত দৌলতপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একটী যুবক অপর পাঁচটী যুবককে ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে প্রেরণা দিবে, ইহা অপরাধ বা অন্যায় হইবে কেন এবং

কখন? যখন সে ব্রহ্মচর্য্য করিবে প্রচার অথচ নিজে অব্রহ্মচর্য্যে ডুবিয়া থাকিবে। যখন সে মানুষের কাছে সৎ থাকিবে অথচ নিজের কাছে নিজ-আচরণে ছোট হইয়া পড়িতে থাকিবে। প্রতিটি কিশোর এবং যুবকের কর্ত্তব্য হইতেছে সযত্নে ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্রত গ্রহণ করা এবং ব্রতকে সম্যক্ রূপে সফল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। নিজের এই চেষ্টাকে স্বাভাবিক ও স্থায়ী সফলতা দানের জন্য প্রয়োজনীয় হইতেছে পরিবেশ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ কিশোর তথা যুবকগণের মনে পবিত্রতার, শুচিতার, সংযমের প্রতি আস্থা, শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা বর্দ্ধিত করা। সুতরাং তুমি অপরাপর কিশোর ও যুবকদের কাছে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার আবশ্যকতা সম্পর্কে অমৃত-বাণী বিতরণ করিবার চেষ্টা করিয়া কোনও অবৈধ বা অন্যায় কাজ কর নাই। কাহারও কোনও কুযুক্তিতেই তুমি কর্ণপাত করিও না। যাহা বহু ভাগ্যের ফলে সৎ এবং সঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, তাহা হইতে কোনও ক্রমে বিরত হইও না। ব্রহ্মচর্য্য-পালন যেমন তোমার পক্ষে লাভজনক, ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারও তেমনই তোমার পক্ষে ক্ষেমঙ্কর জানিও। তোমার মতন সহস্র সহস্র কিশোর যেই দিন এই কথাটীকে সুস্পষ্ট-রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, সেদিন দেশের যে কত বড় সুদিন আসিবে, কি বলিব। আমি সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছি।"

বাংলা সাহিত্যের অপকর্ষ ও তাহার ভাবী কুফল

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎপ্রয়াসের যে শুভফল ফলেই, তাহার প্রমাণ প্রত্যহ প্রত্যক্ষ রূপে পাইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কা অবশ্য আমার মনে মাঝে মাঝে এই জন্মিতেছে যে, আমাদের মতন সহস্র জন সরলবুদ্ধি প্রচারকের প্রচারের ফলে ব্রহ্মচর্য্য মহাবস্তু আদর্শ হিসাবে মানুষের মনে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার পরেও কি আমরা আমাদের ভাগ্যক্রমে উচ্চ রাজনৈতিক অধিকার করায়ত্ত করিবার ঠিক পরক্ষণে অনৈতিকতার প্রবল স্রোতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভাসিয়া যাইতে পারি না? প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকদের অনেকের রচনার ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধী দুর্ব্বার খরপ্রবাহ লক্ষ্য করিয়া ইহাকে অদূর ভাবীকালের এক দুর্ঘটনার ইঙ্গিত বলিয়া মনে হইতেছে। রাজনৈতিক নেতাদের মনে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে অবস্থিত কাহারও কাহারও সুপ্রসিদ্ধ জীবনের অন্তরালে চরিত্র-হীনতা-রূপ রক্তপায়িনী রাক্ষসীর যে ঘনকৃষ্ণ প্রেতমূর্ত্তির প্রচ্ছন্ন কঙ্কাল মাঝে মাঝে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে ভাবীকাল সম্পর্কে মনে কতকটা অস্বস্তির উদয় হইলেও তার চেয়ে অধিকতর বিকট মূর্ত্তি দেখিতেছি সেই ন্যক্কারবিঘোটনী অপদেবতার, যাহার চরণাশ্রয়ে আসিয়া গায়ক,

কবি, সাহিত্যিক, কথাকার, নাট্যকার, রম্যরচনার শিল্পী নিজেদের সমস্ত প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছেন জননীকে গণিকার সাজে সাজাইতে, ভগিনীকে ভোগসঙ্গিনী করিতে, শ্লীলতার বা অশ্লীলতার যাবতীয় বাস্তব পার্থক্য এবং আইনগত বিধিনিষেধ লুপ্ত করিয়া দিতে। ইঁহারা কত ভাল লিখিলেন আর কত মন্দ লিখিলেন, আসল প্রশ্নটা কিন্তু তাহা নহে। ইঁহারা তরুণের মস্তিষ্ককে কতটা বিকৃত করিলেন, ন্যায় ও নীতি সম্পর্কে সদাচারী মানুষগুলিরও মনে কদর্য্যতার সমাবেশ করিয়া দিয়া ধিক্কারযোগ্য যৌবন-লীলার তাণ্ডবকে অভিনন্দন করিলেন, জন-মানসে মাতৃত্বের, স্বসৃত্বের, ভগিনীত্বের সম্মান কত কমাইয়া নামাইয়া দাবাইয়া দিলেন এবং ইঁহার ফলে দেবতাত্মা হিমালয়ের গাত্রদেশে কত গভীর ফাটল কত দিনের জন্য ধরিয়া রহিল, আসল প্রশ্নটা তাহা। সমগ্র জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছে এবং ১৯০৫ হইতে শুরু করিয়া অদ্যকার এই ১৯৩৫ পর্য্যন্ত সেনানায়কেরা প্রয়োজন মত লড়াইয়ে কেবল কায়দা বদল করিয়া যাইতেছেন আর অনুগত যোদ্ধৃবৃন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে নেতাদের নির্দ্দেশে আগু বাড়াইয়া যাইতেছেন নির্ভয়ে এবং পিছু হটিয়া আসিতেছেন নির্লজ্জ আননে। একদা এই সংগ্রাম তাহার অভিলষিত সিদ্ধিকে অর্জ্জন করিয়া সুনিশ্চিতই থাকিবে কিন্তু সেদিন সেই প্রাংশুলভ্য বা প্রায় অলভ্য স্বাধীনতার সম্পদ হাতের

মুঠায় পাইয়া সেই মানুষগুলি কি করিবে, যাহারা আজ প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকদের নিকটে শিক্ষা পাইতেছে যে, মাতৃগর্ভে বসিয়াই বাৎস্যায়নের কামসূত্র কণ্ঠস্থ করিতে হইবে, তরুণীসম্ভোগের বর্ব্বর আনন্দ দিয়া জীবনকে সতেজ, প্রফুল্ল ও দম্ভদৃপ্ত করিতে হইবে? সেইদিন সেই মানুষগুলি কি করিবে, যাহারা বাংলার প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকদের কাছ হইতে শিক্ষা করিল যে, বিকৃত যৌনবোধই মানুষের মনুষ্যত্ব, অসার এই সংসারে যৌন-লালসাই একমাত্র সার, অনিত্য এই জগতে যৌন-তৃপ্তিই একমাত্র নিত্যবস্তু, ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্য জীবনের বাসনার রুগ্ন কাতরতাই শাশ্বতের একমাত্র আবেদন? বাংলার সাহিত্য-চর্চ্চার এই অপকর্ম একদা সমগ্র ভারতের মানস-গগনে পূতিগন্ধ বিস্তার করিবে, কেননা ভারতের যে-কোনও প্রান্তের নান্দনিক সাহিত্যের চর্চ্চাকারীরা আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যিক শিল্পবোধকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। একদা হয়ত স্বাধীন ভারতের যাবতীয় মানব-গোষ্ঠী বাংলার অপসাহিত্য-স্রষ্টা এই সকল প্রতিভাবান্ পুরুষের প্রতি ধিক্কারের পচা ডিম নিক্ষেপ করিয়া অভিযোগ করিবেন যে, বাংলা যেমন একদা সমগ্র ভারতকে স্বাদেশিকতার দীক্ষা দিয়া হইয়াছিল স্বাধীনতার আদি মন্ত্রগুরু, ঠিক তেমনি বাংলার অপসাহিত্য-স্রষ্টারাই মাতা সরস্বতীকে কদর্য্যতার গভীরতম পঙ্ককূপে নিক্ষেপ করিয়া সমগ্র ভারতকে কদাচার ও দুর্নীতি শিক্ষাদানের হইয়াছে পাপিষ্ঠ শিক্ষাগুরু।"

প্রবাস-বাসের সুফল

হুগলী জেলান্তর্গত সিঙ্গুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একা সামরিক চাকুরী লইয়া অজানা দেশে গিয়া পড়িয়াছ, বলিয়া মনে দুর্ব্বলতা রাখিও না। অঋণী থাকা ভাল কিন্তু অপ্রবাসী থাকিলে এই যুগের মানুষের আর ভদ্র ভাবে বাঁচিয়া থাকার উপায় নাই। যত দূরদেশেই হউক না কেন আর যত অসুবিধাজনক স্থানই হোক না কেন, মাড়োয়ারীরা ব্যবসা করিবার জন্য কোনও স্থানে যাইতেই দ্বিধা করে নাই। আজ তাহারই জন্য রাজপুতনার পাথুরে মরুভূমিতে জনহীনপ্রায় বসতিগুলিতেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মূল্যের হর্ম্ম্যরাজি শোভা পাইতেছে। সারা জীবনই যাহাতে প্রবাসী না থাকিতে হয়, তাহার জন্য প্রথম জীবনে সাধ্যমত প্রবাসের অভিমান চালাইয়া যাওয়া প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। প্রবাসে বাসের অনেক দুঃখ আছে কিন্তু অনেক সুফলও আছে। জ্ঞান, বিদ্যা, অভিজ্ঞতার বৃদ্ধিই মাত্র নহে, উপার্জ্জনের শ্রীবৃদ্ধি ইহাতে সম্ভব। সব চেয়ে বড় কল্যাণ প্রবাস-বাসের এই যে, ইহা দ্বারা নানা দেশের নানা জাতির লোকের প্রতি প্রেম জন্মে, সহানুভূতি জন্মে, আত্মীয়তা উপজাত হয়। পৃথিবীর সকলকে আমরা আপন করিব, এই জন্যই ত' আমরা মানুষ।"

প্রবাস-বাসের ব্যর্থতা

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রবাসে বাস তখন একেবারেই ব্যর্থ, যখন যাহাদের দেশে প্রবাস যাপন করিতে হইল, তাহাদের প্রতি প্রীতি জন্মিল না, তাহাদের সহিত আত্মীয়তার সৃষ্টি হইল না, তাহাদের কুশলের জন্য ত্যাগ-স্বীকারের প্রবৃত্তি প্রসারিত হইল না। আসামে, উড়িষ্যায়, ইউ-পিতে, কাশ্মীরে বাঙ্গালী গিয়াছে, কিছুই স্বদেশে ফিরাইয়া আনে নাই, খরচ-পত্র সব সেই সেই দেশে করিয়াছে, পরোক্ষে সেই সেই দেশের হাতে ইহাদের উপার্জ্জিত অর্থ ঘুরিতে পাইয়াছে। মাড়োয়ারী, গুজরাটি, বোম্বাই-ওয়ালারা বাংলায় আসিয়াছে, প্রচুর বিত্ত অর্জ্জন করিয়াছে কিন্তু প্রায় যাবতীয় বিত্তই নিজ নিজ প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছে, বাঙ্গালীকে আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। এখন টের পাওয়া না গেলেও কিছুকাল পরে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে আসিবে যে, এই ব্যবহারকে বাঙ্গালীরা লুণ্ঠন বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়া একদা ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইবে। প্রবাস-বাসের ইহা কুফলের দৃষ্টান্ত হইবে। সমগ্র পৃথিবীই আমাদের স্বদেশ, সমগ্র ভারত আরও নিকটতর স্বদেশ এবং বঙ্গভূমি নিকটতম স্বদেশ,—এই বোধ নিয়া যেমন বাঙ্গালীর চলা উচিত, অবাঙ্গালীদেরও বাংলায় বাস করিবার কালে ইহার অনুরূপ মনোভাবই থাকা সঙ্গত। প্রবাসে বাসকালে এইরূপ আত্মীয়তার

সৃষ্টি হইতে থাকিলে ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্য অতীব দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বজনীন সেই বৃহত্তম কুশলের দিকে তাকাইয়া তুমি তোমার প্রবাস-জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিও। যাহাকে যেখানে দেখিতে পাইব, নিকট করিব, বন্ধু করিব, আপন করিব, আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধিব,—ইহাই তোমাদের প্রতিজনের প্রবাসের ব্রত এবং মনোভঙ্গী হউক এবং এই মনোগতি লইয়াই সকলে দশ দিকে ছড়াইয়া পড়।"

স্বরূপানন্দ-পাঠচক্র

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যেখানেই যাও, অল্পদিনের জন্য সেখানে থাকিতে হইলেও একটী সাপ্তাহিক পাঠচক্রের অনুষ্ঠান করিবে। ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় কোথাও কোথাও এই পাঠচক্র নিয়মিত ভাবে, কোথাও বা অনিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমার কথিত বাণীর ও লিখিত পত্রের সুন্দর বাঁধানো খাতায় স্পষ্ট অক্ষরে অনুলিপি তৈরী করিয়া বহু খণ্ডে উহা বহু স্থানে নিয়মিত পঠিত হইতেছে। * দেখিতে ইহা একটি

* তাহাই পরবর্ত্তী কালে "অখণ্ড-সংহিতা" নামে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। যেই সকল স্থানে বাংলা ভাষার প্রচলন নাই, সেই সেই স্থানে আঞ্চলিক ভাষায় বিশেষ বিশেষ বাণী বা নিবন্ধ অনুবাদ করিয়া তাহা অবলম্বনে পাঠচক্রের কাজ চলিতে পারে।

তুচ্ছ কার্য্যক্রম কিন্তু যদি দীর্ঘকাল একাজটী চলে, তাহা হইলে তোমরা এর শুভফল প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত ও চমকিত হইবে। সত্য চিন্তার মৃত্যু নাই। সত্য ইচ্ছায় পরাজয় নাই। ছোট্ট এই কাজটীতে নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকার মহিমায় তোমরা একদা ভারতের চিন্তাজগতে এমন আলোড়ন আনিতে পারিবে, যাহা আজ অকল্পনীয় মনে হয়। চেষ্টা করিয়া কিছু তরুণ শ্রোতা সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহাদের মনে শুচিতার ভাব সংক্রামিত করিয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শান্ত মনে বসিয়া পাঠ শুনিবার আগ্রহ জানাইতে হইবে। পাঠ করিয়া শুনাইবার কালে নিজের জিহ্বার জড়তা ও উচ্চারণের আড়ষ্টতা পরিহার করিতে হইবে। পাঠকালে নিজের মনের ভিতরে আত্মশুদ্ধির প্রবল প্রেরণা রাখিতে হইবে। কাজ অতি সামান্য, অর্দ্ধঘণ্টা কালেই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইতে পারে কিন্তু লাগিয়া থাকিতে পারিলে ইহার ফল অতীব প্রকাণ্ড এবং প্রভাব সুদূরপ্রবাসী হইবে।"

কুমারী ও বিবাহ

হুগলী জেলান্তর্গত ঘুটিয়াবাজার-নিবাসিনী জনৈকা কুমারী কন্যাকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জন্ম হইলে মৃত্যু হয়, ইহা যেমন শতকরা এক শত জনের পক্ষেই সত্য, ঠিক তেমনি যৌবন আসিলে বিবাহ হয়, একথাও শতকরা নিরানব্বই জন পুরুষ বা নারীর পক্ষে

সত্য। অথবা বলিব যে, পুরুষের পক্ষে ইহা শতকরা পাঁচাশি জনের পক্ষে সত্য হইলেও নারীদের পক্ষে ইহা শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জনের পক্ষেই সত্য। অর্থনৈতিক জীবনে নারীর পরাধীনতা তাহার পক্ষে পুরুষ-নির্ভরতা অস্বাভাবিক ভাবে স্বাভাবিক করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু একদা নারীজাতির ভিতরে উপার্জ্জনশীলতার ব্যাপক স্ফুরণ ঘটিবে এবং তখন তাহারা অনেকেই আর্থিক জগতে পুরুষের মুখাপেক্ষা না করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। কিন্তু মা হইবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, জননী হইয়া সন্তান-পালনের দিব্য প্রেরণা তাহাকে পুরুষ-নির্ভর করিবেই করিবে। শুধু একটী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াই নারী তাহার যাবতীয় সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া পুরুষকে গৃহ হইতে বিদায় দিতে পারিবে না প্রাকৃতিক স্নেহশীলতা তাহাকে তাহার নির্ব্বাচিত পুরুষের সহিত প্রায় যাবজ্জীবন অভিন্ন সত্তায় ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। পুরুষের ছন্নছাড়া বহির্দিক্‌ভ্রমণকারী বাউণ্ডুলে মনকে একটী নির্দ্দিষ্ট খুঁটিতে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে সংসারী হইতে বাধ্য করার আশ্চর্য্য কুহক নারীর নয়ন-কোণায় রহিয়াছে। তাহারই মহিমায় নারী নিজেও নিজের জালে বাঁধা পড়িবে। সমাজ-বন্ধন সম্পর্কে নানা যুগে নানা দেশে নানা রীতি ও নানা নীতি অনুসৃত হইলেও নারীর দৈহিক গঠন ও মানসিক প্রকৃতি তাহাকে বাধ্য করিয়া বারংবার বন্ধন-দশায় ফেলিবে। এই জন্যই তাহার বিবাহ ঘটিবে, এই সংবাদ কখনো কখনো

শ্রুতিসুখকর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ঘরছাড়া মুক্ত বিহঙ্গমীর যেমন কুলায় না থাকার দরুণ অনন্ত আকাশে অবিরাম বিচরণ এক দুঃসহ ব্যাপার, বাধা-বন্ধ-হীনা নারীর উন্মুক্ত জীবনেও তদ্রূপ দুঃসহতার অফুরন্ত যাতনা রহিয়াছে। এইজন্যই বিবাহ তাহার পক্ষে একটী সংসংস্কার। এই জন্যই বিবাহ তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক ব্যাপার। এই জন্যই বিবাহ তাহার পক্ষে অভিনন্দনযোগ্য। এই জন্যই বিবাহের সংবাদ শুনিলে আমরা তাহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করি এবং বলি, তাহার ভাবীজীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময় ও সুদীর্ঘ হউক।"

বিবাহ রহস্যময় লটারী-খেলা

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কিন্তু পুষ্পসম অনাঘ্রাতা একটী কুমারী কন্যার পক্ষে বিবাহ সুখময় হয় কখন? শান্তিময় হয় কিসে? আনন্দময় হয় কি প্রকারে? সুদীর্ঘ হইতে পারে কি উপায়ে? আমরা আশীর্ব্বাদ করিয়া খালাস, কিন্তু সুখ, শান্তি, আনন্দ ও দীর্ঘজীবিতার নিয়ামক প্রধানতঃ নব-দম্পতির মধ্যে দুই জনকেই হইতে হইবে। বরটী কেমন হইবে, কনেটীর জানা নাই। কনেটী যেমনই হউক, বর যদি কৌশলী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে দুই চারি দিনেই নৌকার হাল সে অক্লেশে ধারণ করিতে পারিবে। কিন্তু হাল ধরিলেই নৌকা চলে না,

দাঁড়ও টানিতে হয়। একজনে যদি হাল ধরে, সে বরই হউক আর কনেই হউক, অন্য জনে দাঁড় টানিতে থাকিলে নৌকা তরতর বেগে লক্ষ্যপথে ছুটিতে থাকিবে। প্রথম হালটা স্বামীকেই ধরিতে হয়, পরে হাল পত্নীর হাতে আসে। এভাবেই সংসার সুখময় হয়। কনে পিতামাতার সজাগ দৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া মানুষ হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই দেহের পবিত্রতার দিক দিয়া সে সন্দেহাতীত ভাবে শুদ্ধ। পরিবেশের দোষে মন-মেজাজ যদি খারাপ পথে আসিয়া থাকে, তবে তাহা আলাদা কথা কিন্তু স্বামীর ঘরে অন্যতর পরিবেশ পাইলে তাহার রূপান্তর, পরিবর্ত্তন, সংশোধন সম্ভাব্য ব্যাপার। কিন্তু বরকে যক্ষের মত চখে রাখিয়া কে বড় করিয়া তুলিয়াছে যে, ভাবিতেই হইবে যে, তাহার চরিত্রে স্খলন ঘটে নাই, তাহার দেহে অপবিত্রতা নাই? অথচ লটারির খেলা এমনই রহস্যময় যে, কাহার সহিত কাহার বিবাহ ঘটিবে, কেহ জানে না। কোন্ বিবাহ কি শুভফল, কিই বা অশুভ, কেহ আগে হইতে হিসাব কষিয়াও দেখিতে পারে না। কল্পনা করিয়াও নির্ণয় করিতে পারে না।

কুমারীর সংসার-প্রবেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এই অবস্থায় তোমার মতন পবিত্র-স্বভাবা নিষ্কলঙ্কা কুমারীর পক্ষে খুব দৃঢ়চেতা হইয়া খুব স্থিরবুদ্ধি রাখিয়া

অচঞ্চল, নির্ভীক এবং প্রতিপদক্ষেপে সতর্কভাবে সংসার-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে হইবে। নিজেরই পছন্দের ফলে হউক বা গুরুজনের নির্ব্বাচন-হেতুই হউক, বররূপে যাহাকে পাইয়াছ, তাহার অতীত নিয়া কোনও দুশ্চিন্তা না করিয়া আস্তে আস্তে এমন ভাবে তাহার দিকে বাহুপ্রসারণ করিবে যেন তোমার চরিত্র-সম্ভ্রমের মহিমায় তোমার বর তোমাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হয়। নৌকা যতই বেহাল মনে হউক, পরিণামে হাল যে শক্ত হাতে তোমাকেই ধরিতে হইবে, এই কথাটী ক্ষণকালের জন্যও ভুলিও না। সংসারের তুমি দাসী নহ, তুমি রাণী, কিন্তু সেই রাণীত্বের মধ্যে বাহ্য বাহার নাই, সেই রাণীত্বের প্রকৃত মহিমা তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য্যে। তুমি তোমার সবখানি সম্ভ্রম লইয়া ঐ সংসারের মনগুলিকে জয় করিয়া ফেল। সবগুলি মনের কাণ্ড হইতেছে তোমার স্বামীর মন, শাখা-প্রশাখা হইতেছে পরিজনবর্গের মন, মূল হইতেছে তাহার পিতামাতার মন। কি করিয়া নূতন সংসারে প্রবেশ করিয়া সকলের প্রিয় হইতে হয়, তাহা যদি বুঝিতে হয়, তবে সকলকে নিজের প্রিয় বলিয়া আগে ভাবিতে হয়। অপরকে প্রিয় না করিলে নিজে কদাচ প্রিয় হইতে পারিবে না। কিন্তু প্রিয়াপ্রিয়ের নিশ্চয়ই তারতম্য থাকিবে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে বিপদ ঘটিয়া থাকে।"

একলব্যের সাধনা

হাওড়া জেলান্তর্গত সাঁতরাগাছি-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি এবং তোমার সহধর্ম্মিণী উভয়ে মিলিত হইয়া আমার প্রতিচিত্রকে তোমাদের গুরুস্থলাভিষিক্ত করিয়া নিজেরা নিজেদিগকে ওঙ্কার-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছ জানিয়া সুখীও হইলাম, চমৎকৃতও হইলাম। ইহা প্রাচীন যুগের একলব্য শিষ্যের বিংশ শতাব্দীর উপযোগী অনুকরণ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে গৌরবান্বিত হও এবং জগদ্বাসীকে তোমাদের মহাপ্রাণতা ও সেবা দ্বারা হৃষ্ট কর। কিন্তু বাবা, একটি কথা। একলব্যের একাগ্রতা নিয়া সাধন করিও। আমার জীবন-কালের মধ্যে তোমাদের আসিয়া আমার নিকটে পুনরায় দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন আছে কিনা, এই বিষয়ের আলোচনার চেয়ে বড় কাজ হইবে, কি করিলে তোমাদের সাধন-কর্ম্মে উৎসাহ নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ করা এবং সেই উপায়গুলিকে দৃঢ়তার সহিত প্রয়োগ করা, অনুসরণ করা, সার্থক করা। 'একলব্য' একটি মুখের বুলি মাত্রে না পর্য্যবসিত হইয়া যান, তার জন্য চাই সুতীব্র, সুদীর্ঘকালব্যাপী, ধৈর্য্য-সহকৃত সুগভীর সাধনা। সত্য গুরু হইতে হইলে এই যুগে কেহ অন্যের অন্নদাসও হইবেন না বা কোনও শিষ্য-বিশেষের প্রতি

অত্যধিক অনুরক্তি বা মোহবশতঃ অন্য শিষ্যের অঙ্গুষ্ঠা-ছেদনও করিবেন না। এই বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও। একদা একলব্যেরা হঠাৎ সাবালক হইয়া তথাকথিত গুরুদেবের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন না, ইহার নিশ্চয়তা নাই। প্রথমে বাণনিক্ষেপ শুরু হয় শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া। পরে আস্তে আস্তে সাহস বাড়িয়া যায় এবং তখন নাভি, বক্ষ, পৃষ্ঠ এবং শিরোদেশ প্রভৃতি পরপর আক্রান্ত হইতে থাকে। গুরু, যাহাকে মানিয়াছ, তাহার আদর্শ ও অভিমত সম্পর্কে এবং জীবনের অধিকাংশ দৃষ্টান্তস্থানীয় আচরণ সম্পর্কে অজ্ঞতা অনেক একলব্যের মনে অহংমন্যতার বিভ্রান্তি আনিয়া থাকে এবং তাহারা না জানিয়াও অনেক সময়ে এমন কাজ করিয়া বসে, এমন কথা প্রচার শুরু করে, যাহা নিতান্তই অসার এবং অবাস্তব। নিজেকে ধাপে ধাপে সামাজিক মানুষের চোখে উচ্চতর করিবার লক্ষ্যে কেহ কেহ নামী লোকদের শিষ্যরূপে নিজেদের পরিচয় জাহির করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বলিতে শুরু করে যে, 'ঐ লোকটা আবার কি জানিত? আমিই ত' সত্যলাভের যাবতীয় পন্থা আবিষ্কার করিলাম।' এরূপ ঘটনা জগতে অহরহ ঘটিতেছে। সুতরাং গোপনে যদি আমাকে গুরু-রূপে বরণ করিয়াই তোমার আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে পাদচারণা শুরু হইয়া থাকে, তবে আমি বলিব যে, তোমার আর আমার মধ্যেকার এই সুন্দর সরস সম্পর্কটী পৃথিবীবাসী যাবতীয় নরনারীর

নিকটে গোপন রাখিয়াই পথ চলিতে থাক। আশীর্ব্বাদ করিতে বসিয়া তোমাকে আবার একটী বিষয়ে সতর্কতা জ্ঞাপন করিতেছি দেখিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইও না বাবা। এই কথাগুলি তোমার শুনিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে।"

প্রতিষ্ঠালোভে শিষ্যত্বগ্রহণ

মালদহ জেলান্তর্গত শিবগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অদ্যই প্রায় অনুরূপ আর একখানা পত্রের উত্তরে অন্য জেলার আর একজনকে কতকগুলি কথা লিখিয়াছি। তাহাকে যাহা লিখিবার প্রয়োজন ছিল না, তোমাকে আবার তৎসম্পর্কিত এমন কতকগুলি কথাই লিখিতে হইতেছে দেখিয়াও কম চমৎকৃত হই নাই। আমি আবাল্য আমাদের দেশের ছোট বড় ধর্ম্মান্দোলনগুলির গতি, প্রকৃতি, বিস্তার, সঙ্কোচ এবং আদর্শবাদের প্রসার বা স্খলন সম্পর্কে নানা ঘটনার সহিত, কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে, কোথাও বা পরোক্ষ ভাবে পরিচিত হইয়াছি। দেখিয়াছি, এক এক সময়ে এক একটা অঞ্চলে এক একটা ধর্ম্মমতের যেন উজান বহিতে থাকে এবং সেই সময়ে সেই সত্যের প্রচারক বা সমর্থক মহাপুরুষদের কাছে অন্যান্য সাধু-সন্তেরা যেন পূর্ণ-চন্দ্রমার নিকটে খদ্যোত বা স্বয়ং সূর্য্যদেবের সমক্ষে চন্দ্রমা হইয়া

যান। কিন্তু চাঁদের ত' অমাবস্যা আছে, সূর্য্যেরও রাহুগ্রাস সুবিদিত। ফলে বিভিন্ন মহাপুরুষের লোকচিত্তে উত্থান পতনের একটা চমৎকার বায়োস্কোপের খেলা যেন অবিরাম চলিতেছে। যখন যিনি পসার-প্রতিপত্তিতে প্রবল, একদল লোক আছে, যাহারা তখন তাঁহার চেলা হইয়া লোকচক্ষে মহৎ সাজিবার প্রলোভন দমন করিতে পারে না। ইহারা সাধকও নহে, ভক্তও নহে, প্রতিষ্ঠার বাজারে গণিকা মাত্র। ইহারা বারংবার গুরু করে, বারংবার গুরুত্যাগ করে, বার বার নানা গুরুকে বরণ করে, আবার হরণও করে, বারংবার নানা মতে নানা পথে চলিয়া নিজের গতি ও প্রকৃতিকে জটিলতার জালে বদ্ধ করে। এমন সব হতভাগাদের সহিত কদাপি নিজের ভাগ্যকে বিজড়িত করিও না। বহু নৌকায় পা রাখিয়া যাহারা নদী পার হইতে চাহে, সলিল-সমাধিই যে তাহাদের ললাট-লিখন, এই কথা কখনও ভুলিয়া যাইও না।"

কলহ ও দীর্ঘায়ু

স্বাধীন ত্রিপুরান্তর্গত ধর্ম্মনগর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অশান্তি করিয়া অনেক কাজ করার চাইতে শান্তিপূর্ণ ভাবে অল্প কাজ করাও ভাল। কারণ, তাহাতে দীর্ঘায়ু পাইয়া সুদীর্ঘকাল কাজ করিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা বাড়ে।

নিত্যকলহ মহাযুদ্ধের অপেক্ষাও মারাত্মক। কেননা, মহাযুদ্ধ একবার থামিলে দীর্ঘকাল আর কোনও পক্ষ হইতেই যুদ্ধের উত্তেজক আলোচনা হয় না। নিত্যকলহে তোমার সর্ব্বশক্তির অপচয় হইয়া যায় না বলিয়াই একটা রাত্রির ঘুমের পরে পুনরায় তুমি পূর্ণ উদ্যমে কলহে লাগিয়া পড়িতে পার। ইহা যে তোমার শান্তির কত বড় বিঘ্ন, তোমার পরমায়ুর কত বড় শত্রু, তাহা যদি জানিতে, তবে তুচ্ছ ব্যাপারে মৌন অবলম্বন করিয়া নিজেকে কলহের প্ররোচনা হইতে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে। পুপুন্‌কী আশ্রমে আমাকে নিত্য নানাবিধ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতে হইতেছে। তাহার বিশদ বর্ণনা দিলে তোমরা ভাবিয়া পাগল হইয়া যাইবে যে, এমন একটা দেশে আমি জিদ করিয়া লাগিয়া রহিয়াছি কি প্রকারে। কেহ চুরি করিতে আসিলে আমি তাহাকে দণ্ড দান না করিয়া করি নানাভাবে প্রতিপালন। কেহ হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে জানিলে তাহার প্রতি রুষ্ট না হইয়া বরং তার উপকার করিবার চেষ্টা করি। ইহাতে আমার অপমৃত্যুর সম্ভাবনা নিশ্চয়ই হ্রাস পায় না কিন্তু যদি অপমৃত্যু মরিতে না হয়, তাহা হইলে দীর্ঘায়ু যে হইবই, ইহাতে সন্দেহ করি না। ক্রোধ আয়ু হরণ করে, সে কামের চেয়ে কম আয়ুঃক্ষয়কর নহে। ক্ষমা, ঔদার্য্য, ঈশ্বরবিশ্বাস আয়ু দান করে। লুব্ধতা আয়ুকে ক্ষয়িত করে, বদান্যতা আয়ুবর্দ্ধনে সহায়তা করে।"

নেতাদের মনস্তত্ত্ব

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত পলাশপাই-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নেতাদের চরিত্র সম্পর্কে লিখিয়াছ। আমি চরিত্র নিয়া আলোচনা করিব না। নেতাদের মনস্তত্ত্বটা বরং আলোচনা করা চলে। চরিত্র ত' মনের আভ্যন্তরীণ ছবিটা বাহ্য প্রকাশ। তোমরা দুর্গম বনে, পার্ব্বত্য টিলায়, জলহীন মরুপ্রান্তরে, সর্প-কুম্ভীরাদি-পূর্ণ বিশাল জলা-ভূমিতে ডাক্তার লিভিংষ্টোনের মত বা ষ্ট্যানলী সাহেবের মত ইতর মানুষগুলির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে আর নেতারা শহরে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের শ্রীমুখ হইতে রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত কোনও সদ্বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হইবেন না, ইহাই সাধারণতঃ নেতৃত্বসুলভ শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ। তাঁহারা নেতা হইয়াছেন, তোমরা সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া তাঁহাদের নামে জয়ধ্বনি তুলিবে বলিয়া। তাঁহারা নেতা হইয়াছেন তাঁহাদের নিজেদের খেয়াল-খুশী মতন তোমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া। তাঁহারা নেতা হইয়াছেন তোমরা সুদূর পল্লীপথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া কণ্টকবিদ্ধ ক্ষতাক্ত চরণে তাঁদের গৃহদ্বারে আসিয়া দর্শন লাভাশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিবে বলিয়া। পরের শ্রমে নিজের জন্য যশ এবং ক্ষমতা অর্জ্জনের মনোবৃত্তি তাঁহাদের অধিকাংশকে এক প্রকারের চোরে পরিণত

করিয়াছে। চাঁদার টাকা হয়ত হাতে ছুঁইবেন না কিন্তু তোমাদের প্রাপ্য যশের ডালি তাঁহাদের চাইই চাই,—ইহারই নাম এই লক্ষ পরাধীন দেশে নেতাগিরি। এই সব নেতাদের সম্পর্কে সাবধান হও। নিজের বিবেককে নিষ্কলঙ্ক রাখিয়া দেশসেবার কাজ কর। কাহারও কুবুদ্ধিতেই নিজেকে কলুষের মালিন্যে অনুজ্জ্বল করিও না।

পল্লীগ্রামে মহতের আগমন ঃ পত্র লেখার আনন্দ

বাখরগঞ্জ জেলান্তর্গত গাজিপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের গ্রামটী ছোট এবং যাতায়াতও সহজ ব্যাপার নহে জানিয়াও লিখিতেছি যে, তোমরা যদি সত্যই কোনও মহৎ ব্যক্তিকে তোমাদের নিজেদের উপকারের জন্য তোমাদের মধ্যে পাইতে চাহ, তবে উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হইলে একদা তাঁহাকে তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই পাইতে পার। প্রকৃত মহৎ লোকের নিকটে দূরত্ব বা দুর্গমত্ব একটা সমস্যাই নহে, কারণ, তাঁহার নিকটে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মাদি ব্যাপার জনসেবায় কোনও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহে। আমি ত' চাহি সকল জাতির লোককে আমার বক্ষোলগ্ন করি, সকল ধর্ম্মের লোককে আপনার আপন বলিয়া জানি, সকল ভাষাভাষীর

সহিত অন্তরের সম্প্রীতি অনুশীলন করি, সকলের সহিত উন্নত চিন্তা এবং নিষ্কলুষ কর্ম্মের আদান-প্রদান করি। কিন্তু এই জড় দেহকে লইয়া সব দেশে যাওয়া সম্ভব নহে। এই জন্যই এত পত্র লিখি। আমার অর্থাগমের পথটী অতীব সঙ্কীর্ণ, তথাপি যে অর্থটুকু যখন সদ্‌ভাবে আসে, তাহার বারোআনা ব্যয় করি পরিচিত অপরিচিত হাজার লোকের কাছে অবিরাম পত্র লিখিতে। আশ্রমের সবগুলি অন্তেবাসীর আহারীয় ব্যয়ের দ্বিগুণ আমি খরচ করি প্রতি মাসে ডাকটিকিট কিনিতে। আমার মুদ্রণালয় থাকিলে একাজটী আমি সাময়িক পত্রের সাহায্যে করিতে পারিতাম, তাহাতে শ্রমও কম হইত, কিন্তু প্রতিটি অক্ষর প্রতি মানুষকে লিখিবার কালে মসীর সহিত যে প্রেমটুকু আমি ঢালিয়া দেই, ছাপার হরফে হয়ত সেই প্রেমটুকু মাখানো থাকিবে না। এইজন্যই এত পত্র লিখি এবং লিখিতে আনন্দ পাই।"

যথাকালে শ্রীশ্রীবাবামণি বিলনিয়া আসিলেন।

যৌবনের পূজারী

বিলনিয়াতে যুবকেরা প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি ট্রেণ হইতে নামিয়াই তাহাদের মধ্যে গিয়া বসিলেন। আরম্ভ হইল ভাষণ। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, তোমরা আমাকে জানো না। তবু ভালবাসার টানে প্রতীক্ষায় ব'সে আছ। আমি কিন্তু তোমাদের জানি ব'লেই তোমাদের খুঁজে বের করার জন্য

দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমরা ভারতের অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি, তোমরা ভারতের বর্ত্তমানের উজ্জ্বল নক্ষত্র, তোমরা ভারতের ভবিষ্যতের নির্ম্মাতা। ত্রিকালদৃষ্টিতে আমি তোমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক্ হ'য়ে ব'সে ব'সে ভাবি যে, কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি তোমরা বিশ্ব-বিধাতার। তোমাদের মহত্ত্বপূর্ণ অস্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে দেশের কোনও কুশলকামীরই কল্যাণযাত্রা শুরু হ'তে পারে না বা কোনো কুশলকারীরই কর্ম্মযজ্ঞে পূর্ণাহুতি সম্ভবপর নয়। প্রতিটি মঙ্গলকর্ম্মে, প্রতিটি ব্যাপক প্রয়াসে, প্রতিটি গভীর ভাবান্দোলনে তোমাদের বুকের রক্ত দেশ-মাতৃকার হয় পরম কাম্য, তোমরা নিজেদের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে দেশের রচনা কর্ব্বে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তোমাদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ভাষায় বর্ণনা ক'রে শেষ করা কখনো যাবে না। অতীত ভারত তার গৌরবময় মহিমান্বিত সৌভাগ্যকে নির্ম্মাণ করেছিল গুরুগৃহে অধ্যয়নরত তোমাদেরই বক্ষপঞ্জর দিয়ে, তোমাদেরই ত্যাগ-ব্রহ্মচর্য্য-সংযমের তপস্যা দিয়ে, তোমাদেরই উজ্জ্বল জীবনের একনিষ্ঠ-সেবার মধ্য দিয়ে। আজকের অধঃপতিত ভারতবর্ষ তোমাদেরই জীবন-জর্য্যার অপ্রতিম প্রতিভার আশ্রয়ে আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবের দিনে ফিরে যেতে চায়। এই জন্যই আমি যৌবনের পূজারী।

একদল যুবক দীক্ষা গ্রহণের জন্য তৈরী ছিল। তাহারা

সারাদিন উপবাসী ছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি মাত্র একজনকে দীক্ষা দিলেন।

রাত্রি ৮টা ৪০ মিনিটে শ্রীশ্রীবাবামণি ফেণী পৌঁছিলেন।

ফেণী (নোয়াখালী)
(২৫শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪২)
(১২ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

বাঁচার মত বাঁচা

ফরিদপুর জেলান্তর্গত কুঁয়ারপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য বাঁচিয়া থাকা নিতান্তই নিরর্থক এক ব্যাপার। আমার দ্বারা যদি জনগণের কোনও হিত সাধিত না হইল, আমি যদি আত্মোন্নতির এমন প্রকর্ষে যাইতে না পারিলাম, যাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ফলই জীব-কল্যাণ, তাহা হইলে আমার ফুস্‌ফুসে নিয়মিত বায়ু-চলাচল করিয়াছে বলিয়াই কি আমাকে জীবিত বলিয়া গণনা করিতে হইবে? পরমেশ্বরে অনুরাগহীন, গুরুজনে ভক্তিহীন, পরদুঃখে উদাসীন, নিজ স্বার্থে নিত্যলীন অধম আমরা বাঁচিয়া থাকিলেই বা কি, মরিয়া গেলেই বা কি? জীবনকে প্রকৃত মূল্যদান করিতে হইলে মরণকে অক্লেশে বরণের সংসাহস আমার রাখিতে হইবে। তোমাদের উপদেশ দিলাম যে, তোমরা প্রতি জনে দেশ, জাতি এবং জগতের জন্য আত্মোৎসর্গ কর

আর আমি নিজে সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ-সাধন হইতে বিরত রহিয়া সুদীর্ঘ জীবন বাঁচিয়া থাকিয়া কেবল নিজের জন্য যশ, গৌরব, অর্থ ও প্রতিপত্তি আহরণ করিলাম, এমন বাঁচাকে প্রকৃত বাঁচা বলিয়া ভ্রম করিবে কেবল অজ্ঞ মূর্খ অন্ধেরা। বাঁচিবার মতন বাঁচিতে ইচ্ছুক জনগণের আবির্ভাবই হইতেছে আজ দেশের প্রকৃত কাম্য বস্তু। ইহার চাইতে কম করিয়া কিছু প্রার্থনা করিতে যাওয়া আর কল্পতরুর পাদমূলে দাঁড়াইয়া অম্লাস্বাদ চালিতা ফল যাচ্ঞা করা এক কথা।"

বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের আবশ্যকতা

রাজসাহী জেলান্তর্গত দুবলহাট্টী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কন্যা বিবাহ দিবার পরে যদি আবিষ্কৃত হইয়া যায় যে, পাত্রপক্ষ গুরুতর দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, ব্যাধি, পাপ, পরিচয় এবং অন্যান্য অপরিহার্য্য রূপে প্রকাশনীয় বিষয় গোপন করিয়া বিবাহ করিয়াছে তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রেই আইনের এই বিধান থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে যে, বিবাহ নাকচ হইয়া যাইবে। কিন্তু পতিপত্নীর মধ্যে যদি দৈহিক ঘনিষ্ঠতা আসিয়া যায় এবং একে অপরের অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিয়া স্নিগ্ধ মনে যদি অপরকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া নিয়া

থাকে, তবে প্রথার ভুল, আচরণের ভুল, অনুষ্ঠানের ভুল প্রভৃতির পুঞ্জীকৃত কদর্থ ও বিস্তারিত বিবরণ করিয়া উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিবার চেষ্টা সঙ্গত কিনা, তাহা দম্পতীর নিজেদের মনোগত ভাবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তুমি জজ্ জানিয়া যাহাকে কন্যাদান করিয়াছ, যদি বাহির হইয়া পড়ে যে, সে কালেক্টারী অফিসের একটী পিওন মাত্র, তাহা হইলে ইহার চাইতে অধিকতর দুঃখের কথা আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু মানুষ-হিসাবে এই পিওনটী যদি তোমার কন্যার মনোহরণ করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে এই ব্যাপারে আর অশান্তি সৃষ্টি না করাই ভাল। তুমি জজ্ ভাবিয়া যাহাকে কন্যাদান করিয়াছ, সে জজ্ ত' ঠিকই রহিল কিন্তু জানা গেল যে, সে পরনারী অনুরক্ত ও কদর্য্য যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত। এমন অবস্থায় তোমার কন্যা যদি তাহাতে অনুরক্ত না থাকিতে পারে, বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই শোভনীয়। একটী পাগলের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ হইয়া গেল, পাগল দুমাস পরে অন্তর্ধান করিল, তার ঠিকানা নাই, এমন অবস্থায় ঐ পাগলের আশায় সকল মেয়েই দশ, বিশ বা পঞ্চাশ বৎসর বসিয়া থাকিতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার প্রয়োজনীয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারটা হিন্দুর মজ্জাগত সংস্কারের সহিত মিলে না কিন্তু যুগের দাবীতে ইহার সমর্থনে সুবিচারমুখী আইন প্রণীত হওয়া উচিত। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রণীত হইলে স্বৈরিণী

গোছের কিছু রমণীর পোয়াবারো হইবে, ইহা সত্য কিন্তু উৎপীড়িতা, প্রবঞ্চিতা, দুশ্চরিত্র স্বামীর অত্যাচারে জর্জ্জরিতা কিছু অনাথার দুঃখের আংশিক প্রতিবিধানও হইবে।"

জনকল্যাণে স্বাবলম্বী হও

বগুড়া জেলান্তর্গত দুরচাঁচিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কেহ বিপন্ন হইলে তাহাকে নিয়া মহানুভব অন্য লোকের নিকটে গিয়া তাহার জন্য সাহায্য আদায় করিয়া আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করা অনেক সজ্জন ব্যক্তির অভ্যাস আছে। ইঁহারা নিজেরা আর কিছু করিবেন না, কেবল দয়ালু লোকদের দয়ার উপরে উৎপীড়ন করিবেন। ইহা একপ্রকারের ভিক্ষুকবৃত্তি। আমি অতীব বিশ্বসনীয় এক ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে, বাংলার এক শ্রেষ্ঠ দাতার নিকটে এক মহান প্রতিভাধর পুরুষ একটী কন্যাদায়গ্রস্তা বিধবা মহিলাকে সাহায্য দানের অনুরোধপত্র দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। দাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পত্রপ্রেরক নিজে কিছু করিয়াছেন কি? উত্তর হইয়াছিল,—না, তিনি কেবল সুপারিশ-পত্রখানা লিখিয়াই দায়িত্বমুক্ত হইয়াছিলেন। ভিক্ষুকের বৃত্তিকে তাহার নিজ সূতিকাগারে না বিনষ্ট করিতে পারিলে এই দেশের কোন মঙ্গল নাই। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গ্রামের দুঃখী ও দরিদ্রের জীবন-ভার হালকা করিবার জন্য কায়িক পরিশ্রম

করিয়া কিছু কিছু অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে পার এবং লোকের কাছে চাঁদার খাতা নিয়া হাজির না হইয়া সেবার দাবী নিয়া দাঁড়াইতে পার। পচা হাজা মজা পুকুরের দেশে অন্ত নাই। ভাঙ্গাচুরা রাস্তাই বা কম্‌তি কোথায়? বিদ্যালয়ের ভাঙ্গা ঘর মেরামতের কাজ তোমরা কি হাতে নিতে পার না? নিকটবর্ত্তী রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে স্বল্প পারিশ্রমিকে মোট বহিয়া কিছু পয়সা রুজি করার চেষ্টাও একেবারে অবাস্তব কল্পনা নহে। কত যে কাজ দেশটা জুড়িয়া আছে, যাহা হাতে নিবার চেষ্টা করিলে জনসেবার কিছু অর্থ হাতে আসিতে পারে। আমি ত' চাঁদা তুলি না, তবু ত' ব্রহ্মাণ্ড চষিয়া ফেলিতেছি আমার বক্তৃতায় আর কখনো বা গানে। যাহা আমি পারি, তাহা তোমরাও পারিবে।"

সহিষ্ণুতা সম্বল কর

বীরভূম জেলান্তর্গত দুবরাজপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ধৈর্য্য ধর মা, সহিষ্ণুতাকে সম্বল কর। ধরিত্রীর মতন সহিষ্ণু হও। চিরকাল কেহ অত্যাচার করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। চিরকাল কেহ অত্যাচার সহিবার জন্যও বাঁচে না। অবস্থান্তর ঘটেই ঘটে। বিধাতা কাহাকেও অনন্ত পরমায়ু দান করেন নাই। কি পিতৃকুল, কি শ্বশুরকুল, কোনও কুলেরই কাহারও মনে ক্লেশ দিবে না, এই প্রতিজ্ঞাটি কর। এই

প্রতিজ্ঞা করিয়া নিয়া মনোভঙ্গী ও চিত্তভাবকে তদনুকূল গঠন দিবার প্রয়াসে লাগিয়া যাও। অকথ্য গালাগালি, অশ্রাব্য কুকথা, মিথ্যা অভিযোগ, অভিসন্ধি-মূলক অপবাদ ও অসহনীয় অপমানের প্রতিবাদে কিছুমাত্র না করিয়া মনে মনে অনুক্ষণ পরমমেশ্বরের শরণাপন্ন হও। তিনি অকূল সাগরে তোমার জন্য ভেলা তৈরী করিয়া দিবেন। বিশ্বাস কর আর সহ্য কর। কলহের পথে যদি শান্তি থাকিত, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সশস্ত্র হইবার প্ররোচনা যোগাইতাম কিন্তু কলহ শান্তির সুপথ নহে, কলহ শান্তির বিপথ।"

বিদ্যার চর্চ্চা ছাড়িও না

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত দুলালপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবিকার জন্য জীবনে যেই পথেই ধাবিত হইতে হউক না, কদাচ বিদ্যার চর্চ্চা ছাড়িও না। স্কুল বা কলেজের পড়া সাঙ্গ হইলেই বিদ্যা-চর্চ্চার সময়, অধিকার বা প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় না। ধন-সম্পদ বা বিষয়সম্পত্তি-সঞ্চয়েরও একটা সীমা আছে, বিদ্যা-সঞ্চয়ের কোনও সীমারেখা নাই। যাহারা স্কুলে কলেজে পড়িতে পারিল না, ভাগ্যদেবীর কঠোর নিয়ন্ত্রণে যাহাদিগকে স্কুল-কলেজের দুয়ার দেখিবার আগেই উপার্জ্জনের ধান্ধায় বাঁধা পড়িতে হইল, বিদ্যাচর্চ্চার চেষ্টা তাহাদেরও করিতে হইবে। তবে, মনে রাখিতে হইবে যে,

নীতি-বিগর্হিত কদর্য্য আচরণের বিবরণে পূর্ণ বা ইঙ্গিতে বোঝাই কথা-সাহিত্য বা উপন্যাস পড়িতে থাকার নামই বিদ্যাচর্চ্চা নহে। যে গ্রন্থ পাঠ করিলে জ্ঞানের চক্রবাল-রেখা দিনের পর দিন দূর হইতে দূরতরবর্ত্তী হইবে, যে গ্রন্থের তত্ত্ব, উপদেশ ও ইশারাকে জীবনের বিঘ্নসঙ্কুল যাত্রাপথে সহায় এবং সমপদ-রূপে পাওয়া যাইবে, যাহা একবার পাঠে মধুর, দুইবার পাঠে মধুরতম, তিন বার বা বহুবার পাঠে একেবারে অমৃততুল্য অতুলনীয় স্বাদু বলিয়া মনে হইবে, বিদ্যাচর্চ্চার জন্য তেমন গ্রন্থই তোমাকে নির্ব্বচন করিতে হইবে। কারবারীদের বিজ্ঞাপন, জুয়াখেলার দালালদের প্রচারপত্র, অসৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত ইস্তাহার প্রভৃতিকে জ্ঞান-বৃদ্ধির বা বিদ্যার্জ্জনের হাতিয়ার বলিয়া কদাচ ভ্রম করিও না।"

মনুষ্যত্বের প্রমাণ

২৪-পরগণা জেলান্তর্গত রতনপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বীকার করিয়া লইতে দোষ কি যে, বিপন্নকে বিপদুদ্ধারে সহায়তা করিবার জন্যই মানুষের জন্ম? স্বীকার করিতে দোষ কি যে, বিপন্নকে সহায়তা করিবার জন্যই সুবিচারের পত্তন? বিপন্নের বিপদ দেখিয়া যাহার প্রাণে সহায়তা করিবার প্রবৃত্তি

জাগে না, সে হয় প্রস্তর, নয় পশু। পশুর মতন তাহার খুর-নখর বা পুচ্ছবিষাণ নাই, এতটুকু যুক্তিই তাহার পশুত্ব খণ্ডাইয়া দিতে পারে না। মনুষ্যত্বের প্রমাণ দিতে হইলে তাহাকে প্রাণের প্রাচুর্য্য লইয়া আর্ত্তের ত্রাণে লাগিয়া যাইতে হইবে। লাঞ্ছনাকারীকে, অত্যাচারীকে, আততায়ী ও উৎপীড়ককে সহায়তা করিবার জন্য যে বিচারের অভিনয়, তাহা মনুষ্যসংজ্ঞক প্রাণীদের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। যে দেশে বিচারের নামে অবিচার হয়, পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেই দেশ দেখিতে না দেখিতে রসাতলে ডোবে। কে এই কথা না জানে যে, রসাতলে মানুষের বাস নাই? সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তি যে দেশে সুবিচারের প্রত্যাশা করিতে পারে, মাত্র সেই দেশই মানুষের দেশ। অন্য দেশকে দানবের দেশ আখ্যা দিতে পার। মানুষের প্রকৃত মূল্য যেখানে নির্দ্ধারিত হয় নাই, সুবিধাবাদই যেখানে মানুষের ওজন নিবার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, সেখানে সুবিচার কদাচ হইতে পারে না। জগদ্বাসীরা দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচারের নিষ্পেষণে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমরা এখনো মানুষ হইতে পারি নাই, বিবর্ত্তনের মুখে একটু একটু করিয়া উন্নততর হইতে হইতে মানুষের প্রতিমূর্ত্তিটাই মাত্র লাভ করিতে পারিয়াছি; প্রকৃত মানুষ হইতে আরও অনেক দেরী আছে। উদ্বর্ত্তনের ক্রমানুসারে একদা যে মানুষ হইতে পারিবে,

ইতিহাসের ইঙ্গিত বলিয়া দিতেছে যে, সেইটুকু ভরসা করিবার মত সম্বল আমাদের আছে। এখন প্রয়োজন হইতেছে প্রকৃত মানুষ হইবার জন্য প্রপুরুষানুক্রমে কেবল সাধনা করিয়া যাওয়া। মানুষ-রূপে জন্মিয়াছি কিন্তু আমাদের প্রতিটি চিন্তায়, বাক্যে ও কর্ম্মে যতক্ষণ না মনুষ্যত্বের প্রমাণটী দিতে পারিব, ততদিন মানুষ-পরিচয় একটা কথার কথা মাত্র।"

বলি, নৈবেদ্য ও অঞ্জলির তাৎপর্য্য

ফরিদপুর জেলান্তর্গত কালকিনি-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বপ্নে দেখিয়াছ ভগবানের আদেশ হইয়াছে, তোমাকে বলি দিতে হইবে। নিশ্চিত জানিও, এই বলি কোন ছাগ নহে, কোনও মহিষ নহে, এই বলি তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ আদি ছয়টি দৈত্যসম রিপু। দৈত্যকুল-নিসূদনের জন্যই এই বলির আদেশ। বৃথা পশুরক্তে ধরণী রঞ্জিত করা ইহার তাৎপর্য্য নহে। স্বপ্নে দেখিয়াছ, ভোগ দিতেছ, নৈবেদ্য সাজাইয়াছ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছ, ইত্যাদি। এই কাজগুলি তোমাকে আক্ষরিক ভাবে পুনরায় করিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। তবে মনের তৃপ্তির জন্য বাহ্য ভাবে এই কাজগুলি নিজ সাধ্য-সীমার মধ্যে থাকিয়া অবশ্যই করিতে

পার। কিন্তু আসল কাজটী হইতেছে যাহা, তাহা এই যে, হস্তে পুষ্পপত্রদল লইয়া মনে মনে ভাবিবে, ইহারা তোমার সমগ্র জীবনের প্রতীক, তুমি তোমার জীবন তোমার পরমাভীষ্টের চরণে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিয়া ধন্য হইতেছ। বলি, পূজা, নৈবেদ্য ও অঞ্জলির ইহাই প্রকৃত অর্থ, ইহাই তাহার তত্ত্বগত ব্যাখ্যা, ইহার ভিতরেই উহাদের প্রকৃত সার্থকতা। কখনও এই কথা ভুলিও না। আড়ম্বরের দ্বারা অনুষ্ঠানকে রাজসিক মূর্ত্তি দিলে গ্রাম্য লোকের কাছে তোমার যশ বাড়িতে পারে কিন্তু জীবন-দেবতার তুষ্টি তাহার উপরে নির্ভর করে না।"

ছোট সৎকাজের মহিমা

বাখরগঞ্জ জেলান্তর্গত গৈলা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ছোট ছোট সৎকাজে যাহারা হাত পাকাইতে পারে, একদা অপ্রত্যাশিত ভাবে বড় বড় কাজ করিবার ভার হঠাৎ তাহারা পাইয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার বহু নজির আছে। নিঃস্বার্থ পরোপকারকে লক্ষ্যে রাখিয়া গ্রামের একটা হাজা-মজা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা বা সরু ও জঙ্গলাকীর্ণ কর্দ্দমাক্ত রাস্তার সংস্কার সাধন করিয়া হাতে খড়ি দেওয়া এইরূপ কর্ম্ম-তালিকার ভিতরে পড়ে। আমি এসব কাজ

নানা সময়ে নানা স্থানে নিরভিমান-চিত্তে নিজে করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহাতে বিমল আনন্দ ও বিপুল আত্মপ্রসাদ আস্বাদন করা যায়। সুতরাং উপদেশ দিতে হইলে আমাকে তদ্রূপই দিতে হইবে।"

ভৃতক পাঠক ও ভৃতক অধ্যাপক

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বেতনভুক্ শিক্ষক বা লোক-শিক্ষকের কিরূপ সম্মান হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসল প্রশ্নটা এই যে, বেতন নেন ব'লে একজন শিক্ষক বা লোক-শিক্ষক ভৃত্যের সমান ব'লে পরিগৃহীত হবেন কি না। আমি বল্‌ব—না। শিক্ষাদান এমন একটা কাজ, যার বিনিময়ে কেহ নিজ গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ কচ্ছেন ব'লে তাকে অন্য ভৃত্যের তুল্য জ্ঞান করা অন্যায়। কারণ, যে-কোনও সদ্‌বিষয়েই হৌক, জ্ঞানদান যিনি করেন, তিনি পূজনীয় ব্যক্তি। আমাদের দেশের শিক্ষাদানের আদর্শ এত নিঃস্বার্থ এত নিষ্কাম একদা ছিল যে, শিক্ষাদাতা-রূপে কারো আত্মপ্রকাশ ঘটলে তিনি যে আবার প্রতিদানে কিছু অর্থ, বস্ত্র, সম্পত্তি বা উপঢৌকন গ্রহণ কর্ব্বেন, এটা আমাদের চিন্তাজগতের একেবারে বাইরে। গুরুগৃহে গিয়ে বিদ্যার্থীরা বরং গুরুর অন্নেই প্রতিপালিত হ'তো। অবশ্য, গুরগৃহে নানাবিধ শিক্ষালাভের সাথে তারা অন্নার্জ্জনেরও

সাধনা পাত্রোপযোগী-ভাবে ক্ষেত্রোপযোগী-রূপে ক'রে যেত। জ্ঞানদান, শিক্ষাদান, প্রেরণাদান, পরামর্শদান, উপদেশদান, বিদ্যাদান, অভয়দান এবং উন্নতপথে প্রধাবিত করার জন্য শাস্ত্র পাঠ ক'রে শোনানো প্রভৃতি কাজ প্রায় চিরকালই এদেশে নিঃশুল্ক ও অর্থলোভহীন অধ্যবসায় ছিল। কিন্তু তাই ব'লে আধুনিক শিক্ষকেরা মাইনে নিতে পার্ব্বেন না, এটা সঙ্গত আবদার নয়। যা' দেশরক্ষী সৈনিকেরা মাইনে নেয়, হাসপাতালের ডাক্তার ও শুশ্রূষা-কারিণীরা মাইনে নেয়, এজন্য তাদের সেবা আপাংক্তেয় বস্তুতে পরিণত হ'য়ে যায় না। যত অধিক-সংখ্যক মানুষকে বিবাহাদি ক'রে গার্হস্থ্য পথাবলম্বী হ'তে হচ্ছে, তত অধিক সংখ্যক উপার্জ্জক মানুষের আবির্ভাবের আজ প্রয়োজন পড়ে যাচ্ছে। ফলে, শিক্ষাব্রতী বা ধর্ম্ম-প্রচারককেও নিশ্চয়ই নিজ নিজ কর্ম্মের মধ্য দিয়াই জীবিকার্জ্জনের উপায় খুঁজে নিতে হচ্ছে। এতে তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করা দোষাবহ ব'লে আমি মনে করি। আমি আমার ধর্ম্ম-প্রচার-কর্ম্মকে আমার জীবিকার্জ্জনের চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হ'তে দিইনি, এটা সত্য কিন্তু আমাকে যদি কখনো ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অসংখ্য কর্ম্মীকে নিয়োগ কর্ত্তে হয়, তবে নিশ্চয়ই তাদের জীবিকার ব্যবস্থার কথা আমাকে ভাবতে হবে। ভাগবত পাঠ শুনিয়ে একজন পণ্ডিত লোক তার দ্বারা নিজ সংসার পালনের অর্থ সংগ্রহ কর্লে দোষাবহ হবে আর

ঐ ভাগবত পাঠ ক'রেই একজন তাঁর মঠে স্থাপিত ধাতু-নির্ম্মিত বিগ্রহের গায়ে, পায়ে, হাতে, কোমরে, নাকে, কাণে হীরক-খচিত দামী দামী স্বর্ণালঙ্কার পরাবার ব্যবস্থা কর্লে সেটা প্রশংসার কাজ হবে, এমন বিচারকে আমি সুবিচার মনে করি না। চিকিৎসক রোগীকে ঔষধ দেন ব'লে দাম নেন, এটার ভিতরে কোনো অপরাধ নেই, যদি তিনি সরল মনে একথা জানেন যে, এই ঔষধে ঐ রোগ সারার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, যদি তিনি মনে প্রাণে জানেন যে, ঔষধ তৈরীর খরচের সঙ্গে তার জন্য গৃহীত মূল্যের মধ্যে মানুষের সর্ব্বস্ব-শোষণের মত গলাকাটা অত্যাচার কিছু নেই। একজন দারত্যাগী সাধু ব'লেই তিনি পূজনীয় হ'তে পারেন না, যদি দেখা যায় যে, তাঁর আখড়ায় কয়েক কুড়ি নারী এসে অকারণে ভিড় জমিয়ে নিঃস্তব্ধ রজনীকেও সোরগোলে আর হৈ-চৈতে পূর্ণ ক'রে রেখেছেন। একজন গীতা-ভাগবত পাঠ ক'রে শোনান ব'লেই মহাপুরুষ আখ্যা পেতে পারেন না, যদি তাঁর শাস্ত্র-পাঠ-কালে মানুষের অবিশ্রাম নিন্দা ও কুৎসা প্রচার তিনি প্রতিরুদ্ধ ক'রে না চল্‌তে পারেন। পরনারীর সঙ্গ করায় যত খানি পাপ, পরনিন্দায় তার চেয়েও বেশী পাপ হয় ব'লে অনেক মহতেরা যে মনে ক'রে থাকেন, তা' খামাখা নয়। ডাক্তার বা নার্সরা টাকা নেন ব'লেই নিন্দনীয় হ'তে পারেন না, যদি তাঁরা রোগীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে

কোনো ত্রুটি না রাখেন। যত লোক মানুষের ভিতরে শিক্ষাদান করেন, জ্ঞান দান করেন, ধর্ম্মপ্রচার করেন বা রাজনৈতিক কর্ত্তব্য-ব্যাখ্যান করেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন লোকই একান্ত গরীব। অবস্থাপন্ন লোক এঁদের মধ্যে অত্যন্ত অল্প। দুই একটা লোক গ্রহের যোগে ধনীদের নজরে প'ড়ে গিয়ে অবিশ্বাস্য রকমের সম্পদ-রাশি আহরণ ক'রে লোকমধ্যে ইন্দ্র-তুলা ব'লে গণনীয় হ'লেও, এদের সংখ্যা অতীব অল্প। শিক্ষক, পুরুত-ঠাকুর, গুরুদেব, পূজারী-মশায় বা ধর্ম্মপ্রচারক ও রাজনৈতিক প্রচারকদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন লোকও পেট ভ'রে খেতে পায় না। অথচ পেট-মোটা বড় বড় গোঁসাই আর মোহন্তেরা এঁদের নিন্দায়ই হন পঞ্চমুখ। যুক্তি এই যে, এঁরা নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা নিজ নিজ জীবিকাও অর্জ্জন করেন। কাউকে না ঠকিয়ে যদি কেউ জীবিকা অর্জ্জন করে, কারো জীবনোপায় বিধানের চেষ্টার মধ্যে যদি প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যাচার প্রভৃতি না থাকে, কেউ যদি নিজ পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছু অর্জ্জন ক'রে তাই দিয়ে নিজেকে এবং নিজ পরিজনবর্গকে প্রতিপালন কর্ত্তে সমর্থ হন, তবে তাঁর এই চেষ্টাকে আমি প্রশংসা কর্ব্ব। অপরকে কেউ কিছু দক্ষিণা দিলে তুমি ভৃতক পাঠক, ভৃতক পূজক, ভৃতক অধ্যাপক ব'লে চটে ওঠ, কিন্তু তোমাকে প্রচুর অর্থ না দিলে তুমি অভিসম্পাত শুরু কর,—অবস্থাটা অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ।

পরচ্ছিদ্র অন্বেষণ করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি তোমাদিগকে প্রত্যহ এক ঘণ্টা ক'রে ভাগবত বা রামায়ণ ব্যাখ্যা ক'রে শোনাব, কিম্বা গীতা বা মহাভারত পাঠ কর্‌ব, আমাকে ঘণ্টা প্রতি এত টাকা দিতে হবে, এই জাতীয় চুক্তি ক'রে যে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যান, তা' প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মের ব্যবসায় মাত্র, একথা স্বীকার করা যেতে পারে। আমি তোমার মন্দিরের তিনটী বিগ্রহের পূজা করার জন্য এত টাকা প্রতি মাসে নিব এবং বিগ্রহের সংখ্যা বেড়ে গেলে আমাকে অধিকতর-সংখ্যক মুদ্রা দিতে হবে, এরূপ চুক্তির দেবপূজাও প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম-ব্যবসায়েরই আর একটা রূপ। ব্যবসায় জিনিষটা এমনই বহুরূপী যে, মাকালকে অমৃত-ফল আর অমৃতকে বিষ ব'লে ভ্রম সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন নয়। এসব ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিরোধ না ক'রে এই সব ধর্ম্ম-ব্যাপারীদের গ্রাহকদের মধ্যে কাজ করা প্রয়োজন বোধ কল্লে ক'রে দেখ্‌তে পার। কিন্তু তার আগে তোমার নিজের চরকায় তেল দেওয়ার প্রয়োজন অনেক বেশী। সত্যিকারের ধর্ম্মানুভূতি নিয়ে যে ব্যক্তি কথা বল্‌ছেন না, তাঁর সম্পর্কে তুমি বরং উদাসীনতা অবলম্বন কর। অমুকে মূর্খ, তমুকে ঠগ, এই লোকটী মিথ্যাচারী, ঐ লোকটী প্রবঞ্চক, এই ব'লে প্রচার-কার্য্যে নেমে গেলে, তোমার নিজ প্রচার-কার্য্যের মহিমায় তোমার অজ্ঞাতসারে তুমি

অল্পকাল মধ্যে নিজেই একটী মহামূর্খে, ঠগে, জুয়াচোরে পরিণত হ'য়ে যাবে। সুতরাং পরচ্ছিদ্র অন্বেষণের চেষ্টা ক'রো না। ঐ কাজ থেকে প্রাণপণে বিরত থাক।

নিজে প্রেমময় হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অসৎ সঙ্গিগণের মঙ্গলের জন্য পরম বৈষ্ণব তুমি বাক্যাস্ত্রের সদ্ব্যবহার ক'রে ওদের সৎপথে আনয়ন ক'রে ধন্য করবে ব'লে যে মনে কচ্ছ, এই বিচারের মধ্যে দুটী নিদারুণ বিভ্রান্তি রয়েছে। একটী হচ্ছে এই যে, তুমি ইচ্ছা করলেই অন্য-পথাবলম্বী, অন্য-মতাবলম্বী মানুষদিগকে তোমার নৌকায় তুলতে পারবে। আসলে তোমার শক্তি নিতান্তই সীমিত। তবে, ধমক খেলে যাদের প্লীহা চমকিত হয়, তা'দের টেনে আন্‌তে তত কষ্ট নেই। দ্বিতীয় বিভ্রান্তিটী হচ্ছে এই যে, বাক্যাস্ত্র ব্যবহার ক'রে নয়, প্রেমের আকর্ষণেই তুমি নিখিল জগতের যাবতীয় মানুষকে টেনে আন্‌তে পারবে, অন্য উপায়ে নয়। দায়ে প'ড়ে ঢেঁকি অনেকে গিলে সত্য, কিন্তু সেই ঢেঁকি কণ্ঠনালী বেয়ে নীচে আর নামে না। সুযোগ হ'লেই প্রবল বমনোদ্বেগে সেই ঢেঁকি কণ্ঠ থেকে খ'সে প'ড়ে যায়। নিজে প্রেমময় হও। প্রেমকে তোমার স্বভাবে এবং তোমার স্বভাবকে প্রেমে পরিণত কর। তার ফলে যা হবে, তাই হবার মত হবে।

প্রেমানুগত হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৃত্তি হিসাবে তুমি যে পথই গ্রহণ কর, তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। মনের দিক্ দিয়ে তুমি খাঁটি হও। মনের দিক্ দিয়ে তুমি সরল হও। মনের দিক্ দিয়ে তুমি নিরহঙ্কার, নিরভিমান ও অকপট থাক। সরল সত্য আপনা আপনি তোমার হৃদয়কে উদ্‌ভাসিত কর্ব্বে। সংখ্যাধিক্যের গণগড্ডলিকা দ্বারা কখনো প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে না। হাজার উৎপীড়নের চাপেও সত্য কখনো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে না। প্রকৃত সত্যকে নিজ জীবনে উপলব্ধি করার চেষ্টার সাথে যত জনকে পার নিঃস্বার্থ নিষ্কাম মনে প্রয়োজন স্থলে হিতোপদেশ প্রদান কর। একজনকে উপদেশ দেবার সময়ে তাকে ব্যক্তি বা মত-বিশেষের প্রতি বিদ্বিষ্ট করার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই, তাকে সত্যনিষ্ঠ হবার প্রেরণা দিলেই উপদেশ সার্থক। উপদেশ যখন সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধির পীড়নে পড়ে, তখন তা বিকৃত হ'য়ে অমৃতের বদলে গরলের কাজ করে। পরকে উপদেশ দিতেও যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, একথাটী আমাদের প্রতিজনেরই চিন্তা করা উচিত। নিজে সৎ পথে চল্‌লে আর নিজ জীবনে অকৈতব প্রেম আস্বাদিত হ'লে অতি সহজে অপরকে সৎপথে

পরিচালিত করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য আসে। আর, নিজে যদি সৎপথে চলতে চাও; তবে অকপট চিত্তে পরমেশ্বরের চরণে প্রেমানুগত হও।

ফেণী (নোয়াখালী)
২৬শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৪২
(১৩ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

সাময়িক সত্য ও শাশ্বত সত্য

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত বালিঘাই-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাময়িক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতেই এই জগতে কত জনকে কত অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, এমতাবস্থায় শাশ্বত সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার দুঃসাহস লইয়া যদি কেহ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তবে তাঁহাকে যে অশেষ উৎপীড়ন সহিতেই হইবে, এই কথাটীকে বেদবাক্য বলিয়া মনে করিয়া নির্ভীক চিত্তে জীবনের পথ-পর্য্যটন শুরু কর। যদি শাশ্বত সত্যকে জীবনের রসনায় আস্বাদ করিবার সুযোগ পাইয়া থাক, তবে কাহারও কথায় নিজ পথ হইতে টলিও না। তোমার অনুমিত বা উপলব্ধ শাশ্বত সত্য যদি সাময়িক সত্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে হঠাৎ করিয়া সাময়িক সত্যের আবেদনকে নাকচ করিয়া দিও না। কারণ,

অনেক ক্ষেত্রে সাময়িক সত্য, অশাশ্বত সত্য, আপেক্ষিক সত্য চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হইবার পক্ষে সাহায্যকারীও হইয়া থাকে। কথাটী কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে গেলে হয়ত সহজে বুঝিতে কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, শুনা মাত্রই তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া নিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমার এই কথাগুলি সত্যোপেত কিনা তদ্বিষয়ে তোমারও আবার নিজের নিরিখে বিচার করিয়া দেখা উচিত। কোনও সত্যকে অস্বীকার করিবার পূর্ব্বে, তাহার সত্যতা বাস্তব পক্ষে ঠিক কতটুকু, তাহা বিচারের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনকে যাহারা স্বীকার করে, তাহারা হঠাৎ পরিবর্ত্তন-পন্থী হইতে পারে না। তাহারা অতীতের প্রত্যেকটী সংস্কারকেই কুসংস্কার ও স্বার্থান্বেষের সৃষ্টি বলিয়া কথায় কথায় রায় দিতে পারে না। যে-কোনও ব্যক্তিগত রুচি বা সামাজিক সংস্কার সৃষ্টির পশ্চাতে প্রকৃত প্রয়োজনের দাবী কোন্ যুগে কি ছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিবেচনা ব্যতীত তাহাকে সম্যক্ বর্জ্জনীয় বা পূর্ণতঃ গ্রহণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা যাইতে পারে না। ইহাদের সৃষ্টি, পুষ্টি, বিস্তার ও বিনাশ কোনও না কোনও সাময়িক সত্যের আশ্রয়েই সম্ভব হইয়াছিল। সেই সাময়িক সত্যের মধ্যে কতটুকু ছিল, আছে বা থাকিবে, শাশ্বত সত্যের শরণাগত হইয়া এইটুকুই তোমার সযত্নে দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন।"

অপুত্রকের প্রতি

রাজশাহী জেলান্তর্গত বালুভেরী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুত্র বা কন্যা একটীও জন্মে নাই বলিয়া বিগত বিংশ বৎসর যাবৎ দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতেছ। কিন্তু এই ব্যাপারটা যে সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন, এই কথাটী কখনও ভাব নাই। যাহা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই হইবে এবং তাহাকেই মানিয়া নিবার জন্য তোমাকে তৈরী থাকিতে হইবে। কতজন পুত্র পায়, কন্যা পায়, কিন্তু সেই পুত্র, সেই কন্যা পিতামাতার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিয়া অকালে আবার চলিয়াও যায়। দশরথ পুত্র পাইয়াছিলেন, পুত্রশোকও পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভাগ্যবান যে, মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে শোকের সাগর হইতে তুলিয়া লইয়া গেল। কত অকাল-বিয়োগী পুত্রকন্যার শোক বহিয়া বহিয়া কত কত পিতামাতা জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যে পৌঁছিয়াও মৃত্যুমুখ দেখিতে পাইল না বলিয়া অঝোরে কাঁদিতেছে। তাহাদের দুরবস্থার কথাটী একবার চিন্তা কর। কত পিতামাতার পুত্র কুলাঙ্গার হইয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে তুচ্ছ স্বার্থের জন্য অপমান করিয়াছে, তাহাদের পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের শাস্তিটুকুর পরিমাপ করিয়া দেখ। কত পিতামাতার কুলটা কন্যা দুঃশীল জীবনের পথে চলিয়া গিয়া সমগ্র বংশকে লোকচক্ষে হেয় করিয়াছে, তাহাদের পিতামাতার

সান্ত্বনাহীন বেদনার গভীরতা চিন্তা কর। পুত্র বা কন্যা পরমেশ্বর দেন নাই বলিয়া ইহাকে কেবলই দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিও না। কত জন ত' পুত্র পাইয়াছে দুর্ম্মুখ, দুরাচার, দুশ্চরিত্র, মাতাল। তাহারা অহোরাত্র বিধাতার কাছে নিজের মৃত্যু মাগিয়া প্রার্থনা জানাইতেছে। তুমি তাহাদের অপেক্ষা ভাল আছ। যাহারা সন্তন-সংখ্যার আধিক্য-হেতু পুত্র-পালনে অক্ষম, এমন লোকদের কাহারও সুস্থ সুশ্রী একটী ছেলে আনিয়া পালন কর জগৎ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে যদি একটী ছেলেকে এভাবে মানুষ করিতে পার, তাহা হইলে জগতে বিরাট কৃতিত্বের স্বাক্ষর তুমি রাখিয়া যাইতে পারিবে। পুত্র বা কন্যা অনেকেই ত' পালন করে কিন্তু মানুষ করিতে পারে কৈ? মানুষই ত' প্রয়োজন, মানুষের বেশধারী কতকগুলি জানোয়ার দিয়া ত' জগতের কোনও কল্যাণ সাধিত হয় না। অনেকের পুত্রকন্যা হয় না পিতা বা মাতার শুক্রগত বা রজোগত গুরুতর কোনও ত্রুটির জন্য, যাহার সংশোধনের উপায় এখনো বিজ্ঞান-চর্চ্চাকারীরা বাহির করিতে পারেন নাই। সকল চেষ্টা করিয়াও যদি বিফল হইয়া থাক, তবে আজ পুত্রকামনায় অতিরিক্ত অধীর না হইয়া, যে-কাহারও একটী পুত্রকে মানুষের মতন মানুষ গড়িবার ব্রতে আত্মনিয়োজন কর। ছেলেটাও বাঁচিবে বাঁচিবার মতন আর তুমিও হইবে ধন্য।"

সন্তানের জীবনে পিতামাতার আশীর্ব্বাদ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বলাখাল-নিবাসিনী জনৈকা পত্রপ্রেরিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার পুত্রকে আমি ত' আশীর্ব্বাদ করিতেছিই, তুমিও আশীর্ব্বাদ করিও। সন্তানের জীবনে মাতাপিতার আশীর্ব্বাদ এক অমোঘ বস্তু। কেবল আশীর্ব্বাদ কর,—'পুত্র আমার মানুষ হউক'। সে যদি মানুষ হইতে পারে, তবে তাহা কেবল তোমারই লাভ নহে, সমগ্র জগতের লাভ। কেবল নিজের লাভের জন্য সন্তানকে মানুষ করিতে চাহে বলিয়াই ত' অধিকাংশ পিতামাতার সন্তানেরা আর মানুষ হইতে পারে না। অমুক পরিবারের লাভ, অমুক বংশাবলীর লাভ, অমুক গ্রামবাসীর লাভ, অমুক জেলাবাসীদের লাভ বা অমুক দেশবাসীদের লাভের মধ্যে পুত্রের বা কন্যার মনুষ্যত্বকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে বলিয়াই ত' সন্তানের আর প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার পরম শ্লাঘ্য সৌভাগ্য কপালে ঘটিয়া ওঠে না। সন্তান তোমার মানুষ হউক, তোমারও লাভের জন্য, তোমার বংশেরও লাভের জন্য, তোমার জেলারও লাভের জন্য, তোমার দেশেরও লাভের জন্য, সমগ্র জগতেরও লাভের জন্য এবং এই জগতের ন্যায় অন্য যত কোটি জগৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে রহিয়াছে, সকলের সকল

অধিবাসীর লাভের জন্য। সন্তান তোমার মানুষ হউক, শ্লাঘ্য অতীতকে নূতন করিয়া বর্ত্তমানের মধ্যে গৌরবে উজ্জ্বল ও জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য, আর ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতার ও জাগ্রততর করিবার জন্য। তোমার সন্তান একটি সসীম মানবশিশু কিন্তু তাহার জীবন-মহিমা ও কর্ম্মগরিমা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানকে নবীনতর তাৎপর্য্য এবং অভিনবতর ব্যঞ্জনা প্রদান করিয়া চিরস্মরণীয় হউক,—ইহাই হওয়া চাই তোমার অন্তরের অভিরুচি ও প্রাণের অভিপ্রেয়। এই ভাবটুকু নিয়া যদি সন্তানকে অবিরাম অবিশ্রাম আশীর্ব্বাদ করিতে থাক, তবে কি তাহা ব্যর্থ হইতে পারে মা?"

গুরুর অবমাননাকারী ও কর্ম্মী-গুরু

ফরিদপুর জেলান্তর্গত বালিয়াকান্দি-নিবাসী জনৈক পত্রপেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গুরুভক্তির যে কত রকমের বিচিত্রতা আছে, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। কেহ গুরুকে ভক্তি করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূরণের জন্য অবহেলা নিজের প্রাণ দেয়, কেহ বা গুরুর নামে লটারির টিকিট কিনিবার পরে চিঠি-খোলার দিন লক্ষ টাকার প্রথম পুরস্কারটী পাইল না বলিয়া রাগে, দুঃখে, অভিমানে গুরুদেবের প্রতিচিত্রখানা ছুঁড়িয়া তখন শক্ত ডাণ্ডা

হাতে করিয়া আনিয়া পিটাইয়া তাহা রাস্তার উপরে শত খণ্ডে চূর্ণিত ক'রে আর গর্জ্জন ক'রে বলে যে, এমন লোককে গুরু বলিয়া জ্ঞান করা পাপ, এমন লোককে গুরু সম্মান দিতে বিবেক দেয় বাধা। বাহ্যতঃ দেখিতে মনে হইবে, ইহা নিদারুণ গুরুদ্রোহ কিন্তু আসলে ইহা সেই প্রকারের গুরুভক্তি, যেরূপ ভক্তিবশতঃ কুক্কুর তুলসী বৃক্ষ দেখিলেই ঠ্যাং উচাইয়া তাহাতে মূত্রত্যাগ করে কিন্তু সম-উচ্চতা-সম্পন্ন অন্য গাছ দেখিলেও সেদিকে দৃক্‌পাত করে না। একদল লোক আছে, যাহারা দীক্ষা গ্রহণই করে শুধু গুরুকে অপমান করিবার জন্য। বিধাতার ইহারা এক বিচিত্র সৃষ্টি কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি বলিয়াই জ্ঞানী ও প্রেমী গুরুদেবেরা এমন লোকদিগকে ক্ষমা করেন এবং ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদও করেন। কিন্তু কর্ম্মী-গুরুর পক্ষে এমন শিষ্যদের প্রশ্রয় দেওয়া অবান্তর ব্যাপার। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পাপী ও পুণ্যবান্ উভয়ে সমান, প্রেমিকের দৃষ্টিতে উচ্চ ও নীচ উভয়ে সমান কিন্তু কর্ম্মীর দৃষ্টিতে সেই মাত্র স্নেহপাত্র, যাহার যাবতীয় আচরণ জগদ্বাসী কোটি কোটি নরনারীর জীবনে মধুরতা-সঞ্চারণে কর্ম্মে সাহায্য ও সহায়তা। তাই কর্ম্মী গুরুদেবেরা এমন শিষ্যদিগকে ক্ষমা করেন কিন্তু নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেন না।"

আমার অলৌকিক ক্ষমতা নাই

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত রাঙ্গুনিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা বলিবে, অন্ধকে চক্ষুষ্মান কর, বোবাকে দিয়া কথা কহাও, পঙ্গুকে হাটাও, তবে আমরা বিশ্বাস করিব যে, তুমি সত্যই সাধুপুরুষ, সত্যই মহাপুরুষ। কোনও কোনও মহাপুরুষ এসব করিতে পারেন কিন্তু আমি পারি না। আমি একটী সাধারণ মানুষ মাত্র, আমার ভিতরে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। আমি ত' বারংবারই তোমাদের বলিতেছি যে, আমাকে একটী সাধারণ সৎলোক ভাবিয়া তোমরা আমার সন্নিহিত হইতে পার, আমাকে অমানবিক অসাধারণ অলৌকিকত্বের আধার বলিয়া কল্পনা করিয়া নিজেকে নিজে ঠকাইও না। জগতে একটী প্রাণীকেও যে ঠকাইবার আমার ইচ্ছা নাই, মাত্র এইটুকু প্রতিশ্রুতিই আমি তোমাদের দিতে পারি। আমি স্বপ্নে দীক্ষা দিতে পারি, সূক্ষ্মশরীরে আকাশ-মার্গে বিচরণ করিয়া তোমাদের গৃহে গিয়া অমাবস্যার ঘোরা রজনীতে দশ দিক্ জ্যোতির্ম্মালায় উছলিত করিয়া দিয়া জড় দেহেই তোমাদিগকে দর্শন, স্পর্শন, আলিঙ্গনাদি দিতে পারি, মরা মানুষ বাঁচাইতে পারি, ইত্যাদি অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা করিবার আমার সামর্থ্য, রুচি বা অভ্যাস নাই। যীশুখ্রীষ্ট একজন মরা মানুষকে জীবিতের জগতে ফিরাইয়া

আনিয়াছিলেন, কিন্তু দশজন বিশ জনকে তাহা করেন নাই। ইহা হইতে এই ইঙ্গিতটী পাইবে যে, মরাকে বাঁচাইয়া দেওয়াটা তাঁহার মত মহামানবের মুখ্য কর্ম্ম নহে। শঙ্করাচার্য্য একটী রাজার শবদেহকে নিজ প্রাণশক্তির সঞ্চারণে জীবন্ত করিয়া তৎপত্নীদের ও তৎপ্রজাবর্গের সহিত কিছু দিনের জন্য মিলাইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু এই রাজ-শরীর অনন্ত দীর্ঘকাল বা অতি দীর্ঘকাল জীবন্ত থাকে নাই। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, মরাকে বাঁচাইয়া রাখাই আচার্য্য শঙ্করের দৃষ্টিতে একটী মুখ্য কর্ম্ম নহে। জীবন্তকে সার্থকতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়া মরণ-ভয়-রহিত করাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধক-বরেণ্য পুরুষদের অভিপ্রায়। অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা করিবার তাঁদের মতলব থাকিলে শত শত ঘটনা তাঁহারা ঘটাইতেন এবং কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে যত মড়া পুড়াইবার জন্য লোকে নিয়া যাইত, ত্রৈলঙ্গ স্বামী মহারাজ নিশ্চয়ই মড়ার খাটুলি হইতে নামাইয়া নিয়া তাহাদের প্রতিজনকে সুস্থ সবল দেহে যার যার ঘরে ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়া কান্নার রোলের মধ্যে হাসির ঝঙ্কা ও খুশীর বন্যা বহাইয়া দিতে কৃপণতা করিতেন না। আমাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন অসাধারণ পুরুষ ভাবিয়া তোমরা কেহ আমার কাছে আসিও না। কেননা, তোমাদের প্রতিটি দুঃখ আর প্রতিটি বেদনার প্রতীকার করিবার ক্ষমতা একমাত্র পরমেশ্বরেরই আছে, আমার নাই। আমার কাছে কেবল আমার সদিচ্ছা এবং স্বার্থগন্ধহীন আশীর্ব্বাদই তোমরা

কামনা করিও। তোমাদের যাহাকে যাহা দিবার, তাহা আমি ত' না চাহিতেই নিজের গরজে দিয়া থাকি এবং চিরকাল দিয়া যাইব। অলৌকিক কিছু পাইবে ভাবিয়া যাহারা আমার মতন সাধারণ মানুষগুলিকে গুরু করে, তাহারা যখন দেখিতে পায় যে, গুরু তাঁহার কোনও অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা পথভ্রষ্ট দুর্নীতি-পরায়ণ পরদারলোলুপ স্বামীকে স্ত্রীর কাছে ফিরাইয়া দিলেন না, তখন এই গুরুকে গুরু বলিয়া মনে করিতে পাপ হইতেছে বলিয়া শিষ্যা মনে করে। তখন এই স্ত্রীটির মনে সংশয় জাগে যে, গুরুদেবই কৌশল করিয়া বাণ চালাইয়া তাহার স্বামীকে ভ্রষ্টা কুলটার ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন না ত'? হয়ত গুরুদেবেরই ঐশী শক্তি গুরুদেবের অন্যান্য চেলাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে তাহাদের গুরুভাইকে বিপথে চালাইয়া নিতে। যেই গুরুদেব নিজের ঐশী শক্তির দ্বারা শিষ্যের দুর্মতি হরণ করিতে পারিলেন না, সেই গুরুদেবই ঐশী শক্তির দ্বারা মহিলাটির স্বামীকে বিপথে পরিচালিত করিবার জন্য স্বামীর গুরুভাইদের মধ্য হইতে মদ্যপায়ী, পরনারীরত, দুশ্চরিত্র ব্যক্তি বাছিয়া বাছিয়া তাহার স্বামীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিলেন। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ইহা এক বিচিত্র মায়া-খেলা। অলৌকিকে বিশ্বাসীরা ম্যাজিক চাহে, লজিক বোঝে না। যাহারা একটুখানি যাদু বা ভোজবাজি জানেন, তাঁহাদের পক্ষে এমন শিষ্যকুল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ধন-

সম্পদের চেয়েও অধিকতর নির্ভরযোগ্য বস্তু। কিন্তু আমি এসব জানি না। আমি সরল চিত্তে বলিতেছি যে, আমি তোমাদের দশ জনের মতন একটী সাধারণ মানুষ। আমাকে সাধারণ মানুষ জানিয়াই তোমরা আমার কাছে আসিও, আমার সহিত সম্ভাষণ করিও, আমার সঙ্গে বিচরণ করিও। আমার সঙ্গ করিলে তুমি অনাড়ম্বর জীবন যাপনের প্রেরণা পাইতে পার, সমগ্র মানব-সমাজকে নিজের আপন হইতে আপনতর করিবার জন্য প্রেরণা পাইতে পার, অক্লান্ত পরিশ্রমে সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে দীর্ঘকাল অধ্যবসায় চালাইবার জন্য এক প্রবল রুচি লাভ করিতে পার কিন্তু অলৌকিক ঘটনা ঘটাইবার মত কোনও দৈবী সম্পদ হয়ত সারা জীবনেও লাভ করিতে পারিবে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির কর যে, আমাকে তোমাদের চাই কিনা।"

উন্মার্গগামী স্বামী সম্পর্কে

একজন প্রশ্ন করিল,—স্বামী যদি বিপথগামী হয়, তা' হ'লে স্ত্রীর পক্ষে কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামীকে সৎপথে আনয়নের চেষ্টা করাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। স্বামী বিপথে গেলে অনেক বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক সে বিষয় জেনেও না জানার ভাণ করে এবং নিজেকে নানা ভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়তরা করবার জন্য

চেষ্টা করে। সাধারণ দৃষ্টিতে এই উপায় খুবই ভাল। কি করলে স্ত্রী তার স্বামীর কাছে অধিকতর লোভনীয় হবে, এটা সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করে স্বামীর মনের গঠনের উপরে। সুতরাং যে নারী স্বামীর মনকে জানে না, জানে না স্বামীর রুচি এবং প্রকৃতি, তার পক্ষে এভাবে স্বামীকে জয় করা এক কঠিন ব্যাপার। স্বামী যদি অন্যা নারীতে আকৃষ্ট হয় রূপের দরুণ, তবে স্ত্রীদের পক্ষে সমস্যাটী নিদারুণ। কারণ, নিজের রূপ নিজের ইচ্ছায় বাড়ানো যায় না, নানা-রূপ প্রসাধনের দ্বারা একটু রূপচর্য্যা মাত্র করা যায়। কিন্তু স্ত্রীর আসল রূপটী তার স্বভাবের মধ্যে বিরাজিত, যার আকর্ষণে সে অধিকাংশ সময়েই স্বামীকে নিজের দিকে টেনে আনতে পারে। পুরুষ-চরিত্র সাধারণতঃই প্রগল্‌ভ, বহুমুখগামী এবং স্বার্থপরায়ণ হ'লে স্ত্রীকে অনেক ক্ষেত্রে সারাটি জীবন কেবল কেঁদেই কাল কাটাতে হয়। তবু ধৈর্য্যের বাঁধকে ভাঙ্গতে না দিয়ে স্ত্রীর প্রয়োজন পর্ব্বতের মতন স্থিরতা ও দৃঢ়তা নিয়ে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কেবল প্রতীক্ষা ক'রে যাওয়া। মহতের কৃপায় কখনো কখনো উন্মার্গগামী স্বামীর মতি-পরিবর্ত্তন ঘটে, এরূপ ঘটনা অনেক সময় ঘটে কিন্তু পরিবর্ত্তিত-চরিত্র স্বামীটি এসে স্ত্রীটীর মধ্যে যদি একটী নূতন মানুষকে না পায়, তাহ'লে সে যে আবার দেখতে না দেখতে চরিত্রহীনদের মিছিলে ভিড়ে যাবে না, তার নিশ্চয়তা

নেই। দুঃখের পসরা যার দোষেই এসে ঘাড়ের উপরে চেপে থাকুক, স্ত্রীকে সর্ব্বাবস্থাতেই প্রতীক্ষার শক্তিতে শক্তিমতী হ'তে হবে এবং চিন্তার জগতে এমন ভাবে বিচরণ কত্তে হবে যেন প্রতিটি মুহূর্ত্তে সে বিশ্বরহস্যের একটি নিত্যনবায়মান সমাধান তার অন্তরে খুঁজে পায়। অন্তরের ঐশ্বর্য্যে সে যদি হয় ধনবতী, তাহ'লে স্বামী শত পূজ্য হ'লেও একদা এককণা অনুগ্রহের প্রার্থী হ'য়ে ভিক্ষাপাত্র হস্তে অন্নপূর্ণার দ্বারদেশে এসে দাঁড়াবে।

উন্মার্গগামী স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উন্মার্গগামিনী স্ত্রী সম্পর্কে স্বামীর কর্ত্তব্য অংশত পূর্ব্বকথানানুযায়ীই হবে, জেনো, তবে, স্বামীর স্নেহ, আদর, ভালবাসার অকৃত্রিমতা সত্ত্বেও স্ত্রী যদি বিপথগামিনী হয়, তবে জান্‌তে হবে যে, এরূপ ঘটানা জগতে অতি অল্পই ঘ'টে থাকে। পুরুষদিগকে বিপথগামী করার জন্য প্রধানতঃ পুরুষ বন্ধুরাই আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে থাকে। চায়ের আড্ডা থেকে মদের আড্ডায়, মদের আড্ডা থেকে পতিতাপল্লীতে পুরুষকে পুরুষ-বন্ধুরাই ডেকে নিয়ে যায় বা ধ'রে নিয়ে যায়। পুরুষরা আবার এতে অতি সহজে রাজিও হ'য়ে যায়। কে

কয়টা নারীর সংসর্গ করেছে, একথা নিয়ে পুরুষ-বন্ধুদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতাও দেখা যায়। বিয়ের আগে গোটা কয়েক নারীর সংসর্গ না ক'রে এলে ত' বিয়ে-করা বৌয়ের কাছে একেবারে বোকা ব'নে যাবি, এসব কথা ব'লে ভিতু ও অনিচ্ছুক পুরুষগুলিকে ত' পুরুষ-বন্ধুরাই পাপের দরবারে নিয়ে হাজির করে। পুরুষের বহু অপরাধ জানা সত্ত্বেও সমাজের লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চখ বুজে থাকে ব'লে পুরুষ-লম্পটদের আচরণে বেপরোয়া ভাবটার প্রাবল্য অধিক। নারীদের সম্পর্কে সে কথা খাটে না। ভোগ-সুখের জীবনে তারাই সমাজের প্রধান উপকরণ কিন্তু তাদের উপরে সমাজের শাসন, সংস্কারের পীড়ন ও সতর্কতার বোঝা সব চেয়ে বেশী। এই কারণেই তাদের মধ্যে স্খলনও কম। কিন্তু একথাও সত্য যে, অধিকাংশ নারীই অধিকাংশ পুরুষের চেয়ে যৌন-পিপাসার দিক থেকে অনেকটা সম্বৃত ও সুস্থ। পুরুষের মন যখন বহুগামী, নারীর মন তখন অধিকাংশ স্থলেই একমুখী। তার মন প্রধানতঃ একমুখী বলেই সতীত্ব রক্ষা সম্পর্কে একটা বদ্ধমূল ধারণা কোনও না কোনও ছন্দে পৃথিবীর সব দেশের সকল সমাজের নারীর ভিতরে রয়েছেই রয়েছে। এমতাবস্থায় নারী যদি উন্মার্গগামিনী হ'তে চলে, স্বামীর কর্ত্তব্য হচ্ছে সাধ্যমত ক্ষমা দিয়ে তাকে সংশোধন ক'রে নেওয়া। স্বামীর ক্ষমা, অকপট ক্ষমা, উদার এবং

প্রতিশোধবুদ্ধিহীন ক্ষমা স্ত্রীর জীবনে যুগান্তর আনয়নে সহায়তা কর্ব্বে, এটা সত্য কথা।

আদর্শ সমাজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কটা এত ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় যে, তার মাঝখানে অন্য কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষের অনুপ্রবেশ ঘট্‌লে কেউ তা সহ্য কত্তে পারে না। প্রতিশোধ-স্পৃহা এভাব থেকেই আসে এবং পৃথিবীতে এই রকমের প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে কত রকমের পাপ আর কত ঢংয়ের হত্যাকাণ্ডের যে জন্ম হয়েছে, তা' বলা যায় না। একজনের রিরংসা অন্য জনের জিঘাংসার সৃষ্টি করেছে। এমন কি পশুপক্ষী প্রভৃতির মধ্যেও এই ব্যাপারে ঈর্ষ্যা-কাতরতা প্রবল। সুতরাং এরূপ অবস্থায় মনুষ্য-সমাজে নিদারুণ বিশৃঙ্খল ও অশান্তি দেখা দেবে জেনেই ত' আমাদের পূর্ব্বগণ এক পুরুষের এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক পুরুষ ব্যবস্থা করবার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হ'য়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের অভিপ্রায় পূর্ণ হয় নি। একথা সত্য কিন্তু সেই অভিপ্রায়কে পূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যই নারী-মাত্রেরই সতীত্ব-স্নান এবং পুরুষ-মাত্রেরই একপরায়ণ গৃহি-জীবন আদর্শস্থানীয় আমাদের প্রত্যেককে আলোপ্য বিশ্বাস পোষণ কত্তে হবে যে, একদা জগতে আদর্শ গৃহি-জীবনের

প্রতিষ্ঠা হবেই হবে এবং সেই অবস্থাটির সৃষ্টির অনুকূলে আমাদের প্রতিজনের চিন্তা-চেষ্টা পরিচালন কত্তে হবে।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি ফেণী ত্যাগ করিলেন এবং সন্ধ্যা ৭ টা ৪ মিনিটে সোনাইমুড়ি ষ্টেশানে পৌঁছিলেন।

শিবপুর (নোয়াখালী)

২৭শে আশ্বিন, সোমবার, ১৩৪২

(১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদারের গৃহে আসিয়াছেন। পতি উপেন্দ্র এবং পত্নী ঊর্ম্মিলা দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোরা আমাকে দেখে পুণ্য অর্জ্জন করলি, একথা যদি সত্য হয়, তবে একথাও জান্‌বি যে, আমি তোদের দেখে তীর্থ-দর্শন কর্‌লাম।

দম্পতী কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—বলেন কি বাবামণি, বলেন কি! আমরা নগণ্য কীট, আমরা আপনার অধম সন্তান।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য যখন বিনয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর বিনয় যখন ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন চরিত্রের মণি-কাঞ্চন-সংযোগ হয়। যেখানে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, সেখানে, বিশ্বের শান্তি বিরাজ করে আর

যেখানে তারা পরস্পর পরস্পরকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত সাধনে উৎসাহিত করে, সহায়তা করে, একে অপরের সাধনার অনুপূরণ করে, একে অপরের ভাব-গভীরতার পরিপূরণ করে, সেখানে ত্রিশ কোটি দেবতা তাদের চরণ-তলে বাস ক'রে নিজেদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। ব্রহ্মচর্য্যের আমি পূজারী। ব্রহ্মচর্য্যের সাধক-সাধিকাকে আমি কোটি কোটি দেবদেবীর চেয়েও বড় মনে করি। ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি নিষ্ঠাশীল মানুষকে আমি পূজার্হ ব'লে জ্ঞান করি। ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে আসছ অথচ তার গুহ্য সংবাদটুকু ঘুণাক্ষরেও যে বাহিরে প্রকাশ কর নাই, এখানেই তোমাদের সফলতার চাবিকাটিটি রয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সত্যোপলব্ধির ভাণ্ডার কাণায় কাণায় পূর্ণ হোক্।

ভিন্ন মতের প্রতি কি কর্ত্তব্য

দীক্ষার কর্ম্মসূচী ছিল। চারিদিককার আট দশটী পল্লী হইতে বিবাহিত, অবিবাহিত, কিশোর, প্রৌঢ় জনা চল্লিশ নরনারী আসিয়া দীক্ষা নিলেন। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজ সাধনে একাগ্র ভাবে নিমগ্ন থাক্‌বে। অন্য-পন্থাবলম্বীদের কারো নিষ্ঠাভঙ্গ করবে না। ভিন্ন-সম্প্রদায় ভুক্ত সাধকদের সাধন-পন্থা তোমাদের পন্থার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, এই বিষয়ে কারো সঙ্গে কোনো তর্কাতর্কিতে নামবে না। অন্য সম্প্রদায়ের দীক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধি

ঘট্‌ছে দেখলে ঈর্ষ্যান্বিত হবে না। তবে, নিজের সাধন নিজে আপ্রাণ যত্নে ক'রে যাবার জন্য বিশেষ ভাবে প্রতিজ্ঞারূঢ় হবে। কারণ, হুজুগে যাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তাদের সাধারণ ও স্বাভাবিক ধর্ম্মই হচ্ছে এই যে, গড্ডলিকা-প্রবাহের ভিড় জমাইবার চেষ্টা করা চাই এবং মিথ্যা প্রচারের দ্বারা, অবাস্তব যুক্তির দ্বারা, অলীক কাহিনীর বর্ণনার দ্বারা এবং ছলে, বলে ও কৌশলে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা-মুখে অন্যান্য সাধন-মার্গীদের মনে নিজ নিজ প্রাপ্ত সাধনের প্রতি দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, অবিশ্বাস ও অসম্ভ্রম সৃষ্টি করা চাই। চারিদিকে যদি হুজুগে প্রচারিত ধর্ম্মমতের বিস্তার ঘটতে থাকে, তা'হলে নানা কুযুক্তি, নানা কুতর্ক তোমার মনের নিষ্ঠাকে টলালেও টলাতে পারে। কিন্তু ঐটি তুমি হ'তে দেবে না। অন্য মতাবলম্বীদের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে তোমাদের দুশ্চিন্তার বা বিরোধ কর্ব্বার প্রয়োজন কণামাত্রও নেই। কিন্তু জনমতের প্রবল বন্যায় তোমার ছোট্ট কুটীরখানি না অকূলে ভেসে চ'লে যায়, এজন্য তোমার সাধনের খুঁটিগুলি শক্ত ক'রে পুততে হবে।

গুরুকৃপা

অপরাহ্নে বহু ভক্ত ব্যক্তির সমাগম হইল। এই অঞ্চলটাতে হরিদ্বারের মহাপুরুষ পরমহংস স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের ভক্ত ও শিষ্যদের সংখ্যা অত্যধিক। নিকটবর্ত্তী

এমন গ্রাম নাই, যেখানে হইতে দুই পাঁচ জন করিয়া ভক্তিমান্ পুরুষ বা নারী না আসিলেন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বলিলেন,—বাবামণি, আপনি দয়া ক'রে এই বাড়ীতে পদধূলি দিয়েছিলেন ব'লেই এত ভক্ত লোকের এখানে সমাগম হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—না রে না। তোরা দুই জনে তপস্বী মহাদেব আর তপস্বিনী পার্ব্বতীর ন্যায় পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ ক'রে এখানে বাস কচ্ছিস ব'লেই এত সব ভাগ্যবান্, বৈরাগ্যবান্, প্রেমিক মানুষেরা এখানে এলেন। মৃগনাভি সুক্কায়িত থাক্‌লেও তার সুগন্ধ আপনা আপনি চৌদিকে ছড়ায়।

দম্পতী শ্রীশ্রীবাবামণির পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—হে প্রভো, হে গুরো, তোমার কৃপাবলেই সব হয়, আমাদের নিজেদের শক্তি কিছুই নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক কথা। গুরুকৃপাতে যার বিশ্বাস আছে, তার আবার পতনের ভয় কোথায়? ব্রহ্মচর্য্য পালনকারীর পতন ত' হয় তার অহঙ্কার থেকে। গুরুকৃপাতে বিশ্বাস অহঙ্কারের মোক্ষম দাওয়াই। তবে আমি নূতন যুগের গুরু ব'লে আমাতে আত্মসমর্পণ কত্তে আমি কাউকে প্রেরণা দেই না। যতক্ষণ আমি একটা রক্তমাংসের মানুষ, ততক্ষণ আমাতে আত্মসমর্পণের কোনো মানেই হয় না। যখন আমি দেহাতীত, লিঙ্গাতীত, চৈতন্যময় সত্তার সঙ্গে অভেদ, গুরুকৃপা

যদি পেতে হয়, তবে তখন তা পাবে। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, তখন আমি যেমন পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ, তোমরাও তেমন আমার সঙ্গে অভেদ। এগুলি উপলব্ধির কথা, যুক্তিতর্কের কথা নয়।

সবই এক, একই সব

শ্রীশ্রীভোলাগিরি মহারাজের শিষ্য ভক্তগণ শ্রীশ্রীবাবামণিকে আরতি করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ওজর আপত্তিতে গ্রাহ্যমাত্রও না করিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীবাবামণির আরতি শুরু করিয়া দিলেন এবং সমবেত কণ্ঠে শিব-মহিম্ন স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আরতি শেষ হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাবা হে, তোমরা যিনি, আমিও তিনি। একেরই দিকে দিকে বহুবিধ প্রকাশ। কেউ ভিন্ন নয়, কেউ বিচ্ছিন্ন নয়, সবাই এক, একই সব।

ভক্তি লাভের উপায়

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভক্তি লাভের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভক্তগণের পবিত্র চরিত্র অনুধাবন কর্ব্বার চেষ্টা কর্ল্লে আপনা আপনি ভক্তি লাভ হয়। প্রকৃত ভক্তের সঙ্গলাভ হ'লেও হৃদয়-গগনে ভক্তির উদয় হয়। যে যার ধ্যান করে, যে যার সঙ্গ করে, সে তার

মত হ'য়ে যায়। বীরের ধ্যান আর বীরের সঙ্গ কর্‌লে কাপুরুষও বীরে পরিণত হয়। দুষ্ট-দুর্ব্বৃত্তের চরিত্র-চিন্তন কর্ল্লে আর তার সঙ্গ কর্ল্লে সৎ ও সাধু-প্রকৃতির মানুষও দুষ্টে এবং দুর্ব্বৃত্তে পরিণত হয়।

ভক্ত চিনিবার উপায়

প্রশ্ন হইল ভক্ত চিনিবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁর দর্শন মাত্র মন ভগবন্মুখী হয়, তিনি নিশ্চয়ই ভক্ত। যাঁর বচনামৃত পান কর্ল্লে মনে ঈশ্বরমুখতা জন্মে, তাঁকেও ভক্ত ব'লে জ্ঞান করা যেতে পারে। কিন্তু যাঁর স্মরণ মাত্র মনঃপ্রাণ ভগবদ্‌ভক্তিতে আপ্লুত হ'য়ে ওঠে, তিনি প্রকৃত ভক্ত। জগতে প্রকৃত ভক্ত সত্যই দুর্লভ কিন্তু লক্ষ এবং কোটির মধ্যেও যে একজন দুজন প্রকৃত ভক্ত আছেন, আমাদের মত জীবের পক্ষে সেইটেই এক পরম আশ্বাসের কথা।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—ভক্তি নাকি মানুষকে হীন কাপুরুষ করে? জ্ঞানই নাকি মানুষকে বিগর্ভী ক'রে তোলে? ভক্তি বড়, না জ্ঞান বড়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক হিসাবে কর্ম্মই বড়,

কেননা ভক্তির উপাচায়ক কর্ম্মের দ্বারা ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানের উপাচায়ক কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। কর্ম্মহীনের জ্ঞানও হয় না, ভক্তিও হয় না। অবিরাম নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা কর্ত্তে কর্ত্তে যখন কারো ভক্তির চূড়ান্ত অবস্থায় উত্তরণ ঘটে, তখন তিনি দেখে অবাক্ হন যে, তিনি জ্ঞানের তুঙ্গতম শৃঙ্গেই বসে আছেন। নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা কর্ত্তে কর্ত্তে যখন কারো জ্ঞান-মার্গের শেষ সীমানায় উদ্বর্ত্তন ঘটে, তখন তিনি দেখতে পান যে, শুদ্ধা ভক্তি যে তাঁর সহজাত সম্পদ। জ্ঞানে আর ভক্তিতে আপাততঃ একটুখানি বিরোধের ভূমিকা ত' শুধু যাত্রার শুরুতে, যাত্রাশেষে সব একাকার।

ভক্তিধর্ম্ম ও অদৃষ্টবাদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ফোঁটা, তিলক, কণ্ঠী ও মালা কারো কারো ভক্তি-পথ-যাত্রার সহায়ক হ'তে পারে। সুতরাং এই সকল উপায়নে অনুরক্ত ব্যক্তিদের প্রতি বিরোধ-বাক্য উচ্চারণ ক'রে কোনো লাভ নাই। নিজ সাধন-পথে অগ্রসর হবার জন্য যাঁর যেটি দরকার, সে সেইটী ধরবেই কিন্তু তাঁর আসল লক্ষ্য হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া, একটা স্থানে থমকে থাকা নয়, একটা স্থানে আটকে যাওয়া নয়। আমরা অনেক সময়ে ভক্তির ভাণ করি কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস করি না। তাঁকে বিশ্বাস করি না ব'লেই আমরা নিজেদের ধর্ম্ম এবং নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজন হ'লে অবহেলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণের

মূল্য বাড়িয়ে নিতে পারি না। এই সকল দৃষ্টান্ত সত্যই দর্শকমাত্রেরই চোখে বড় বেদনাদায়ক ঠেকে। তাই তাঁরা গাল দিয়ে মন্তব্য করেন যে, ভক্তিধর্ম্ম দেশবাসীকে কাপুরুষের পালে পরিণত করেছে। এই কথাটার প্রতিবাদ কত্তে পারি, এমন দৃষ্টান্ত এখনো আমরা দেখাতে পারি না। যীশুর ভক্ত ইংরেজ, জার্ম্মাণ, ফরাসীরা বিপদের দিনে কেবল পরমেশ্বরের অপার করুণার উপরেই নির্ভর করে না, ভগবদ্দত্ত বাহুকে বল-প্রবুদ্ধ ক'রে নিয়ে সহযোগের শক্তিতে তাকে দুর্ব্বার ক'রে তোলে আর তারই প্রভাবে প্রত্যাসন্ন মহা-ঝঞ্ঝার প্রবল বাত্যা-বেগকে প্রতিরোধ করার অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করে। আমাদের ভক্তিধর্ম্ম যদি আমাদিগকে ঈশ্বর-নিষ্ঠ না ক'রে অদৃষ্ট-নির্ভর ক'রে থাকে, তবে ত' লোকে আমাদের ভক্তিকে আর ভক্তিবাদকে নিন্দা কর্ব্বেই, ঠেকাব কি দিয়ে?

পরমতে সহিষ্ণুতা এবং স্বদেশ-চেতনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের জ্ঞানমার্গ আমাদিগকে সোঽহং, শিবোঽহং বলতে সাহস দেয় এবং তার মধ্য দিয়ে অকৃত্রিম শান্তিরও আস্বাদ বিতরণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের পথবিচরণকারী মহতেরও একটী পোষণীয় এবং রক্ষণীয় জড় শরীর আছে যার অস্তিত্ব সুচারু-রূপে রক্ষিত না

হ'লে সে উচ্চচিন্তার বা উচ্চ-চর্চ্চার আধার-রূপে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন কত্তে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ ব্যক্তির বা ধর্ম্মসঙ্ঘের আধ্যাত্মিক চর্চ্চার পিছনে দেশের বা রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার বিশেষ যেগোযোগের প্রয়োজন আছে। তত্ত্বের হিসাবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' সত্য হ'লেও চর্য্যার হিসাবে সে একান্তই পরনির্ভরশীল ও পরপিণ্ডোপজীবী। জ্ঞানপন্থীদের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে সাহসের যথেষ্ট পরিচয় থাকা সত্ত্বেও এক মুঠা অন্নের জন্য যদি তাঁরা গৃহস্থদেরই মুখাপেক্ষী হন, তবে চিন্তার দুঃসাহসের সঙ্গে তাঁদের অস্তিত্বের দুঃসাহস কি ক'রে বজায় থাকে? ফলে, ধর্ম্মচিন্তার জগতে বিপ্লব আনয়নের চেষ্টায় অতিরিক্ত অধ্যবসায়ে তাঁরা লিপ্ত হ'তে পারেন নি। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দ এই কাজটী করেছেন। তাঁরই প্রেরণায় বেদান্ত-চিন্তকেরা অনেকে স্বদেশের শ্রীমুখ দর্শন করেছেন এবং স্বদেশের চরণে আত্মবিসর্জ্জনের মহাব্রত গ্রহণও করেছেন। জ্ঞানমার্গীরা সাহসী, এই কথাটী বলবার অবকাশ এই ভেবেই এসেছে। কিন্তু কোনো কোনো ভক্তিপন্থীরা ব'লে যাচ্ছেন যে, মায়িক জগতের মায়িক কর্ত্তব্যের প্রতি মনোনিবেশ ভক্তি-ধর্ম্মের বিরোধী, সুতরাং দরিদ্র-নারায়ণের সেবা বা দেশ-জননীর পূজা সবই ধর্ম্মধ্বজিতা এবং লোকপ্রবঞ্চনা মাত্র। এই কুকথাগুলি লোককে শুনাবার জন্য কত স্থানে বিরাট আড়ম্বর ক'রে বড় বড় সভা-সমিতির

অনুষ্ঠান হচ্ছে, আবার দলে দলে শ্রোতা এসব শুনে মনে মনে দেশের সব চেয়ে প্রিয় কর্ম্মবীর সম্পর্কে অতীব নিকৃষ্ট ধারণা নিয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরছে। মতবাদের পার্থক্য যখন এভাবে পরনিন্দন ও সৎকর্ম্ম-গর্হণে রূপায়িত হচ্ছে, তখন জ্ঞান বড়, না ভক্তি বড়, এই প্রশ্ন না ক'রে, জ্ঞান আর ভক্তি এই উভয়ের চেয়ে কোন্‌টা বড়, এই প্রশ্নই তোমাদের করা উচিত। আমার মতে পরমতসহিষ্ণুতাই বড়, জ্ঞানের অহঙ্কারের চেয়ে বড়, ভক্তির বড়াইয়ের চেয়ে বড়। পরমতে সহিষ্ণুতার এমন একটা সুনির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, যে পর্য্যন্ত অন্যকে নিজের মত অবাধে সর্ব্বত্র বিনা প্রতিবাদে প্রচার করার স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে। সুজনতার এমন একটা সর্ব্বসম্মত ভদ্রতার সীমা আছে, যে পর্য্যন্ত অন্য লোকের প্রচারিতব্য অভিমত সম্পর্কে নীরবে থাকা সঙ্গত। ধর্ম্মপ্রচারকেরা যখন শালীনতা বিসর্জ্জন দেন, অপরের দ্বারা নিজ নিজ মত প্রচারের স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং নিজের মতের মহিমা কীর্ত্তনের ছলে প্রকৃত প্রস্তাবে অন্যমত-প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটাবার চেষ্টা করেন, তখন বুঝতে হবে যে, ইনি প্রচার-কর্ম্মের পবিত্র অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং এঁর বক্তব্য শোনার জন্য সভাস্থলে আর ব'সে থাকার বিশেষ সার্থকতা নেই। পরমত-গর্হণ না ক'রেও যে ধর্ম্মকথা বলা যায়, এরূপ

ধারণা যতদিন প্রচারকের মধ্যে না প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন ভারতবর্ষে কোনও ধর্ম্মান্দোলনই জাতীয় শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হবে না। অতীতে ভারতীয় ধর্ম্মচিন্তাধারার মধ্যে স্পষ্ট-রূপে কোনও জাতীয়তা-বোধ বা Nationalism ছিল না ব'লেই বর্ত্তমান যুগে সেই বোধকে বর্জ্জন ক'রে দিয়ে ঈশ্বরারাধনা কত্তে হবে ব'লে জেদ করার মধ্যে কোনও সদ্‌যুক্তির সুসঙ্গতি নেই। ইংরাজ-রাজত্বে আমরা কি সুখে আছি? হয়ত আমরা সুখে আছি। হয়ত আমরা দুঃখে আছি। কিন্তু আমাদের এই অস্তিত্বের ভিতরে সুখই প্রবল, না দুঃখই প্রবল, তার বিচারের প্রয়োজনীয়তা-বোধ থেকে আমরা কখনো মুক্ত হ'তে পারি না। গৃহস্থ-জীবন যাপন কর্ল্লেও না, সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হ'য়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও না। পাশ্চাত্য চিন্তার তরঙ্গাভিঘাত, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-অবনতির আশ্বাস ও নিষ্পেষণ, সমাজের নানাবিধ দুর্নীতি ও অধঃপতনের হুমকী ও আতঙ্ক, আমাদিগকে বারংবার স্বদেশ-চেতনার অঙ্কদেশে ঠেলে ঠুলে ফেলে দিচ্ছে। বর্ত্তমান যুগে স্বদেশের কথা না ভেবে কারো উপায় নেই। মায়াবাদী নিষ্কল সন্ন্যাসী আর অব্যভিচারিণী ভক্তির অনুশীলনকারী গোঁড়া বৈষ্ণব, প্রত্যেককে আজ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে দেশমাতার চরণ-কোণে সোজাসুজি বা আড়চোখে তাকাতে হচ্ছে। সভাস্থলে ভক্তগণের সম্মুখে হুঙ্কার ক'রে বক্তৃতাদানকালে যিনি অন্যান্য

সৎকথা যাই যখন বলুন, এই দেশেরই মৃত্তিকায় উৎপন্ন সুপ্রচুর শস্য, এদেশেরই গাভীর স্তননিঃসৃত সুপেয় দুগ্ধ, এদেশেরই আকাশের নির্ম্মল বায়ু, এদেশেরই মেঘোৎপন্ন স্নিগ্ধ বর্ষা-ধারা তাঁর তনুরক্ষার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে।

স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বধর্ম্ম সম্পর্কে শাস্ত্রব্যাখ্যাকারদের টীকা-ভাষ্যের অন্ত নাই। ধর্ম্মালোচনা শুরু হ'লেই স্বধর্ম্ম কথাটি এসে সমস্ত সভাটি জুড়ে বসে। কেউ বলেন, নিজ নিজ বংশবিহিত কর্ম্মই স্বধর্ম্ম। কেউ বলেন নিজের অন্তরের সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম্মই স্বধর্ম্ম। কেউ বলেন, স্ব মানে আমি নিজে কিংস্বরূপ জেনে নিয়ে তার অনুযায়ী কর্ম্মই স্বধর্ম্ম। কেউ বলেন,—আমি ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্মকর্ম্মই স্বধর্ম্ম। কেউ বলেন,—আমি পরমেশ্বরের নিত্য দাস, সুতরাং নিজ নিত্যসেবকত্ব স্মরণ রেখে জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম করাই স্বধর্ম্ম। আরো বহু রকমের ব্যাখ্যা, যোগ্যতর ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়ে থাকেন কিন্তু যেদিন ভারতের অধিকাংশ মানুষের মনে জাতীয় চেতনা বা Patriotism নামে একটী বস্তুর কোনো বিশেষ পরশ লাগে নি, সেই যুগে স্বধর্ম্মকে যে কথা দিয়েই ব্যাখ্যা করা হোক্, আজকের যুগে স্বদেশকে না চিনে স্বধর্ম্মের অনুশীলন করা এক মারাত্মক আত্মখণ্ডনের মতন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে।

স্বদেশকে যে ভালবাসবে না, স্বদেশকে যে চিনবে না, স্বদেশের মাটিকে যে স্বর্গাদপি গরীয়সী ব'লে স্বীকার কর্ব্বে না, সে মায়াবাদী সন্ন্যাসীই হোক আর শুদ্ধা ভক্তির আচার্য্যই হোক, দেশের মানুষ তাকে অন্ন কেন দেবে, বস্ত্র কেন দেবে, অর্থ কেন দেবে, পূজা কেন কর্ব্বে? এই প্রশ্ন আস্তে আস্তে উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছে তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ি দেখে। লোকমনের এই থার্ম্মোমিটারটীর দিকে দৃষ্টি রেখেও প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রচারকের পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রে হিসাব ক'রে বাক্য নিক্ষেপ কত্তে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—আমার এক ব্যক্তিগত বন্ধু গিয়েছিলেন ভারতবর্ষের কোনও এক অতি বিখ্যাত তীর্থে বহু সাধুসজ্জনদের চরণ দর্শন কত্তে। প্রত্যেকের কাছেই তিনি নিবেদন কর্লেন,—"আমি একটা ভাল সরকারী চাকুরী করি, কিন্তু বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের গোলামী কত্তে আমার মন চায় না, আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে আইন-ব্যবসায় কত্তে চাই, আপনি আপনার একটা মতামত দিলে বড় উপকৃত হই।" নামী নামী বড় বড় কয়েকজন মহাত্মা দিব্যি ব'লে দিলেন,—"আরে বেটা, রাজ ভক্তির মতন এমন সদ্‌গুণ আর কিছু নেই, রাজা হচ্ছেন পৃথিবীতে মানব-রূপী দেবতা, রাজার আশ্রয় কখনো ত্যাগ কত্তে নেই।" কেউ কেউ নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে সুন্দর সুন্দর কতকগুলি

সংস্কৃত শ্লোকও শুনিয়ে দিলেন। বন্ধুবর দেশে ফিরে এসে প্রথমেই কর্ল্লেন আমার সঙ্গে দেখা। বল্লেন,—"বল স্বামীজী, আমার কর্ত্তব্য কি?" আমি হেসে বল্লাম,—"তোমার মন্তব্যটাই আগে শুনে নিই না কেন?" বন্ধুবর বল্লেন,—"দেখ ভায়া, এসব ধর্ম্মাচার্য্যেরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, কারিকা, টীকা, ভাষ্য আদি হাজার হাজার কণ্ঠস্থ করেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পড়েন নাই। দিল্লীর রাজসিংহাসন থেকে পৃথ্বীরাজ কেন স'রে গেলেন, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা কেন হেরে গেলেন, গত পৌনে দুই শত বৎসরে ভারত কেন দীনাদপি দীন হ'য়ে গেল, এসব এঁরা কিছুই জানেন না।" আমি বন্ধুবরের মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বল্লাম,—"স্বদেশকে এঁরা জানেন না বলেই স্বধর্ম্ম-পালনে এঁরা অক্ষম।"

আমিষাহার ও নিরামিষাহার

আমিষ ও নিরামিষ আহার সম্পর্কে একজনে প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সকল দেশে এবং সকল যুগেই খাদ্যবস্তুর সুপ্রাপ্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার উপরে স্থানীয় জনসাধারণের খাদ্যরুচি নির্ভরশীল। যে দেশে প্রচুর পয়স্বিনী গাভী আছে, সে দেশে দুগ্ধই শ্রেষ্ঠ খাদ্য ব'লে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। যে দেশে তা' নেই বা যেমন দেশে শিকার করা ছাড়া খাদ্য-সংগ্রহ অসম্ভব, সে দেশে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য ব'লে বিবেচিত হয়। যে

দেশে মৃত্তিকাতলে সহজেই নানা ভোজনযোগ্য কন্দমূলাদি জন্মে বা সহজেই লতাপাতায় ধরণী আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, সে দেশে মানুষ স্বভাবতঃই শাকান্নভোজী হ'য়ে থাকে। আমিষ আর নিরামিষের মধ্যে ভেদ-বিচার প্রথমে এই ভাবেই সৃষ্ট হয়। শীতপ্রধান দেশে লোকে মাংস বেশী খায়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে লোকে শাকসব্জি বেশী খায়, এটাও স্বাভাবিক কারণেই হয়েছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে যদি কখনো এমন অবস্থা আসে যে, চিরপ্রচলিত খাদ্যবস্তুতে উদর-পূরণ অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে, তখন মানুষ হয়ত নূতন নূতন খাদ্য আবিষ্কার কর্ব্বে বা সৃষ্টি ক'রে নেবে। এখনি অবশ্য এই বিষয়ে আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার দরকার হয়ত নেই কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে খাদ্যচিন্তা এক চমৎকার চিন্তায় পরিণত হবে। যার নিরামিষে রুচি, সে আমিস খেয়ো না। যার আমিষে রুচি, সে অত্যধিক আমিষ সেবন ক'রো না। আপাততঃ তোমাদের জন্য আমার উপদেশ এই।

শিবপুর (নোয়াখালী)
২৮শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৪২
(১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস ও চরিত্র

যশোহর জেলান্তর্গত ডুমারিয়া দেবদুন-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বৃহৎ বা মহৎ কোনও সুদূরপ্রসারী ফল প্রসবের যোগ্য কর্ম্ম সুসম্পাদিত করিতে হইলে তাহার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী একটী গতিশীল পরিকল্পনা পূর্ব্বাহ্নে রচনা করিতে হয় এবং কতিপয় ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, তিন, চারি বা পাঁচ পুরুষ ব্যাপিয়া পিতাপুত্রানুক্রমে বা গুরুশিষ্যানুক্রমে সে কাজ ধরিয়া রাখিতে হইবে, চালাইয়া যাইতে হইবে। দেশোদ্ধার-পরিকল্পনাকে আমি তজ্জাতীয় বলিয়া মনে করি। হঠাৎ হুজুগে দুই চারি জনের সংহতি এই কাজটী করিয়া উঠিতে পারিবে না অথবা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের সাময়িক অর্দ্ধ-জাগরণের দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা খুব একটা বড় কথা নহে, আন্তর্জ্জাতিক জগতের অপরিদৃশ্যমান নানা ঘটনা-পরম্পরার নিঃশব্দ-পদসঞ্চারের ফলে হঠাৎ এমন একটা জাতিও স্বাধীনতা নামক প্রাংশুলভ্য ফল পাইয়া যাইতে পারে, যাহা পাইবার তাহার সম্ভাবনাও ছিল না, যোগ্যতাও ছিল না। কিন্তু যদি দৈবাৎ আন্তর্জ্জাতিক জগৎ এমন তালে চলিতে থাকে, যেই রুদ্র-তাণ্ডবের স্বাভাবিক ফল অযোগ্যের স্বাধীনতা লাভ, তাহা হইলেও লব্ধ স্বাধীনতাকে জীবনের কুশলে রূপান্তরিত করিবার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা যাহাতে জাতির প্রতি অঙ্গে প্রতি প্রত্যঙ্গে অনুশীলিত হইতে পারে, তাহার

জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা এবং সুগভীর সংগঠন প্রয়োজন। ইহা বুঝিয়া যাহারা কাজ করে, তাহারা কদাচ হঠপন্থায় ধাবিত হইতে পারে না। তাহাদিগকে ধীর মস্তিষ্কে স্থির বুদ্ধিতে তেমন কর্ম্মপন্থা নির্ব্বাচন বা নিরূপণ করিয়া নিতে হয়, যাহার দ্বারা আস্তে আস্তে দুর্ব্বল জাতীর মেরুদণ্ডে বলের হয় সঞ্চার, ভীত-সন্ত্রস্ত অবশ চিত্তগুলিতে সঞ্চারিত হয় আশা, আশ্বাস ও বিশ্বাস। একাজ একজনের নহে, একাজ এক দিনের নহে। কাজ শত শত সহস্র সহস্র ব্যক্তির, একাজ যুগ যুগ ব্যাপিয়া। বৃহৎ ও মহৎ কাজে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হইতেছে যেই জিনিষটীর, তাহার নাম ধৈর্য্য, তাহার নাম কালপ্রতীক্ষা-শক্তি, তাহার নাম অবশ্যম্ভাবী দুঃখ, পীড়ন, যন্ত্রণা-সমূহ সত্ত্বেও আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া যাইবার মতন সহিষ্ণুতা, তাহার নাম ঈশ্বরে বিশ্বাস ও চরিত্রবল। এগুলি কথার কথা নহে। এগুলি সর্বসত্যের প্রকৃত মর্ম্মস্থল। যাহাকে দেখি, এজন্যই তাহাকে শুধু এই কথাটীই বলি। মহৎ ও বৃহৎ কাজ যদি করিতে চাহ, বা তাহার উপলক্ষ্য মাত্রও হইতে চাহ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস ও চরিত্র অর্জ্জনে তৎপর হও।"

আমার দুইটী গোঁড়ামি

বাঁকুড়া জেলান্তর্গত হাট-আগুরিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এক এক বিষয়ে এক এক জনের এক একটা গোঁড়ামি থাকে। যেমন, কেহ কেহ মনে করেন, বিষ্ণুর উপাসনা না করিলে জীবের মুক্তি হইবে না এবং অন্য সকল দেবতার উপাসনা পরিহার করিয়া একমাত্র বিষ্ণু পাদপদ্মেই আত্মসমর্পণ করা উচিত। ইহারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার নাম শুনিলেও বিরক্ত হন এবং বিষ্ণুকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্য নানাবিধ পদ্ধতির পূজা ও উপাসনাকে গর্হিত বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। যেমন, কেহ কেহ মনে করেন যে, যে দেবতার খুশী, সেই দেবতারই তুমি পূজা করিতে পার, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রের সংস্পর্শে তুমি যাইতে পার না, গেলে তোমার জাতিচ্যুতি ঘটিবে, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, নতুবা তোমাকে ব্রাত্য করিয়া রাখা হইবে। আমারও তেমন একটা গোঁড়ামি বা ঝোঁক আছে। তাহা এই যে, তুমি যেই পথ বা মত আশ্রয় করিয়াই পথ চল না, তোমাকে দুইটী বিষয়ে বিশেষ অভিনিবেশ দিতে হইবে।—একটী এই যে, তোমাকে আত্মকুশল-চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর জগৎকল্যাণ-চিন্তাও করিতে হইবে, জগৎকল্যাণের চিন্তা দ্বারা হৃদয় ও মনকে প্রশান্ততর করিয়া নিবার পূর্ব্বে তুমি বিশ্বস্রষ্টার পরমমঙ্গলময় নামজপ শুরু করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়টী এই যে, তোমাকে তোমার সাধ্য অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন করিতে হইবে এবং এই অনুশীলনটী তোমাকে আমরণ চালাইয়া যাইতে

হইবে। অতীতে তুমি ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি একেবারেই যদি আস্থাশীল না থাকিয়া থাক, তবে বর্ত্তমানে তোমাকে সপ্তাহে তিন চারিদিন পূর্ণতঃ ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে যদি তুমি সপ্তাহে মাত্র তিন চারিদিন ব্রহ্মচর্য্য-পালনে সমর্থ হইয়া থাক, তবে অদূর-ভবিষ্যতে তোমাকে মাসের অধিকাংশ দিন ব্রহ্মচারী থাকিবার জন্য প্রয়াসী হইতে হইবে। মাসে যদি তুমি বর্ত্তমানে সাতাশ আঠাশ দিন সংযম-ব্রত পালন করিতে সমর্থ হইয়া থাক, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে তোমাকে বৎসরে তিন শত ষাট কি বাষট্টি দিন সংযমী থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টার কথা ও কাহিনী, এই চেষ্টায় জয়-পরাজয়ের বার্ত্তা তুমি বাহিরে কাহাকেও বলিয়া বেড়াইবে না কিন্তু নিজের মনের কাছে নিজে সর্ব্বদা এই বিষয়ে খাঁটি থাকিতে চেষ্টা করিবে যে, তোমার অধ্যবসায়ের ভিতরে কোথাও চালাকি বা ফাঁকি ছিল না। যে নিজেকে নিজে ফাঁকি দেয় না, তাহাকে জগতে কেহ কদাচ ফাঁকি দিতে পারে না।"

বিবাহিতের ও অবিবাহিতের সংযমে পার্থক্য

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অবিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য পালন যত সহজ, বিবাহিতের

ব্রহ্মচর্য্য পালন তত সহজ নহে। কারণ, অবিবাহিত ব্যক্তি কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিলে এবং বারংবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া যাইতে থাকিলে দুর্ব্বলতার রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত থাকিতে পারে কিন্তু বিবাহিতা নারীর স্বামীটী নিয়ত সঙ্গে থাকিলে তাহা দোষাবহ হয় না এবং দুই জনের মনোগতি একরূপ না হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্ভবও হয় না। দুই জনের মধ্যে দরদ ও সুহৃদ্য যত গভীর ও অকৃত্রিম হইবে, দুই জন দুই জনকে উৎসাহ-দান করিয়া সংযম-ব্রত পালনে তত অধিক সহায়তা করিতে পারিবে। বলিতে কি, যত স্থানে স্ত্রীরা অটুট ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্থলে স্বামীর পূর্ণ সহযোগ থাকার দরুণই তাহা সম্ভব হইয়াছে এবং যত স্থানে স্বামীরা অটুট ব্রহ্মচর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে স্ত্রীর অকুণ্ঠ সাহায্যের বলে স্বামী এই অসাধ্য-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। দম্পতীর ব্রহ্মচর্য্য-পালনের মধ্যে যে প্রশান্ত ও দেবগণেরও লোভনীয় আনন্দ আছে, তাহা স্বামী-স্ত্রীর পরিপূর্ণ প্রেমিকতার মধ্য দিয়াই শুধু আস্বাদিত হইতে পারে। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য একটা গর্ব্ব করার কথা মাত্রই নহে, ইহা সহস্র স্বর্গের সুখ একত্র আস্বাদন করিবার সোপান। যেই ভোগ-লোলুপতায় সহস্র সহস্র জীবজন্তু অধীর অস্থির হইয়া ভূমিতলে প্রাণের জ্বালায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, সেই খাণ্ডব-বন-সম দাহ্যমান সংসার-অরণ্যে বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

এক শান্তি-স্নিগ্ধ সুশীতল আশ্রয়-কুটীর; এই কথাটুকুতে বিশ্বাস রাখিয়া কাজে ব্রতী হও। নিজের চেষ্টাতেই নিজের পথ তুমি বাহির করিয়া নিতে পারিবে। স্ত্রীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গ্রাম্যতা তাহাদের অস্থি-মজ্জায় বাসা বাঁধিয়া বসিয়া আছে, সম্ভোগ-বিরত হইলে তাহারা স্বামীকে পরদাররত বলিয়া সন্দেহ পোষণ করে, স্বামি-সোহাগের কথা প্রিয় সাথীদের বলিতে না পারিলে তাহাদের মন আইঢাই করে, এই সকল ওজর আপত্তি আমি অমূলক মনে করি না কিন্তু ধীমান স্বামী স্ত্রীর গুরু স্থানীয়। সে ইচ্ছা করিলে চেষ্টা করিলে স্ত্রীকে সত্য সত্যই সহধর্ম্মিণীতে পরিণত করিতে পারে। আর, বিশ্বাস করিও, নারী কেবল মায়াই নহে, সে মহামায়া, সে মহাশক্তি, সে অসম্ভবকে সুসম্ভব করিতে পারে, তাহার অসাধ্য সংকর্ম্ম নাই।"

স্ত্রীযোনির মহিমান্বিত মর্য্যাদা

ঢাকা জেলান্তর্গত কামারখাড়া-নিবাসিনী জনৈকা পত্র-লেখিকার পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিশ্বের অনন্ত কোটি কবি অবাক্ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহাদের অন্তরের কাব্যার্ঘ্য অর্পণ করিয়াছেন একটি দিব্য অস্তিত্বকে, যাঁহার নাম নারী। অনন্তকোটি সিদ্ধসাধক তপস্বিগণ ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে স্তোত্রচ্চারণ করিয়াছেন তাঁহার

স্তন লইয়া নহে, তাঁহার নিতম্ব লইয়া নহে, তাঁহার যোনিকে অবলম্বন করিয়া। নিতান্ত প্রগল্‌ভ চিত্রকরও যাহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে পারে নাই, যেখানে এই ঋষি-তপস্বীর দল দেখিয়াছে কোটি কোটি দেবগণের জন্মভূমিকে, দেখিয়াছে অবতার-কল্প মহামানবদের পূজাপীঠকে, দেখিয়াছে জৈব-কামনাকে চিরনিঃস্তব্ধ করিয়া দিবার সামর্থ্য-সম্পন্ন নিত্যজ্যোতির্ম্ময় পরমশিবের নিত্য, শাশ্বত অবস্থানকে। গ্রীসে, মিশরে, রোমে নারী-ইন্দ্রিয়ের প্রতীক বহিয়া মদোন্মত্ত মিছিলকারীরা ধর্ম্মের নামে যখন ব্যভিচারের বন্যা বহাইয়া যাইতেছে, তখন ভারতের সাধক-মন বহিরঙ্গ উচ্ছ্বাসের অবসান ঘটাইয়া অন্তরঙ্গ সাধনে ডুবিয়া গিয়া প্রাণভরা ভক্তি নিয়া উচ্চারণ করিয়াছে, "জননি, তুমি কেবল আজই জননী নও, তুমি অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত কোটি জীবগণের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের শাশ্বতী জননী। জননি, তোমার স্মরণ মাত্র কাম-বাসনা স্তব্ধ হইয়া যায়, চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়া যায়, মন আত্মপ্রসাদে স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া যায়, কোটি জন্মের শ্রান্তি, ক্লান্তি, বেদনা ও ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়, চক্ষের দৃষ্টি স্পষ্ট হয়, আমি নিজেকে চিনিতে পারিয়া কৃতকৃতার্থ হই।" ভাবিয়া দেখ, স্ত্রী-যোনির কত সম্মান, কি উচ্চ মর্য্যাদা, কি অকল্পনীয় গৌরব। সুতরাং ইহার পবিত্রতা রক্ষার দিকে তোমাদের প্রতিজনের অবশ্যই মনোযোগিনী হইতে হইবে।

কুমারীর, সধবার, বিধবার প্রতিজনের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।"

দশ জনকে সঙ্গে লইয়া কাজে নামো

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত কানাইদিঘী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরোপকার করিতে গেলে আত্মোপকার ব্যাহত হয়। এই দুইটী কথাই অংশতঃ সত্য। কিন্তু তুমি একাকী নিজের চেষ্টায় যেখানে পরোপকারে ব্রতী হও, সেখানেই একথা খাটে। যে-কোনও পরহিতকর কর্ম্মে যদি একযোগে বহুজনকে প্রবৃত্ত করাইতে পার, তাহা হইলে একক তোমার পক্ষে যে উপকার-দানটী অসাধ্য, অসম্ভব বা দুঃসাধ্য, তাহা বহু জনের অল্প অল্প সহযোগের ফলে সুসম্ভব ও সুসাধ্য হইয়া পড়িবে। বহু জনের অল্প অল্প শক্তি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবাকে একস্থানে সমন্বয়ীভূত করিবার যে কৌশল, তাহাকে কর্ম্মযোগের একটী বিরাট সম্বল বলিয়া মনে করিতে পার। কিন্তু পরস্পরের ভিতরে সৌহৃদ্য না থাকিলে, একের প্রতি অপরের আস্থা ও শ্রদ্ধা না থাকিলে, একের আচরণ অন্যের প্রতি ন্যায়োপেত ও নির্ব্বিদ্বেষ না হইলে সকলের শক্তি, শুভেচ্ছা ও ত্যাগকে এক স্থানে সমন্বিত করা কদাচ সম্ভব নহে। সুতরাং মানুষের

সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপনের বিদ্যা তোমাকে সর্ব্বাগ্রে আয়ত্ত করিতে হইবে। বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইলে এক বন্ধুর আরব্ধ সৎকার্য্যে বা পরিকল্পিত মহৎ ব্রতে ত্যাগ-স্বীকার করিতে অন্য বন্ধু কুণ্ঠিত হইবে কি করিয়া? বন্ধু-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা বর্জ্জন করিয়া যাহারা সৎ প্রয়াসে নামে, তাহারা যে-কোনও পরকল্যাণে পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের সহায়তা ত' পায়ই, অপরিচিত হস্তের পুণ্যভরা দানও তাহাদের হাতে আসিয়া পড়ে। যে কাজই কর, কাজটী যখন সৎকাজ, তখন একা করিবে কেন? দশ জনকে সঙ্গে লইয়া কাজে নামো। বিরাট বিশাল বোঝা একেবারে হালকা হইয়া যাইবে। তবে, চোর-জুয়াচোরকে সঙ্গী করিও না। অসৎ লোকের সহায়তা যাজ্ঞা করিলে নিজেকেও অসৎ হইতে হইবে অথবা মিথ্যা অপবাদে ক্লেশ পাইতে হইবে। অপবাদে যে মনঃকষ্ট হয়, তাহা যদি ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নাও কর, তবু জানিও, লোকের বিশ্বাস তোমার উপর হইতে উঠিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া ইহা তোমার প্রকৃত লক্ষ্য-লাভের পথে কার্য্য-হন্তারক হইয়া দাঁড়াইবে।"

আমি সবার জন্য কাঁদি

২৪-পরগণা জেলান্তর্গত কামারহাটি-নিবাসিনী জনৈকা ভক্তিমতী মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বপ্নে দেখিয়াছ, আমাকে উদর পূর্ণ করাইয়া আকণ্ঠ

ভোজন করাইতেছ। ইহা ভাল স্বপ্ন। কিন্তু আমাকেই এই নোয়াখালি জেলার পল্লী হইতে ধরিয়া নিয়া তোমার কামারহাটিতে ভোজন করাইতে হইবে, এই স্বপ্নের অর্থ তাহা নহে। আমার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য আমি জীবনে কদাপি কাহাকেও অন্নদান করিবার জন্য একটী বাক্যও উচ্চারণ করি নাই। মনে মনে কদাচ এরূপ কথা ভাবি নাই। তদবস্থায় তুমি যখন স্বপ্নে দেখিয়াছ যে, আমি তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল চাহিয়াছি, তখন জানিতে হইবে যে, সেই আমি দেশব্যাপী সকল স্থানের সকল ক্ষুধার্ত্ত আর সকল তৃষ্ণার্ত্তের মধ্যে বিরাজ করিতেছি। ইহাদের কণ্ঠের কাতর আর্ত্তনাদ কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না বলিয়াই ঐ কণ্ঠগুলি আমার কণ্ঠের মধ্য দিয়া ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া তোমার কাণে প্রবেশ করিয়াছে। জৈব দৃষ্টিতে আমাকে না দেখিয়া আমাকে তাহাদের সকলের প্রতিনিধি-স্থানীয় মনে করিয়া অবিলম্বে তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি-সাধ্যানুযায়ী তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা কর। ইহার অর্থ এই নহে যে, ইহাদের একবেলা কিছু খিচুড়ী খাওয়াইয়া বিদায় দিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল। ইহাদিগকে দুয়ারে দুয়ারে যাহাতে কদাচ খিচুড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে না হয়, তাহাও করিতে হইবে। একাজ একজনের পক্ষে সুসাধ্য নহে বা একদিনেও সম্ভব নহে। সুতরাং আমার যে ক্ষুধার কান্না তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছ, তাহা তোমার প্রতি সুদীর্ঘকালের জন্য এক

শাশ্বত কর্ত্তব্যের ব্যাকুল আহ্বান বলিয়া জানিও। আমি আমার জন্য কখনো কাঁদি না। আমি বিশ্ববাসী সকল ক্ষুধার্ত্ত, সকল তৃষ্ণার্ত্ত, সকল ভয়ার্ত্ত, সকল আতুর, অক্ষম, দুর্ব্বল জনের জন্য কাঁদি।"

সমবেত উপাসনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মহিমা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত নাসিরনগর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ধর্ম্মাচার্য্য-রূপে অমর কীর্ত্তির অধিকারী হইবার আমার প্রাণের কোনও তাড়না নাই! আমি নিজে ধর্ম্মকে যে ভাবে যতটুকু বুঝিয়াছি, সে ভাবে তাহাকে অক্ষত ও অবিকৃত রাখিয়া সেবা দান করিতে পারি কিনা, আমার যাবতীয় ব্যগ্রতা শুধু ততটুকুকেই নিয়া। লোক-প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে অত্যধিক-সংখ্যক মানুষকে নিজ ধর্ম্মচর্য্যায় দীক্ষিত করিবার দিকে আমার আগ্রহ নাই এবং আমার মত ও পথ অনন্ত কাল ধরিয়াই মানব-গোষ্ঠী-সমূহ অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকিবে অথবা আমার পাঞ্চ-ভৌতিক দেহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে, এই বিষয়ে আমার ব্যাকুলতা বা উদ্বেগ নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মাচার্য্যের এক একটা বিষয়ে একটা সুস্থির সিদ্ধান্ত থাকে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া

তাঁহার মতামত অনুশীলিত বা ব্যাখ্যাত হয়। তাহা বৃত্তের কেন্দ্র-বিন্দুরই মতন অপরিবর্ত্তনীয় থাকে। আমারও তদ্রূপ একটী মর্ম্মকথা আছে। তাহা এই যে, ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রের স্বীকৃতি, সর্ব্বতত্ত্বের স্বীকৃতি, সর্ব্বরূপের সমাহার, সর্ব্বতন্ত্রের সমন্বয়। এক ওঙ্কারের মধ্যেই পরমেশ্বরের সকল নাম, সকল রূপ ও সকল বিভূতি বিরাজ করে। এক ওঙ্কারকে পূজার আসনে রাখিলে আর অন্য কোনও আলম্বনের সেখানে প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই সমবেত উপাসনাতে বহু দেবতার, বহু বিগ্রহের, বহু প্রতীকের কোনও প্রয়োজন হয় না। এই ব্যাপারে কাহারও সহিত কোনও আপোষে না গিয়া যদি গোঁড়ামি নিয়া জগতে একটী মাত্র উপাসকও জীবিত থাকে, তবে আমি জানিব, আমিও জীবিত আছি। আমার প্রতিচিত্রের বা স্মারক বস্তুর পূজাকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এই যুগে এই সমবেত উপাসনার আবির্ভাব ঘটে নাই, ঘটিয়াছে অনন্ত কালব্যাপী প্রতিটি উপাসকের সহিত আমার সমসাধকত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্ভবমত সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের সমন্বয়ে ঈশ্বরারাধনার একটী ব্যাপক প্রস্তুতির সৃষ্টি হেতু। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যাহাদের উপাস্য, একদা তাহারা সকলে নিজেদের অজ্ঞাতসারে নানা ঘটনাবলির আবর্ত্তনে ও বিবর্ত্তনে একই হইয়া যাইবে, যদি শুধু সমবেত উপাসনা টুকুকে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া করিয়া যাইতে পারে।"

স্নেহ ও কাম

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত মোহনপুর-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরম স্নেহভরে একটী শিশুকে, একটী তরুণকে বা একটী বয়স্ক ব্যক্তিকে বক্ষে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলে যদি তোমার দেহে ও মনে সূক্ষ্ম ভাবেও এমন উত্তেজনার জন্ম হয়, যাহা হইলে হইতে পারিত একটী সুন্দরী তরুণীকে বারংবার বক্ষোলগ্ন করিলে, তবে জানিও, তোমার এই স্নেহ নিতান্তই স্নেহ নহে, ইহা কাম। স্নেহের ছদ্মবেশ ধরিয়া কাম তোমাকে বারংবার প্রলুব্ধ ও বিড়ম্বিত করিতেছে। যোগীরা নিজ শিষ্যদিগকে চিরকালই এই কারণে অতি স্নেহ-পরায়ণ ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটু সাবধান হইয়া চলিতে নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল অবোধ শিশু, বালক বা বালিকা তোমার অন্তরকে জানে না, কেবল বাহিরের স্নেহ দেখিয়াই গলিয়া যায় এবং যখনি চাহ, তখনি তোমার কটিলগ্ন, বক্ষলগ্ন বাগললগ হইয়া থাকে, তোমার অন্তরের লুক্কায়িত কাম পরোক্ষে তাহাদের ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। তোমার কপট স্নেহ পাইতে অভ্যস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অশিক্ষিত অপটু মনে এক প্রকারের অব্যক্ত লালসার সৃষ্টি হয়, যাহাকে সে নিজে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে পারে না কিন্তু যাহার প্রভাবে সে ঠিক অনুরূপ আচরণ নিজের চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠদের

সম্পর্কে শুরু করিয়া দেয়। শিশু হইলেও সকলেই কিছু সমান বোকা থাকে না। কোনও কোনও শেয়ানা ছেলে বা মেয়ে নিশান্ধকারে নিজ নিজ গুরুজনদের দাম্পত্য আচরণ চোখে দেখিয়া তাহার সহিত ইহার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নেয় এবং সকলের অজ্ঞাতসারে প্রতিভাধর শিশু একটী রতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞে পরিণত হইয়া যায়। শৈশবের সারল্যের আড়ালে থাকিয়া এই 'প্রডিজি'রা কত অবোধ শিশুকে ভাবী জীবনের কামপঙ্কিল জীবন-ধারার সহিত যুক্ত করিয়া দেয়, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। তোমার একটী বা দুইটী অসম্বৃত আচরণের দ্বারা তুমি এই ভাবে কত জনের ভবিষ্যৎকে বিধ্বস্ত করিবার উত্তেজক কারণ হইলে, তাহা ভাবিয়া দেখ এবং এখনই সতর্ক হইয়া যাও। রেলগাড়িটীও চলিতে চলিতে এক স্থানে আসিয়া 'হল্ট' করে। তোমাকে 'হল্ট' করিতে হইবে। মানুষ অভ্যাসের দাস কিন্তু অভ্যাসটী ত' সে নিজেই আস্তে আস্তে গড়িয়া তুলে। সুতরাং চেষ্টা করিলে সে তাহার অর্জ্জিত কদভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিবে না কেন? যে কাজটী করিলে বাহিরের দর্শক তোমাকে দোষী বা ঘৃণিত-চরিত্র বলিয়া কল্পনামাত্রও করে না, অথচ যে কাজটী করিবার সময়ে তুমি নিজে নিজে স্পষ্ট অনুভব কর যে, তোমার কামেন্দ্রিয়ের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হইতেছে, যে কাজটী করিবার কালে সাধারণ কামুকেরই ন্যায় তোমার

শরীর হইয়া ওঠে উত্তপ্ত, কর্ণমূল হইয়া ওঠে আরক্ত, মস্তিষ্কের ভিতরে চলিতে থাকে যেন উনপঞ্চাশ প্রভঞ্জন, সেই কাজটার অনুশীলন হইতে তোমাকে সরিয়া আসিতেই যে হইবে, এই পণ কর। প্রতিজ্ঞার মত প্রতিজ্ঞা করিলে মানুষ তাহার সঙ্কল্প অটুট রাখিতে পারে এবং তুমিও পারিবে। অনেক নারকী পশু অধঃপাতের নিম্নতম খাদে নামিয়া গিয়াও একমাত্র সঙ্কল্পের শক্তিতে যে পুনরায় নিষ্কলঙ্ক জগতে উঠিয়া আসিয়াছে এবং পুণ্যবান্ সাধু-ব্যক্তিদের শীর্ষস্থানীয় যে হইয়াছে, জগতে তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং মনে মনে আশান্বিত হও এবং যেরূপ চিন্তন-ক্রিয়ার দ্বারা এই ছদ্মবেশী কামের চর্চ্চায় একদা নামিয়া পড়িয়াছিলে, অধিকতর প্রবল ভাবে তাহার বিপরীত চিন্তন-ক্রিয়ার দ্বারা নিজেকে তুমি নিজের শক্তিতে উদ্ধার করিয়া আন। বিবাহ করিয়া বৈধ ভাবে স্ত্রীসম্ভোগাদি পাপ-কর্ম্ম নহে কিন্তু স্ত্রী-সম্ভোগের মতন চূড়ান্ত কোনও অনুষ্ঠান না করিয়াও বাহ্যতঃ স্নেহ প্রদর্শন-পূর্ব্বক কোনও পুরুষ বা নারীর, বালক বা বালিকার শরীরাদি স্পর্শ করিয়া মনে মনে রতিসুখ আস্বাদন করিবার ঝোঁক তাহা অপেক্ষা অনেক হেয় ও জঘন্যতর কুকর্ম্ম। ভারতীয় ভদ্রসমাজে তরুণ বা তরুণীদের নিয়া হাতাহাতি মাথামাখি, গলাগলি, কোলাকুলি যে প্রশস্য সদাচার নহে, তাহার প্রধান কারণই ইহা।"

মনুষ্যজীবন লীলাবাসর

অপরাহ্ণে শিবপুরে এক জনসভার অনুষ্ঠান হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি দেড় ঘণ্টা কালব্যাপী একটী ভাষণ দিলেন। তিনি বলিলেন,—আজকের শিশু কাল হবে যুবক, পরশু হবে প্রৌঢ়, তারপরের দিন হবে বৃদ্ধ। একটী মাত্র জীব-সত্তাকে নিয়েই শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য এবং অতিবৃদ্ধত্বের খেলা বিস্তারিত হ'তে থাকে। একটী অশিক্ষিত মানুষ ক্রমশঃ শিক্ষিত হয়, একটী অজ্ঞান মানুষ ক্রমশঃ জ্ঞানী হয়, একটী অপ্রেমী মানুষ ক্রমশঃ প্রেমিক হয়, কিন্তু আস্তে আস্তে জীবন্ত মানুষটীর জীবনের লীলাখেলা সাঙ্গ হয়, সে চ'লে যায় এক অজ্ঞাত অজ্ঞেয় অনির্ব্বচনীয় জগতের অফুরন্ত যাত্রাপথে কিন্তু সে তার স্মৃতি-চিহ্ন রেখে যায়, জগতের বুকে। একটী মানুষের সাধনা, হয় পুরুষানুক্রমে, নয় শিষ্যানুক্রমে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেয়ে ক্রমশঃ অফুরন্ত অনন্তের পানে ছুটতে থাকে এবং একদা নগণ্য বুদ্ধিহীন মানুষ ক্রমে ক্রমে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন জ্ঞানী মানুষ, বৈজ্ঞানিক মানুষ, অঘটন-ঘটনে সমর্থ মানুষ-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই যে উন্নতিমুখিনী বিবর্ত্তন-ধারা, তার মধ্যে সাধক, ভক্ত ও কবিরা পরমেশ্বরের অপার অনন্ত কৃপার লীলা দেখে মুগ্ধ হন। মনুষ্য-জীবন শ্রীভগবানের বিচিত্র এক লীলা-বাসর। মানুষকে এই দৃষ্টিতে নিজের জীবনটীকে দেখতে হবে।

ক্ষুদ্র শিশু সম্পর্কে সম্ভ্রম ও সতর্কতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক্ষুদ্র শিশুটীর মধ্যে ভাবী জগতের অনন্ত উন্মেষের সম্ভাবনা রয়েছে লুক্কায়িত। এই জন্যই ঐ শিশুটীর প্রতি আমাদের দিতে হবে অখণ্ড মনোযোগ। আমরা কি মনে মনে কুচিন্তার চর্চ্চা কত্তে কত্তে একটী শিশুকে কোলে নিতে পারি? না, পারি না। কারণ, আমাদের মনের তামসিকতা ঐ শিশুর ভিতরে সংক্রামিত হ'য়ে তার ভাবী বিকাশের সম্ভাবনার পথ যদি প্রতিরুদ্ধ করে, তবে তাতে জগতের ক্ষতি হবে। তার ভিতরে দেবভাবময় পরম পুরুষের উপস্থিতি চিন্তা ক'রে নিজেদের দেহ ও মনকে পবিত্র ক'রে নিয়ে তবে আমরা তাকে স্পর্শ কর্ব্ব। এই হওয়া উচিত একটী ক্ষুদ্র শিশু সম্পর্কে আমাদের সম্ভ্রম-বোধ ও সতর্কতা।

বালক-বালিকা সম্পর্কে সম্ভ্রম ও সতর্কতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটী বয়স্ক বালক বা বালিকা সম্পর্কে আমাদের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত? ঠিক ঐ একই রকম। পার্থক্য এই যে, এই বালক বা এই বালিকা

এখনো অজ্ঞান অবোধ হ'লেও অনেক-কিছু কিছু-কিছু বুঝতে পারে এবং অনেক কিছুই আশ্চর্য্যজনক ভাবে স্মৃতির পটে এঁকে রাখ্‌তে পারে। এজন্য তাকে আলাদা ক'রে কোনো শ্রম কত্তে হয় না। আজ যা স্মৃতির ব্রমাইড কাগজে সে তুলে রাখ্‌ল, তার তাৎপর্য্য আজই সে নাও বুঝতে পারে কিন্তু আস্তে আস্তে যখন সে বড় হবে, তখন একদিন হঠাৎ সে ঐ ছোট-ক'রে ধ'রে-রাখা স্মৃতিটুকুর বিরাট এন্‌লার্জ্জমেন্ট দেখে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে তার স্বাভাবিক উত্তেজনায় এবং সেই ক্ষিপ্ততা তাকে সদাচার-বিরোধী, সমাজ-বিরোধী, সৌজন্য-বিরোধী, সংশৃঙ্খলা-বিরোধী এবং নিদারুণ ভাবে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলতে পারে। সাধারণ বালক-বালিকাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিটি ব্যবহারের মধ্যে এত বড় দুঃসহ বেদনার আদি কারণ নিহিত হ'য়ে থাক্‌তে পারে। অতএব বয়স্ক বালক-বালিকাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিজনের ব্যবহারও যথেষ্ট সম্ভ্রম-বোধ-সমন্বিত ও সতর্কতা-পরিরক্ষিত হওয়া উচিত।

যুবক-যুবতীদের সম্পর্কে সম্ভ্রম ও সতর্কতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যুবক-যুবতীদের সঙ্গে আমরা কি ভাবে মিশব? জীবনে আর্ট না থাক্‌লে, জীবন থেকে

কাব্য অনুপস্থিত থাক্‌লে, জীবনকে রসহীন বৃদ্ধ খেজুর বৃক্ষের মত দুঃসহ মনে হয়। তারই জন্য যৌবনে কি নারীর, কি পুরুষের চখের সামনে কত যে স্বপ্নের নেশা বা নেশার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে তাদিগকে যদি আমরা বাস্তব জগতের সংগ্রাম-মুখর রুদ্র কর্ম্মাঙ্গনে টেনে আনতে চাই, তবে তারা ক্ষুব্ধ হবে, বিরূপ হবে। একথা সম্পূর্ণ সত্য। এজন্যই দেখতে পাই, যেখানে যে যুব-আন্দোলন কচ্ছে, নাটক, গল্প, নৃত্য, অভিনয়, গান, বাজনা, হল্লা, হল্লোড়, কাব্য সাহিত্য, ভ্রমণ আর পিক্‌-নিক্‌ দিয়ে যৌবনের স্ফূর্ত্তিকে এক ছড়াছড়ির মেলায় পরিণত কত্তে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু দুদণ্ডের এই মেলা আর পলকের এই খেলা জীবনটার ভিত্তিমূলে কোন্‌ বল সঞ্চয় কর্ব্বে, এটার ওজন ও হিসাব রাখবেন মহাকাল তার নির্ভুল নিক্তির কাঁটায়। ভারতের যৌবনকে আমরা কি নূতন জোয়ারের পঙ্কিল জলে ভেসে চলে যেতে দিব, না কি তাকে শক্ত ক'রে ধরে রেখে এক মহামহীয়ান্‌ গৌরবগরীয়ান্‌ বীর্য্যবরীয়ান্‌, মহাজাতি সৃষ্টির কাজে লাগবে? আরও প্রশ্ন এই যে, এই যৌবন একদা পরিপক্ক বার্দ্ধক্যে কি জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ক'রে দেশব্যাপী অন্ধতার বিদূরণ-কার্য্যে রত হবে, না ইন্দ্রিয়-বিলাসের কলুষ-পল্বলে মৃত্যুপথযাত্রীর শ্মশান-শয়নকেও কদর্য্যতর ও নিষ্ঠুর ক'রে তুলবে; যৌবনের জাগরণ কি জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির দিব্যায়নে হবে সহায়ক, না কি

তা হবে রিরংসার পর রিরংসাকে, জিঘাংসার পর জিঘাংসাকে, কাপট্যের পর কাপট্যকে, দুর্ব্বলতার পর দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে একটা উন্নয়ন-মুখী জাতির অকাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কর্ব্বে আয়োজন? আমরা আমাদের কিশোর-কিশোরীদের প্রতি, যুবক-যুবতীদের প্রতি উপেক্ষাশীল হ'তে পারি না, কেননা, আপাততঃ তারাই এই জাতির ভবিষ্যৎ। একদা তাদেরই বংশ বেয়ে যোগ্যতর ও যোগ্যতরা নর-নারীর সমাজ আত্মপ্রকাশ ক'রে ধরণীকে ধন্যা কত্তে সমর্থ হ'তে পারে, এ আশা দুরাশা নয়।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রয়োজনীয়তা, উপায় ও নিয়ম-প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দান করিয়া বক্তৃতা সাঙ্গ করিলেন।

(বিংশ খণ্ড সমাপ্ত)

সবারে মিলাও সবার সাথে,
সবারে করহে সবার প্রাণে,
সবার কণ্ঠে দিবস-রাতে,
জাগুক মধুর প্রণব-গান।
—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

অখণ্ড-সংহিতা বিংশ খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিংশ খণ্ড

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥

দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥

পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥

অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥

কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥

সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥

নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥

চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার!

• মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৮২' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পূর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১০' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"॥
কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬৪' নং গান।

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

(৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমার জ্ঞাতি॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৪০' নং গান।

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর 'নয়ন-ভাতি॥

ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিব অশ্রুনীরে,
বিপদে আপদে বাহুযুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী॥

কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি॥

* মঙ্গল-মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।

(৬)

আমার যেদিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই জানি
সবার সেবার তরে আমার
ক্ষুদ্র জীবন-খানি ॥
নইক আমি সম্প্রদায়ের,
গণ্ডীতে নই বাঁধা,
কণ্ঠ আমার নির্ব্বিচারে
সবার সুরে সাধা,
সবাইকে এই বক্ষে টেনে
জনম ধন্য মানি ॥
আমার বুকেই বিশ্বজনের
সকল দুঃখ-গাথা
মর্ম্মে মর্ম্মে তন্ত্রে তন্ত্রে
প্রেম-সোহাগে গাঁথা;
সবার কান্না আমার ভাষায়
লভুক তাদের বাণী ॥
সবার তরে জীবন দিব,
তাতেই জীবন লভি'
আমার মাঝে ফুটবে আমার
সত্যিকারের ছবি,

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৪৯' নং গান।

জীবন-দানের আনন্দেতে
বিশ্বভুবন উঠ্‌বে মেতে,
সবাই সবার আপন হবে,
বক্ষে টেনে আনি'
ভুলবে সকল দ্বন্দ্ব-বিভেদ
জগদ্‌ভরা প্রাণী ॥

(৭)

জন্মদিনের গান,
গান সে ত' নয়, আত্মদানের
প্রতিশ্রুতি-দান ॥
শ্বাস যতদিন বইবে নাসায়
বিশ্ববাসীর সেবার আশায়
প্রাণের বাতি জ্বলবে আমার
দীপ্ত অনির্ব্বাণ ॥
জন্মদিনের আশীর্ব্বাণী
দাও আমারে এই,—
আপন আমার ভুবন খানি
পর কেহ মোর নেই!
ভালবাসায় থাক্‌ব আমি
অনিন্দ্য অম্লান ॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৫০' নং গান।

(৮)

আয় তোরা আয়,
আমার বক্ষে আয়।
এইখানে আমি লুকায়ে রেখেছি
জগতের যে যা চায়॥

আমার ভিতরে সকল মন্ত্র,
আমারে ধরিয়া সকল তন্ত্র,
সুরজাল-রচি' সকল যন্ত্র
আমারে নতি জানায়।
তাই না "প্রণব" এই নাম মোর
প্রচার হ'ল ধরায়॥

মহীরুহ যবে আকাশ জুড়িয়া
শাখা-পল্লব-মেলে
হাজার হাজার পাখীরা ঘুরিয়া
তার ফাঁকে ফাঁকে খেলে,
তেমনি আমাতে নিখিলের ভাষা
যুগ যুগ ধরি' করে যাওয়া আসা,
আমারি ত' কোলে লভিয়া জনম
আমাতে বিলয় পায়॥

যত মত আর যত পথ হোক
যে আছে যেখানে পথচারী লোক,
সবাই আসিয়া শীতল হইবে
আমার স্নিগ্ধ ছায়॥

---

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '২০' নং গান।


অখণ্ড
সংহিতা
বা
বিংশ
শ্রী শ্রী স্বামী
খণ্ড
স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের
উপদেশ - বাণী
অখণ্ড - সংহিতা
বিংশ খণ্ড
অখণ্ড
সংহিতা
বা
বিংশ
শ্রী শ্রী স্বামী
খণ্ড
স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের
উপদেশ - বাণী